প্রবোধকুমার সান্যালের

শ্রেষ্ঠ গল্প

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০০৯

স্টেশন থেকে কিছু দূরে ট্রেন দাঁড়াল। এদিকটায় এখনও বন্যার জল এসে পৌঁছয়নি। স্টেশনে জায়গা কম, নিরাশ্রয় বুভুক্ষু জনতা আজ চার দিন হ'ল ওখানকার এলাকায় এসে আশ্রয় নিয়েছে। তা ছাড়া পানীয় জল নোংরা, মাষ্টার মহাশয় সাবধান ক'রে দিয়েছেন। দুর্ভিক্ষ আর মড়ক আরম্ভ হয়ে গেছে।

একদল স্বেচ্ছাসেবক গাড়ি থেকে লাইনের ধারে নেমে পড়লো। এর পরের গাড়িতে চাল ডাল আলু কাঠ কাপড় আর কলেরা ও ম্যালেরিয়ার ঔষধ এসে পড়বে এমন ব্যবস্থা করা আছে। তার জন্য এখানেই কোথাও অপেক্ষায় থাকতে হবে। বহু জায়গায় সেবাসমিতির কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

কিন্তু চারিদিকে চেয়ে যতদূর দৃষ্টি চলে দেখা গেল, কেবলমাত্র জলামাঠ, বিনষ্ট ধানের ক্ষেত, কোন কোন গ্রামের অস্পষ্ট চিহ্ন। আর কিছু না। রেলপথের বাঁধের উপর ঝড়ের মতো তীব্র বাতাস সন্ সন্ ক'রে বয়ে চলেছে। নবীনবাবু কিয়ৎক্ষণ এদিক-ওদিক চেয়ে বললেন, নদীটা পশ্চিম দিকে, নয়?

স্বেচ্ছাসেবকরা মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগল। কেউ জানে না নদী কোন্ দিকে। মাষ্টারমশাই ছাড়া আর সবাই অনভিজ্ঞ।

নবীনবাবু পুনরায় বললেন, শুনতে পাচ্ছ দূরে জলের উচ্ছ্বাস? বোধ হয় ঐদিকে, ঐ যেন দেখা যাচ্ছে, নয়? ঐদিক থেকেই ত' ঝড় আসছে। ওটা বোধ হয় মেঘ, কেমন?

কেউ আর উত্তর দিল না। সকলের কৌতূহলী চক্ষু কেবল চিন্তাকুল হয়ে দিগন্ত-বিস্তার জলামাঠের দিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কোনদিকেই কূল-কিনারা দেখা যায় না। আকাশ অন্ধকার।

সুরেশ্বর পশ্চিম দেশের ছেলে, বন্যার অভিজ্ঞতা বিশেষ তার নেই। সে বললে—মাষ্টারমশাই, আমাদের থাকার ব্যবস্থা কোথায় হবে? মানুষের চিহ্নও ত' কোথাও নেই।

নবীনবাবু হাসলেন। বললেন, থাকবার জন্যে ত' আস নি হে, এসেছ কাজ

করতে। আমাদের অনেককেই ভেলার ওপরে ভেসে রাত কাটাতে হবে। কুড়ি সালে বন্যার চেহারা যদি তুমি দেখতে হে—

আমরা যাব কোন্ দিকে এখন ?

চলো, লাইনের পশ্চিম দিক দিয়েই যাবার চেষ্টা করি। কি বলো হে অবনী,—তুমি দেখছি ভয় পেয়ে গেছ।

সকলের সঙ্গেই নিত্যপ্রয়োজনীয় কিছু কিছু আসবাব ছিল। সেগুলি সবাই পিঠের দিকে তুলে নিল। অবনী কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে বললে, ভয় নয় মাষ্টারমশাই, ভাবছি সাঁতারটা শিখে নিয়ে ভলাণ্টিয়ারি করতে এলেই ভাল হ'ত।

অন্যান্য ছেলেরা হেসে উঠে বললে, এইটেই ত' ভয়ের চেহারা অবনীবাবু।

পশ্চিম দিকে পথ নেই। স্টেশন ঘুরেই যেতে হবে, নইলে পথের দাগ পাওয়া যাবে না। সবেমাত্র এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, পথ পিছল। বেলা জানা যায় না, হয়ত বারোটা হবে। ঘন মেঘে আকাশ পরিব্যাপ্ত। মাঝে মাঝে মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে শকুনির পাল। স্বেচ্ছাসেবকের দল কেমন যেন ভারাক্রান্ত মনে রেলপথ ধ'রে চল্‌তে লাগল।

কুড়ি সালের বন্যায় এসেছিলুম স্বেচ্ছাসেবক হয়ে—নবীনবাবু বলতে লাগলেন, তখন কলেজে পড়ি। তমলুকের এক গ্রামে যে দৃশ্য দেখেছি, ভুলব না কোনদিন।

সবাই চল্‌তে চল্‌তে তাঁর কথায় উৎকর্ণ হয়ে রইল। তিনি বললেন, বছর কুড়ি-বাইশ বয়সের একটা মরা মেয়েকে একটা প্রকাণ্ড বাঘ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। আশ্চর্য এই যে, বাঘটাও বানের জলে ভাসা, দুর্ভিক্ষপীড়িত। থানার জমাদারকে ডেকে এনে বন্দুক দিয়ে সেটাকে মারা হ'ল···একটি গুলিতেই ঠাণ্ডা! যেন বসেছিল সে মরবারই অপেক্ষায়। ওঃ, সে দৃশ্য কখনও ভুলব না।

কিছুদূর এসে স্টেশনে জনতা দেখা গেল! তারা সবাই দরিদ্র। নবীনবাবু বললেন, ওরা সর্বহারার দল। কাছে যাব না, ঘিরে ধরবে। আমাদের কাছে কিছু নেই, এখন একথা শুনলে ওরা অপমান করবে আমাদের, ওদিকে আর এগিয়ে কাজ নেই। ভূমিকম্প আর বন্যা, এ দুটো মানুষের সমাজে সকলের চেয়ে বেশী ক্ষতি করে।

স্টেশনে এসে সেই স্টেশন-মাষ্টারের সঙ্গে আলাপ ক'রে জানা গেল, রাত্রের দিকে এদিকে জলপ্রবাহ আসতে পারে, কারণ, আজ সকালে আবার সাত জায়গায় নদীর বাঁধ ভেঙেছে। দশ মাইলের মধ্যে প্রায় তেরখানা গ্রাম ভেসে

মিলিয়ে গেছে। মৃত্যুর সংখ্যা এখনও জানা যায় নি। নৌকা ছাড়া পায়ে হেঁটে সাহায্য বিতরণ করার কোন উপায় নেই। অল্প খানিকটা পথ মাত্র পায়ে হেঁটে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সাবধানে থাকবেন আপনারা, পুলিশ পাহারা আর পাওয়া যাবে না, কাল থেকে চোর-ডাকাতের উপদ্রব বড্ড বেড়ে গেছে। অস্ত্রশস্ত্র কিছু আছে?

আজ্ঞে না।

তবে ত' মুশকিলে ফেললেন। এ ছাড়া জল বাড়লে এদিককার শেয়ালগুলো ক্ষেপে যায়, ক্ষ্যাপা শেয়াল হঠাৎ কামড়ালে কিন্তু শিবের অসাধ্য! জলের তাড়া খেয়ে জঙ্গলের জানোয়ারগুলো সব লোকালয়ে এসে ঢুকেছে। এদেশে আর বাস করা চলে না মশাই, প্রকৃতির কাছে মার খেয়ে খেয়ে জাতটার অধঃপতনের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে।

কথাটা এমন কিছু নয়, কিন্তু উপস্থিত সকলে এখানে দাঁড়িয়ে মনে মনে যেন এর একটা গভীর সত্যকে উপলব্ধি করতে লাগল।

কথাবার্তা চলছে এমন সময় কোথা থেকে দুটো লোক ব্যাকুল হয়ে এসে মাষ্টারমশায়ের কাছে কেঁদে পড়ল, ও বাবু, সর্বনাশ হ'ল আমাদের, সাপে কামড়েছে বাবু, কর্তা আমাদের আর বাঁচে না, – বাবুগো তুমি বাঁচাও।

নবীনবাবুর দল চঞ্চল হয়ে উঠল। মাষ্টারমশাই বললেন, থাম্ থাম্, চেঁচাস নে। যা এখান থেকে। কে হয় তোর?

আজ্ঞে বাবু আমার বাবা।

বয়স কত?

তা ষাটই হবে বাবু। বাঁচাও বাবু, পায়ে পড়ি –

যা দড়ি দিয়ে বাঁধগে। বাপের কথা পরে, মা-বোনকে সামলাগে যা। মাষ্টারমশাই বললে, হ্যাঁ মশাই গো, কে কার খবর রাখছে! যা বেটারা, দাঁড়াসনে এখানে। আপনারা খুব সতর্ক থাকবেন, বন্যার সাপ মানুষ দেখলেই কামড়ায়। ওদের গর্তগুলোও যে গেছে জলে ভর্তি হয়ে। ব'লে স্টেশন মাষ্টার-মশাই অকারণে হাসতে লাগলেন।

লোকগুলো কাঁদতে কাঁদতে চ'লে যাচ্ছিল, নবীনবাবুরা তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে চললেন। যদি বা লোকটাকে বাঁচানো যায়।

কিন্তু অনেক চেষ্টা-চরিত্র, অনেক তুকৃতাকের পরেও বৃদ্ধকে কোন রকমেই বাঁচানো গেল না। নবীনবাবুও তার সঙ্গী ছেলেদের নিয়ে ধীরে ধীরে সেখান থেকে অন্যত্র চ'লে গেলেন। বন্যার মৃত্যু কেবল জলেই নয়।

পরের ট্রেনে যখন রসদ এবং অন্যান্য সরঞ্জাম এসে পৌছল তখন বেলা আর বাকি নেই। কলকাতা থেকে উৎসাহী যুবকের দল হাজির। গাড়ি থামতেই জনতার কোলাহল শুরু হ'ল। ক্ষুধায় উন্মত্ত যারা তারা গাড়ি আক্রমণ করলো। তারা বাধা মানে না, তাদের অপমানবোধ নেই। কলকাতা-কেন্দ্রের সবাই প্রায় নবীনবাবুর পরিচিত। তিনি সদলবলে গিয়ে জনতাকে সংহত করতে লাগলেন।

এদিকে ঘণ্টাখানেক ধ্বস্তাধস্তি, ওদিকে কয়েক জন ছেলে ইতিমধ্যে গিয়ে নৌকার ব্যবস্থা ক'রে এল। আগামী কাল প্রভাতে দূরের গ্রামগুলির দিকে অভিযান করতে হবে। যত দূরে হেঁটে যাওয়া যায়, ঠেলাগাড়িতে আর কুলির পিঠে রসদ যাবে।

দুর্যোগের আর শেষ নাই। হাঁটু পর্যন্ত কাদা, ঝিরঝিরে বৃষ্টি, তীব্র বাতাস, পিঠে-বাঁধা-পুঁটলি—এমন অবস্থায় নবীনবাবু এবং তাঁর সঙ্গী এগার জন যুবক পথ অতিক্রম করতে লাগলেন। দেখতে দেখতে বর্ষাকালের সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। ক্ষ্যাপা শেয়াল এবং সাপের ভয়ে সবাই ছিল সতর্ক। গাছের ডাল কয়েকটা ইতিমধ্যে সংগ্রহ করা গেছে। কিন্তু প্রয়োজনের সময় সেগুলি ব্যবহার করার শক্তি কুলোবে কি না এই ছিল আন্তরিক প্রশ্ন।

নবীনবাবুর মুখে-চোখে চিন্তার ছায়া। প্রতি মুহূর্তেই তাঁদের কর্তব্যের চেহারাটা কঠিনতর হয়ে উঠছে! নানাদিকে নানান্ সমস্যা দেখা দিচ্ছে। ছেলেদের মধ্যে উৎসাহটা কিছু স্তিমিত।

বহু কষ্ট এবং পরিশ্রমের পর মাইল-তিনেক পথ পার হয়ে এক গ্রামের কয়েকটা চালাঘর পাওয়া গেল। স্টেশন-মাষ্টারমশাই এর সন্ধান নির্দেশ ক'রে দিয়েছেন। ঘরগুলির দারিদ্র্যের চেহারা সুস্পষ্ট। ঝড় জলের পক্ষে নিরাপদ আশ্রয় নয়। তবু এ ছাড়া আজকের রাত্রে আর গতি নেই। যেন কিছু দুর্লভ বস্তু আবিষ্কার করা গেছে, এমনি ভাবে সুরেশ্বর প্রমুখ ছেলেরা দ্রুত-পদে এসে চালার উপরে উঠল।

একটা প্রকাণ্ড কুকুর একধারে চুপ ক'রে বসেছিল, সে ডাকলও না, উঠলও না,—তেমনি করেই ব'সে রইল। গোলমাল শুনে পাশের একখানা কুটুরী থেকে একটা লোক বেরিয়ে এল। লোকটার মুখে প্রকাণ্ড পাকা দাড়ি, পাকা চুল, পরনে একখানা লুঙি—লোকটি মুসলমান। নবীনবাবু এগিয়ে এসে বললেন,—আজ আমরা রাত কাটাবো মিঞাসাহেব। জায়গা দেবে ত?'

বৃদ্ধ সবিনয়ে হাসলো। বললে, কষ্ট হবে, আপনারা ভদ্দলোক। কলকাতা থিগে এসেছেন?

হ্যাঁ, মিঞাসাহেব। বুঝতেই ত' পাচ্ছ কি জন্যে আসা। কুকুরটা রাতের বেলা হঠাৎ কামড়ে দেবে না ত' ?

না বাবু, ওর আর কিছু নেই। উপোস ক'রে ক'রে – ব'লে ব্যথিত দৃষ্টিতে প্রান্তরের ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে বৃদ্ধ একবার তাকালো।

অবনী বললে, তোমার এখানে কে কে আছে মিঞা ?

কেউ না, একাই থাকি বাবু। ইস্তিরি ম'রে গেছে, ছেলেটা চাকরি করে আসানসোলে রেলের কারখানায়! আমি আজও এই চালাটার মায়া কাটাতে পারি নি। তবে এইবার বোধ হয় পারব, নদীর বাঁধ ভেঙেছে। – ব'লে সে এক রকম অদ্ভুত হাসি হাসলো।

হারিকেন লণ্ঠন গোটা-চারেক সঙ্গেই ছিল, আলো জ্বালা হ'ল। স্বরেশ্বর বললে, এখানে জ্বালানি কাঠ পাওয়া যাবে মিঞা ?

ভিজে কাঠ বাবু, চলবে ? রাঁধবেন বুঝি ?

হ্যাঁ, রাঁধব। জল পাব কেমন ক'রে ?

বৃদ্ধ হাসলো। বললে, জল ত আছে কিন্তু আমার জল ··আপনারা হিঁদু –

নবীনবাবু বললেন, এখন আর হিঁদু নয়, এখন কেবল মানুষ। বেশ, দরকার হ'লে জল চাইব। তোমার খাবারও আমাদের সঙ্গে হবে মিঞাসাহেব।

কুকুরটা মুখ তুলে একবার বক্তা ও শ্রোতার দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো। বৃদ্ধ তার পিঠ চাপড়ে সস্নেহে বললে, বাবুরা তোকেও ফাঁকি দেবে না, বাবুরা ভাল। বুঝলি রহমন ?

ওর নাম রহমন বুঝি ? – অবনী সবিস্ময়ে বললে।

আদর ক'রে ডাকি বাবু। – ব'লে বৃদ্ধ কাঠ আর জলের ব্যবস্থা করতে গেল। লোকটা বড় ভাল।

ঘর দুখানার জানলা-কপাট বলতে কিছু নেই। ভিতরে প্রবেশ করার সাহস কারও ছিল না। পোকামাকড়, সাপখোপ, এমন কি ক্ষ্যাপা শিয়ালের অবস্থিতিও অসম্ভব নয়। এই দাওয়ার ধারেই যেমন ক'রে হ'ক আজকের রাত কাটাতে হবে। এগারটি ছেলে আর নবীনবাবু সেই ব্যবস্থার দিকে মনঃসংযোগ করতে লাগলেন।

কাঠ এল, জলের ব্যবস্থা হ'ল। বৃদ্ধ নিঃশব্দে তাদের সুবিধে ক'রে দিতে লাগল ; মুখে চোখেও তার একটু উদ্বেগ নেই। অতিথিগণের প্রতি আদর-আপ্যায়নের আতিশয্য দেখা গেল না। কুকুরটা এগিয়ে এসে বসলো। অর্থাৎ, তাকে যেন কেউ ভুলে যায় না, সেও সকলের একজন।

বিপিন বললে, যদি বন্যা আসে, তুমি এর পর কোথায় যাবে মিঞা ?

শাদা মাথার চুল আর দাড়ির ভিতর দিয়ে এই বিচিত্র বৃদ্ধ মুসলমানের হাসির রেখা আবার দেখা গেল। তার অর্থ আছে, কিন্তু সেটা রহস্যে ভরা। বন্যায় পৃথিবী প্লাবিত হ'লেও তার এই সায়াহ্নকালের অটল ধৈর্য একটুও ক্ষুণ্ণ হবে না—সে-হাসির মধ্যে এ অর্থটুকুও বোধ হয় লুকিয়ে ছিল। তবু সে মৃদুকণ্ঠে বললে, আল্লার হুকুম যেদিকে হবে বাবু।

কথাটা সামান্য ও সুলভ। কিন্তু এত বড় সত্য সংসারে বোধ হয় এখন আর কিছুই নেই। সবাই মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগল। এর পরে বিপিনের আর কিছু বলবার ছিল না।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে রাত্রি ঘনিয়ে এল। জোরে বৃষ্টি নামল, তার সঙ্গে ঝড়ের বাতাস। সম্মুখের বিশাল প্রান্তরের বুকের উপর দিয়ে বিক্ষুব্ধ বর্ষার দুরন্তপনা চলছে, কিন্তু তার কিছুই দেখা যায় না। দাওয়ার একপ্রান্তে কাঠের আগুন অতিকষ্টে জ্বালানো হ'ল। পথশ্রমে সবাই অবসন্ন, তবু আহারের আয়োজন না করলে কিছুতেই চলবে না। দাওয়ার একধারে চালার নীচে দিয়ে জল পড়তে লাগল। রাত্রি অতিবাহিত করা এখন প্রবল সমস্যা।

পরম উপাদেয় ভোজ্য—রুটি, আলুসিদ্ধ আর নুন···সবাই মিলে অপরিসীম আগ্রহে আহার করলো। বৃদ্ধ খেয়ে অশেষ আশীর্বাদ জানালো, এবার রহমান সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে এই পরোপকারীর দলের দিকে একবার চেয়ে এক পাশে গিয়ে বসলো। আহারাদির পর শোবার পালা। কিন্তু সকলের স্থান সঙ্কুলান হওয়া সম্ভব নয়। ঠিক হ'ল প্রতি দফায় আট জন ঘুমোবে, চার জন ব'সে থাকবে। এমনি ক'রে তিন দফায় রাত্রি কাটবে। কুকুরটা থাকতে সকলের মনে একটু সাহসও হ'ল। একটা আলো সমস্ত রাত জ্বালানোই থাকবে।

প্রথম দফায় নবীনবাবু প্রমুখ আট জন জলের ছাট বাঁচিয়ে দেয়াল ঘেঁষে জায়গা সঙ্কুলান ক'রে নিলেন। পা ছড়ানো যাবে না—বড় সংকীর্ণ। তবু পা গুটিয়ে কাৎ হয়ে তাঁরা চোখ বুজলেন। হাতঘড়িটা দেখে সুরেশ্বর বললে, রাত এখন ন'টা।

তৃতীয় দফায় রাত শেষ হবে। যারা পাহারায় বসেছিল তাদের চোখেও তন্দ্রা এসেছে। আলোটা জ্বলছে। দাওয়ার নীচে থেকেই সুদূর প্রান্তরের সীমানা—সেখানে অন্ধকারের পর অন্ধকারের দল। প্রেতপুরীর মতো পৃথিবী নীরব, কেবল দূর-দূরান্তরের ঝিল্লী ও দাদুরীর আওয়াজ নিরন্তর নিশীথিনীকে বিদীর্ণ ক'রে চলেছে। বৃষ্টির শব্দ আর শোনা যায় না।

যারা পাহারায় বসেছিল, তাদের মধ্যে একটি ছেলে হঠাৎ পায়ের শব্দ শুনে আচম্‌কা তাকালো। অস্পষ্ট আলোয় এক ছায়া-মূর্তির দিকে চেয়ে বললে, কে তুমি, কি চাও?

গলার আওয়াজটা তার অস্বাভাবিক রূঢ় আর উচ্চ। নবীনবাবু এবং অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকরা ধড়মড় ক'রে জেগে উঠে বসলেন। কে হে কালু, কোথায় কে? আরে, কে তোমরা?

বলতে বলতেই দেখা গেল একটি লোক ছোট একটা তোরঙ্গ মাথায় নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে, তার সঙ্গে একটি বারো তের বছরের কিশোরী মেয়ে।

লোকটি বললে, চলেই যাচ্ছিলাম, আলো দেখে এলাম এদিকে বাবু। একটু জায়গা দেবেন আপনারা, রাতটুকু কাটিয়ে যাব?

বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটে নি। বিপিন বললে, কোথা থেকে আসছ তোমরা?

আসছি তারকপুর থেকে। জলে গ্রাম ঘিরে ফেললে, সন্ধ্যে থেকে ছুটতে ছুটতে আসছি, এবারে বন্যা ভয়ানক বাবু। আমার নাম ঈশ্বর, এটি আমার মেয়ে; এর মা নেই।

মেয়েটি এবার বললে, দাওনা বাবুরা একটু জায়গা, কাল সকালেই চ'লে যাব।

নবীনবাবু এবার তাড়াতাড়ি বললেন, এস মা এস, এখানে আমরাও যা, তোমরাও তাই। এস ভাই ঈশ্বর, নামাও তোমার তোরঙ্গ। অনেকদূর হাঁটতে হয়েছে, কেমন?

ঈশ্বর বললে, হ্যাঁ বাবু, প্রায় বিশ মাইল আসতে হ'ল।

বিশ মাইল! দূর পাগল, এইটুকু মেয়ে বিশ মাইল—মাইলের জ্ঞান তোমার খুব দেখছি।

ঈশ্বর বললে, বিশ্বাস যাবেন না বাবু, আটখানা মাঠ পার হয়ে এলাম··· আমার মেয়ে আরও বেশী হাঁটে।

সবাই স্তম্ভিত হয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। নবীনবাবু কেবল অস্ফুট কণ্ঠে বললেন, রাত কত হে, সুরেশ্বর?

হাতঘড়ি দেখে সুরেশ্বর বললে, তিনটে বাজে মাষ্টারমশাই।

তোরঙ্গটা নামিয়ে সেই বলিষ্ঠ লোকটা একপাশে বসলো। মেয়েটা বসলো তার পাশে। গায়ে একটা পুরনো জামা, খাটো একখানা শাড়ী, মাথার খোঁপা চূড়ো ক'রে বাঁধা, হাতে দু-গাছা মাটীর রুলি। রূপ তার তেমন নেই, কিন্তু স্বাস্থ্যটা ভাল।

নবীনবাবু বললেন, তোমার নাম কি মা?

মেয়েটি বললে, আমার নাম ভুনি।—এই ব'লে সে বাপের কাছে ঘেঁষে ছোট তোরঙ্গটায় হেলান দিয়ে শুয়ে পড়ল এবং মিনিট পাঁচেক পরেই দেখা গেল সে নেতিয়ে পড়েছে। নাক ডাকছে।

নবীনবাবু বললেন, বাড়ি কোন্ গ্রামে বললে?

বাড়ি নেই বাবু, এখন আসছি, তারকপুর থেকে। সেখানে ক্ষেতে জল ছেঁচতাম। বাপ-বেটির ভাত জুটে যেত।

দেশ কোন্ জেলায়?

বাঁকুড়ো। সে অনেক দিনের কথা।—ঈশ্বর বললে, দু বছর ধান হ'ল না, জমিদারকে জমি ছেড়ে দিয়ে গেলাম কালিমাটি। পেটের দায়ে নিলাম কারখানায় কাজ। সেখানে ওলাউঠোয় ছোট ছেলেটা মারা গেল। বউ বললে, আর এদেশে নয়!

তার পর?

ঈশ্বর বললে, পায়ে-হাঁটা দিয়ে গেলাম মেদিনীপুর। সেখানে রতনজুড়ির হাটে সোম-শুক্কুরে তরকারি বেচতে বসলাম,—মেয়েটা তখন দু বছরের। চোৎ মাসের দিন গাঁয়ে আগুন লাগল,—আগুন—মশাই গো, ঘর বাঁচাতে পারা গেল না, ঘরসুদ্ধু বউটা আগুনে মো'ল। দূর হোক্ গে, মেদিনীপুর আর ভালো লাগল না, মেয়েটাকে কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। গরীবের জীবন, বাবু।

নবীনবাবু বললেন, মেয়েটাকে ত বড় ক'রে তুলেছ ভাই, এই তোমার লাভ!

ঈশ্বর হেসে বললে, মেয়েটাও মরবে একদিন, ও কি আর থাকবে! সেবার ডুবে গিয়েছিল কাঁশাই-নদীতে, একজন মাঝি তুললে টেনে; বলব কি বাবু, একবার হারিয়ে গেল খড়্গপুরে। মেয়েটার জান বড় শক্ত। সেই যে চব্বিশ সালের বন্যে, মনে আছে ত বাবু, গিয়েছিলাম খতম হয়ে···ও বেটিকে গাছে চড়িয়ে আমি ভেলায় চেপে রইলাম, সেবার তোমাদের দেশের এক বাবুর দয়ায় মেয়েটা বাঁচলো।—এই ব'লে সে চুপ ক'রে গেল।

সুরেশ্বর ব্যগ্রকণ্ঠে বললে, এবার কোথায় যাবে ঈশ্বর?

ঈশ্বর হাসতে লাগল। এ যেন তার কাছে বাহুল্য প্রশ্ন। এবার জবাব দেওয়া সে দরকারই মনে করে না। শুধু বললে, আপনারা কি এদিকে কাজ করতে এসেছ?

নবীনবাবু বললেন, কাজের কূলকিনারা পাইনে, তবু এলুম যদি কিছু উপকার করতে পারি।

চাল-ডাল বিলোবে, কেমন ? একখানা ক'রে কাপড় আর কম্বল, এই ত ? ব'লে ঈশ্বর হাসতে লাগল। তার হাসি, তার ভঙ্গী, তার কণ্ঠস্বর যেন জগতের সমস্ত বদান্যতাকে নিঃশব্দে বিদ্রূপ ক'রে দিল, এর পরে পরোপকারের আতিশয্য প্রকাশ করা চলে না। নবীনবাবু নীরব হয়ে গেলেন।

শেষরাত্রির ঘোলাটে অন্ধকারে বাইরের দিগন্তপ্রসারী প্রান্তর তখনও স্পষ্ট হয় নি। ছেলেরা সবাই জেগে বসেছিল। তারা বোধ হয় ভাবছে, বন্যার প্রবাহে আসে অনেক পাপ, অনেক অন্যায়। জল একদিন নানা খাতে পালিয়ে যায় বটে, কিন্তু রেখে যায় মানুষের লজ্জা, কলঙ্ক, দুষ্প্রবৃত্তি, রোগ আর দারিদ্র্য। যারা বাঁচে তাদের জীবনব্যাপী মৃত্যু আর ধ্বংস। ঐ অশিক্ষিত নির্বোধ লোকটার হাসির ভিতরে হয়ত এ-কথাটাও ছিল!

চাপা কান্নার শব্দে সবাই সজাগ হয়ে উঠল।

নবীনবাবু বললেন, কে হে, কে কাঁদে ?

এদিকে-ওদিকে সবাইকে তাকাতে দেখে ঈশ্বর হেসে বললে, আমার মেয়েটা গো মশাই, ঘুমোলেই ভুনি কাঁদে, ওর তিন বছর বয়স থেকে এই অভ্যেস। থাক, থাক বাবা—এই আমি আছি ব'সে। ব'লে সে তার মেয়েটার গায়ে বার-দুই হাত চাপড়ালো।

সুরেশ্বর বললে, কাঁদে কেন ? অসুখ ?

না বাবু, স্বপন ছাখে। ওর বোধ হয় একটু মাথায় দোষ আছে···দুঃখু পেয়ে পেয়ে—আমার হাতখানা ওর গায়ের ওপর থাকলে আর কাঁদে না। এই ভুনি, ওঠ্ বাবা—আলো ফুটল এবার। ঈশ্বর তার মেয়েকে আবার একবার নাড়া দিল।

ভোর হয়ে এল। মিঞা সায়েব আর তার কুকুর দু-জনেই এল বেরিয়ে। দূরে চেয়ে দেখা গেল, মাথায় মোটঘাট নিয়ে এক দল স্ত্রী-পুরুষ আর ছেলেমেয়ে মাঠ পার হয়ে স্টেশনের দিকে চলেছে। বোঝা গেল, বন্যার তাড়না। সকলে শশব্যস্তে উঠে দাঁড়াল। এ ঘর ছেড়ে দিয়ে সকলকেই এবার পালিয়ে যেতে হবে। ভুনি তার বাপের সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। তার চোখে-মুখে কোনো নালিশ, কোনো উদ্বেগ নেই, মৃত্যুর ভয় এই কিশোরীকে একটুও চঞ্চল করে না, তার জীবনের সঙ্গে এ যেন সহজে জড়িয়ে গেছে! শাড়ীর আঁচলটা কোমরে বেঁধে নিয়ে সে বললে, চলো বাবা। বেশ ঘুমিয়েছি, এবার খুব হাঁটব।

মিঞা-সাহেব যা পারল সঙ্গে নিল। কুকুরটাও হাই তুলে প্রস্তুত হয়ে পথে নামল। ঈশ্বর তার তোরঙ্গটা মাথায় তুলে নিয়ে বললে, চলো মিঞা, তোমার

সঙ্গেই এগোই। আয় লো ভুনি, আজ কিন্তু খুব হাঁটতে হবে, বুঝলি ত? উপোস করতে পারবি?

ভুনি বললে, পারব, চলো বাবা।

নবীনবাবুর দল নৌকা আর রসদের বিলি-ব্যবস্থার কাজে নামবেন। সুতরাং তাঁরাও বেরোলেন ওদের সঙ্গে। ভোরে বর্ষার আর্দ্র ঠাণ্ডায় সকলের শীত ধরেছে! দূরে এবার বন্যার জলের শব্দটা স্পষ্টই শোনা যাচ্ছিল।

মিঞা-সাহেব পিছন ফিরে তাকালো না, মায়ামোহে বশীভূত সে নয়। এক সময় বললে, এ বন্যে কিছু নয়, বুঝলে ঈশ্বর, দেখতে যদি ছিয়ানব্বই সালের জল – ব'লে সে কোন্ সুদূর অতীতের দিকে একবার তাকালো।

নবীনবাবু বললেন, জলের বিপদ ভয়ানক। এর চেয়ে মারাত্মক সংসারে আর কিছুই নেই, কি বলো মিঞা?

ঠিক বলেছ বাবুজী। – ব'লে মিঞা হাঁটতে লাগল।

ভুনি হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, হ্যাঁ বাবা –?

কি মা? তার বাপ জিজ্ঞাসা করলো।

জলে বিপদ বেশী, না আগুনে?

তার অদ্ভুত প্রশ্নে সবাই তার মুখের দিকে চেয়ে দেখলো। সামান্য তার কৌতূহল, কিন্তু তার কথায়, তার চলনে, তার চোখের চাহনিতে আজকের এই সর্বপ্লাবিনী বন্যার উদ্‌ভ্রান্ত চেহারাটা সকলে মুহূর্তের জন্য একবার অনুভব ক'রে নিল। বন্যায় তার জন্ম, বন্যায়-বন্যায় বিধ্বস্ত তা'র জীবন।

ঈশ্বরের বলিষ্ঠ বক্ষের ভিতরটা কিশোরী কন্যার এই প্রশ্নে অত্যুগ্র উত্তেজনায় পলকের জন্য একবার আন্দোলিত হয়ে উঠলো। অতীতকালের কোন সর্বনাশা ঘটনা স্মরণ ক'রে কম্পিত কণ্ঠে সে বললে, জলে বিপদ নেই বাবা…এই ত বেঁচেই আছি, কিন্তু আগুনে বড় বিপদ…

কথা শেষ করতে সে পারলে না; বোধ হয় এই কথা বলতে চাইল, আগুনে তার বুক পুড়েছে, তার ঘর পুড়েছে, তার জীবন পুড়ে খাক্ হয়ে গেছে। কিন্তু ঈশ্বরের মুখ ফুটল না, কেবল নিমীলিত চক্ষে চেয়ে ভুনির হাত ধ'রে সকলের সঙ্গে সে পথ হাঁটতে লাগল।

একখানা পা একটু খোঁড়া, একটু বাঁকা। চলতে গেলে একপাশে একটু নুইয়ে পড়ে, আবার কথা বলতে গেলে ওরই মধ্যে একটু বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে।

বললে, কিন্তু এই খোঁড়া পায়েরই দাম দিয়েছে বড় সাহেব, বুঝলে বুড়িমা ?

বুড়ি বললে, খোঁড়া পা বুঝি তোমার? দেখতে পাইনে চোখে!

রাখু মিস্ত্রী উৎসাহিত হয়ে বললে, ষাট টাকা মাইনে, ছাব্বিশ টাকা মাগ্‌গী ভাতা, —দরখাস্তখানা প'ড়ে সাহেব আর টুঁ শব্দটি করলে না, খচাখচ হাতের সই মেরে দিলে।

বুড়ি বললে, এত টাকা পাবে, কি কাজ করবে গো ?

কাজ !—রাখু হো হো ক'রে হেসে উঠলো। তারপর বিড়ি আর দেশলাই বার ক'রে ধীরে সুস্থে ধরিয়ে আবার হেসে উঠে তাকালো বুড়ির দিকে। বললে, কাজ কি আর বোঝাবো, তোমরা হ'লে সেকেলে লোক !—উ-ই ছাখো, দেখতে পাচ্ছ ? বলি পাচ্ছ কিছু দেখতে ? ওই ওদিকে ন' নম্বর তাঁবু পড়েছে সরকারী সড়কে।

বুড়ির ঘাড় কাঁপে কিন্তু স্বল্পদৃষ্টি চোখ দুটো এদিকে ফিরিয়ে বললে, কই না—

রাখু বললে, এক এক দলে পাঁচশো কুলি-কামিন—আমি ওদের কর্তা··· উঠবে বসবে আমার হুকুমে—এবার বুঝলে ?

বুড়ি বললে, তোমার হুকুমে ? তুমি কোম্পানির কে ?

কোম্পানি ?—রাখু এবার যেন একটু সবিস্ময়ে তাকায়।

কোম্পানি গো কোম্পানি ! এটা কোম্পানির রাজত্ব না ?

বিড়িটা এবার একবার টেনে রাখু বললে, তোমার বয়স কত হ'ল গো বুড়িমা ?

কেন বলো দিকি ?

জিজ্ঞেস করছি গো ?

ও, তা ধরো বাছা, আমার নাতনীর ছেলেটা বেঁচে থাকলে তার দেড় কুড়ি বয়স হ'ত। আর এখন নাতনীও নেই! বুড়ো নাত-জামাইটে ম'রে গেল। নাতনী গেল গয়া করতে, আর কই ফিরলো না! বুড়ির গলা নরম হয়ে এল।

রাখু আন্দাজে বুঝলো, বুড়ির বয়স প্রায় নব্বুইয়ের কাছাকাছি, প্রায় এক শতাব্দী। এক সময়ে বললে, শোন বুড়িমা, এখন আর কোম্পানির রাজত্বও নেই, ইংরেজ রাজত্বও নেই,—এখন হ'ল সব স্বদেশী, বুঝলে?

বুড়ির মুখের কোন রেখার পরিবর্তন হ'ল না। শুধু বললে, ও।

এবার কিন্তু তোমাদের পাততাড়ি গুটোতে হবে বুড়িমা। আর এখানে নয়,—এসব এখন সরকারী দখলে গেছে।

কেন গো?

শোনোনি? বসতি-বেসাতি ভেঙে এবার স্রেফ মাঠ-ময়দান! তোমাদের এখান দিয়ে যাট ফুট চওড়া রাস্তা।

রাস্তা? কেন গো?

রাখু মিস্ত্রী এবার অসীম তৃপ্তির হাসি হাসলো। বললে, চোখে দেখতে পাওনা, তাই। পেলে দেখতে, আমার পরনে গোরাদের হাফ-প্যাণ্ট, বুশ-শার্ট,—ভিখু মোড়লের ছেলেকে চিনতে পারবে কেউ? এখন বাবা স্বাধীন দেশ, ওসব চালাকী আর চলবে না।

বুড়ি বললে, চেয়ে দেখো ত' বাবা—ওদিকে গোবর পড়েছে কিনা।

না পড়েনি, গোবর আর পড়বেও না, বুড়িমা। এসব গাঁ-ঘর কি আর থাকবে? পাকা পাকা বাড়ি, সায়েবদের বাংলা, কলকারখানা—

কোথা যাবে সব?

ভোজবাজির মতো উড়ে যাবে, আর যাবে কোথা? বটপুকুরের ওদিকে ছিল বোরেগীদের আখড়া,—তারা গেল কোথায় বলো না, শুনি? হাটতলা ফর্সা,—সেই তামাকের দোকান, সেই যে শরকাঠি দিয়ে পলো বুনতো জেলেরা, গোলদারি আড়ত,—কিচ্ছু নেই! আটঘরার ওই যে অত বড় বস্তি,—একখানা পুরনো বাখারিও খুঁজে পাবে না! এখন শহর বসবে চারিদিকে,—বড় বড় গদি মারোয়াড়ি ভাটিয়ার—

রাখু মিস্ত্রীর মনে যেমন আনন্দ, চোখে তেমনই কৌতুক। বুড়ি তার দিকে একবার ঠাহর করবার চেষ্টা করলো। বললে, হ্যাঁ, বটে, দেখতে পাইনে চোখে। কানাকাস্তর জলপড়া দিয়েছিলুম চোখ দুটোয়,—কই সারলো না। হ্যাঁ গা, তোমাকে এখনো বাছা চিনতে পারি নি। ভিখু মোড়ল কোথাকার?

দাঁড়াও, চিনবে। ভালো করেই চিনবে।—রাখু এবার একটা ঢিবির ওপর গুছিয়ে বসলো। পুনরায় বললে, বাবুইহাটির সেই ধানকল মনে পড়ে?

হ্যাঁ—

আমি সেই কলে কাজ করতুম। সেখানকার মেসিনেই ত' একখানা পা খাটকে গিয়ে এই দশা। তু'খানা পা সমান থাকলে কি আর ভাবনা ছিল? বড় সাহেবের খাসদপ্তরে কাজ পেয়ে যেতুম! তোমার ঢিবিতে তখন আর বসতুম না, বুঝলে! গদি-আঁটা চেয়ার!

বুড়ি বললে, তবু চিনতে পারলুম না গো!

আচ্ছা, দাঁড়াও। মন্‌সার সেই ঠান্‌দিকে মনে পড়ে?

মন্‌সা কে?

মন্‌সা গো, রাখাল বোরেগীর পিসি—

কোন্ রাখালের কথা বলছ?

তোমার নাতনীর জোত নিয়ে মামলা যার সঙ্গে—

হ্যাঁ হ্যাঁ—সেই লেঠেল—

তার পিসি মন্‌সা—

আমাদের মানদা?

ঠিক ধরেছ। আমি হলুম সেই মানদার ভাস্থরপো।

বুড়ি বললে, মেয়েটা বদরাগী ছিল, তাই বলতো মন্‌সা! অনেক কাল ম'রে গেছে।

রাখু বললে, তোমার বয়সী আর কেউ বেঁচে নেই। ময়না বুড়ি, ঠান্‌দির মা, ময়রানী, কালোখুড়ী, দাস্থদিদিমা—সবাই গেছে।

বুড়ি বললে, খেয়ে দেয়ে সব গেছে, হাত পাততে হয় নি। তাই ত' বাছা, এবার চিনলুম তোমাকে, তুমি ঘরের লোক।

উঁহু, না,—ওটি হবে না বুড়িমা। ঘরের লোক বলে ঘুষ খেতে আমি পারবো না। আমি এখন সরকারী চাকরে। ইংরেজ আমলে ঘুষ চলতো, এখন আর ওসব নেই। আমি কিছু করতে পারবো না, তোমাকে উঠতেই হবে এখান থেকে।

উঠতে হবে? কোথায় গো?

এসব বস্তি-টস্তি কিছু রাখতে পারবো না। সাহেব-সুবোরা এসে সব মেপে নিয়ে গেছে। গাঁ কে গাঁ উড়ে যাবে।

বুড়ি এবার কিয়ৎক্ষণ থমকে রইলো। তারপর বললে, গাঁয়ের মধ্যে শহর-বাজার বসবে কেন গো?

রাখু হেসে বললে, একেই বলে মেয়ে মানুষ! কিচ্ছু খবর রাখে না। বলি, নদী যে বাঁধবে, শোনোনি? দামোদর গো, দামোদর! জল চালা-চালি হবে এধার ওধার।

নদী বাঁধবে? ভগবানের নদী বাঁধবে কি গো?

ওই ত' বলে কে? নদী বাঁধবে, দেশে আকাল থাকবে না। ধান-চালে সব ভরে যাবে, সব দুঃখ ঘুচবে! কত লোকের চাকরি, কাজ-কারবার, কত মোটরগাড়ি, দোকানদানি—এসব খোঁয়াড়ে বস্তি মস্তরের চোটে সব সাফ হয়ে যাবে। সেই জন্যেই ত' বলছি, কথাটা কান পেতে শোনো,—সময় থাকতে একটু জায়গা খুঁজে নাও।

শুনতে শুনতে বুড়ির ঘাড় কাঁপছিল! এই জীবনে তার অনেক ইতিহাস জমা হয়েছে, কিন্তু এটা নতুন, এটা শুনলে বুক যেন দুরু দুরু করে। রাখু যা বলছে সেটা অভাবনীয়, কেন না সেটা বুড়ির বুদ্ধির অগম্য, কল্পনার অগোচর। চৈত্রের ঝড়ে ঘরের চাল উড়ে যায়, আকালে গরু-বাছুর মরে, বাঘে ছাগল নিয়ে পালায়—এগুলো হ'ল চলতি জীবনের মধ্যে অভিনবত্ব, এগুলো ভেবে নেওয়া যায়। কিন্তু নদী বাঁধা পড়বে -সে কেমন? গ্রাম অদৃশ্য হবে, প্রান্তরের উপর শহর বসবে, চওড়া পাকা রাস্তা,—এসব হ'ল বুড়ির কাছে রূপ-কথা। বছর চব্বিশেক আগে শিবরাত্রির কোন্ এক মেলা থেকে ফিরবার পথে বুড়ি একবার গিয়েছিল বর্ধমান শহরে। সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। বুড়ী জলের কল দেখে অবাক। দেখে এল একতলার উপর দোতলা বাড়ি, দেখে এল ঘোড়ার গাড়ি। ভয় হয়েছিল গাড়িখানা ছুটে এসে না তাকে চাপাই দেয়। বর্ধমানের কথা মনে ক'রে কত রাত্রি যে বুড়ির সুনিদ্রা হয়নি, সে কথা বুড়ি নিজেই জানে।

আচ্ছা বুড়িমা—রাখু একবার তাকালো।

বুড়ি বললে, কেন বাছা?

তোমার এ ঘরখানা কদ্দিনের বল দিকি?

আ কপাল?—বুড়ি বললে ওটা নাড়ু ঘরামীর গোয়াল ছিল, এ পাশে আমাকে একটু ঠাঁই দেছে। চালে ছন্ নেই বাছা। শীতে কুঁকড়ে থাকি; ছেঁড়া কঁ্যাথাখানা কুকুরে নিয়ে গেছে। এবারে বৃষ্টিটা গেল গায়ের ওপর দিয়ে,—সারারাত ব'সে ব'সে ঢুলি বাছা।

রান্না কোথায় হয় তোমার বুড়িমা?

রান্না আর কি বলো। যুগীদের খামারের এক কোণে খুদসেদ্ধর হাঁড়ি আছে, ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালে দেয় অমন দু'খোস্তা। মেগে পেতে খাই বাবা।

কিন্তু আরো ত' খরচা আছে?

এক বেলা এক মুঠো পেলেই হ'ল,—ও ছাড়া আর খরচা কি গো?—গোবর পেলে ঘুঁটে দিই। তাও থাকে না, শুকোলেই কে যেন খুলে নিয়ে যায়। আর বাছা, গাঁয়ে আর ভিক্ষেও জোটে না।

রাখু আর একটা বিড়ি ইতিমধ্যে ধরিয়েছিল, কিন্তু সেটাও কখন যেন নিবে গেছে। নিবে যাওয়ার কারণ ছিল। যার কাছে এসে রাখু তার নবলব্ধ চাকরির জন্য বাহাদুরি নেবার চেষ্টা করছিল তার জীবনযাত্রার চেহারা দেখে এতক্ষণে তার উৎসাহ কিছু কমেছে।

রাখু বললে, আচ্ছা বুড়মা, তোমার এখানে যে বাছুরটা বাঁধা থাকতো সেটা গেল কোথায়?

বুড়ির ক্ষীণ দৃষ্টি এবার যেন একটু বড় হয়ে এল। খোসাওঠা শীর্ণ মুখখানা তুলে সে বললে, হাবলির কথা বলছ? সে ত' আর নেই।

বুড়ির চোখ দুটো জ্বালা ক'রে এবার জল এসে পড়লো।

রাখু বললে, ম'রে গেছে বুঝি?

না বাছা,—নিয়ে গেছে কে যেন! ওই হোথা কোন্ দিক থেকে জন খাটতে আসে, তারাই নাকি আমার হাবলিকে নিয়ে গেছে।

বাৎসল্য স্নেহে বুড়ির গলা ধ'রে এল। গরুটি ছিল তার একমাত্র সম্বল।

রাখু বললে, জন খাটতে আসে? কাদের কথা বলছ? আমার লোক ছাড়া আর কে আসে এ তল্লাটে? আচ্ছা দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা,—তুমি কেঁদো না বুড়িমা—যদি সে-গরু বেঁচে থাকে, ঠিক তুমি ফেরত পাবে!

রাখুর বেলা হয়ে গিয়েছিল, এবার সে উঠবার চেষ্টা করলো।

বুড়ি কেঁদে কেঁদে বললে, একমাস বয়সে ওর মা ম'রে গেল, আমি বুকে ক'রে মানুষ করলুম। এতখানি শরীর হ'ল, এই পালান। এমন গরু এ গাঁয়ে কোথাও নেই। গেল বছর বিউলো—তিন সের ক'রে দুধ। বাবা, আমার দিনটা চ'লে যেতো। হাবলি থাকতে ভিক্ষে করিনি, নিজের মান বাঁচিয়ে গতর খাটিয়ে খেয়েছি। মনে করলাম, মরণকালে আর মান খুইয়ে যেতে হবে না!

তা ত' বটেই বুড়িমা! মনে কি নেই, বড় ঘরের মেয়ে তুমি! শশী বোরেগীর ঘর, অমন কীর্তুনে বর্ধমান জেলায় নেই। আচ্ছা, আমি দেখছি,—ক'দ্দিন হ'ল বলো দিকি?

তা হ'ল বাছা প্রায় ছ'মাস!

ছ' মাস!

রাখু গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বললে, আমি খোঁজ রাখবো, কথা দিচ্ছি তোমাকে বুড়ীমা, — কিন্তু একটা কথা —

বুড়ি বললে, কি গো ?

কাছে এসে রাখু বললে, আটঘরার বসতি ভেঙেছে, এবার এদিকটা ধরবে। আমি বলি কি, তুমি নদীর ওপারে কোথাও একটু ঠাঁই দেখে নাও গে। এখানে আর থাকতে দেবে না।

তোমরা যাবে কোথায় ?

আমরা ? — রাখু হাসলো, তারপ অভ্যাস মতো বুকটা একটু ফুলিয়ে বললে, ব্যারাক বাড়িগুলো কাদের জন্যে উঠবে ? — যাক সে কথা। আমি দেখি যাদ গরুটা কোথাও খুঁজে পাই !

রাখু খুঁড়িয়ে চলে, কিন্তু দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি তার চলাটা লক্ষ্য করতে থাকলে সে যথাসম্ভব সোজা হয়ে হাঁটবার চেষ্টা করে। এবারেও তার ব্যতিক্রম হ'ল না।

ময়নাবুড়িরা ছিল ওর সমসাময়িক। কাঠা তিনেক খাজনা করা জমি ছিল তার। তারই মধ্যে ছিল গোটা তিন চার নারকেল গাছ। ময়নাবুড়ি ওতেই কোন মতে চালিয়ে দিত। দাসুদিদি ধানকলে কাজ ক'রে আসতো, তারও চলতো। ঠানদির মা, কালোখুড়ী, ময়রানী, — কেউই ভিক্ষে করেনি। বাউরীদের ঘরে কাঠ তুলতে গিয়ে ময়রানীকে সাপে কামড়ালো, কত তুক-তাক, ঝাড়-ফুঁক, কিন্তু ময়রানী সেই যে নীলবর্ণ হয়ে শুলো, আর উঠলো না। তা হোক, কারো ঘাড়ে বোঝা হয়ে না থেকে একরকম ভালোই হয়েছে। কালোখুড়ীর গতর ছিল, গলার আওয়াজ ছিল তার চেয়েও বেশি, সে ভুবন তা-র বাড়ি ঢেঁকি কুটতো, মুড়ি ভেজে দিত। চেহারাটা আঁট-সাঁট ছিল, তাই একটা মনিষ্যি থাকতো তার ঘরে। লোকটা নাকি কোন্ ইষ্টিশানে কাজ করতো। সেই কালোখুড়ীই একদিন বলেছিল, আদুর মা, সময় মতো কিছু কল্লিনে, বাসি মড়ার মুখে আগুন দেবার কেউ থাকবে না দেখিস।

আদুর মা'র ঘাড় কাঁপে, কিন্তু আজো কালোখুড়ীর কথার কোন কূলকিনারা পায় না। আজ শুধু শূন্য, কিন্তু সেদিন শূন্য ছিল না। ওই বটপুকুরের উত্তর দিকে ছিল বারোয়ারিতলা, তার এধারে ছিল সেই গুপী মোহান্তর ঘর, কত গাওনা-বাদ্যি, জমজমাট। মাঝরাত্রির পর্যন্ত ঢেঁকির শব্দ গাঁয়ে, গাজনতলার আখড়ায় দিনরাত হৈ চৈ। কোন এক ঘরে ঢুকে কচুপাতা

কেটে নিয়ে ব'সে গেলেই হ'ল। দই, চিড়ে আর নাড়ু, আর নয় তো ফ্যান-ভাতের সঙ্গে বেগুনসিদ্ধ, এক খাবলা তেল-নুন। দিন ত' এমনি করেই গেছে, এমনি করেই চ'লে যেতো! গোবিন্দ পালের বুকের ছাতি ছিল চওড়া। মামলায় হেরে গিয়ে গাঁ ছাড়তে বাধ্য হ'ল, কিন্তু যাবার সময় বললে, আদুর মা, তোর ঘরখানা বেঁধে দিয়ে তবে গাঁ ছাড়বো। যেমন কথা তেমন কাজ।

আদুর মা বুড়ির চোখে জল এল। চোখ মুছলো নিজের মনে।

দিন তিনেক পরে আবার একজন পেয়াদা এসে বুড়ির ঘরের সামনে দাঁড়ালো। আদুর মা সাড়া দিল,—কে-গা বাছা, কার পায়ের শব্দ?

পেয়াদা জবাব দিল, বুড়ি, মোড়ল কুছ বলিয়েছে তোমাকে?

তুমি কে গো?

হামি সর্দার.। তুমহাকে নুটিশ লাগাতে আসিয়েছি।

আদুর মা ঠুক্ ঠুক্ করতে করতে বেরিয়ে এলো। পেয়াদা ঘরের ভিতরটায় একবার তাকিয়ে বললে, গরু-হারাম থাকে না এ ঘরকে, তুমি থাকো কেমন ক'রে? কে খাওয়ায় তুম্‌হাকে?

ভগবান খাওয়ায় বাবা!

ভাগোয়ান! হা হা হা—পেয়াদা একেবারে হেসে লুটোপুটি। তারপরে বললে, বেশ ত', তোমার ভাগোয়ান সব মুলুকে বিরাজ করে ত'। তুমি যেখানে যাবে সেখানেও তুম্‌হাকে খাওয়াইবে?

আদুর মা ঘাড় কাঁপিয়ে বললে, কোথায় যাবো বাবা?

কোথা যাবে সে সরকার জানে, আর জানে তুম্‌হারা ভাগোয়ান, হামি কুচ্ছু জানে না। লেকিন তুম্‌হাকে যেতে হোবে।

ভাঙা ভাঙা রাষ্ট্রভাষা হলেও বুড়ির বুঝতে বিশেষ অসুবিধে হ'ল না। এখানকার উন্নতি হবে অনেক, দামোদরের জল প্রবাহিত হবে অনুর্বর প্রান্তরে প্রান্তরে, শস্যপূর্ণ হবে দেশ, অভাব থাকবে না কোথাও,—সবই সত্য, কিন্তু তার জায়গা এখানে নেই। তার ওপর বিধাতার এই বিধান ছিল, শ্মশানে প্রহরা দেবে সে। তার জন্য ছিল তৃষাদীর্ণ মাঠ, জলহীন, ফলহীন,—আসন্ন নূতনের সর্বব্যাপী পরিপূর্ণতা তার জন্য নয়,—একথা রাখুও জানিয়ে গেছে, আজ পেয়াদাও সেই কথা বলতে এসেছে।

বুড়ি ভয়ে ভয়ে বললে, তোমাকে কি রাখু পাঠিয়েছে বাবা?

রাখু! পেয়াদা গরম হয়ে বললে, রাখু মোড়ল? সেই চোর বেটা? সে

হারামি ঘুষ খায়েছে সব জাগা থেকে,—এখানে পারে নি, তাই হামার্ ওপর রাগ। হামি ওকে দেখিয়ে লেবো, ওর নোক্‌রি ছুটাবো।

স্থানীয় রাজনীতি বুড়ির পক্ষে উপলব্ধি করা কঠিন। কেবল বললে, সাত-পুরুষের গাঁ ছেড়ে কোথায় যাবো বাবা ?

পেয়াদা সান্ত্বনা দিয়ে বললে, বেশ ত' ঘরটো নিজের সঙ্গে খুলিয়ে লিয়ে যাও! লেকিন্—

লোকটা এগিয়ে এসে ঘরের ভিতরটায় উঁকি মেরে বললে, ওঃ কুচ্ছু নাই ঘরকে। চাল ভাঙা, ছিনা বেড়া আছে! ছু'টাকা দাম নয় এ ঘরের। একঠো মাচিস্ জ্বালিয়ে দিয়ে তুম্‌হি সরে পড়ো। শোন বুঢ়ি, তিন দিন আর সোমায় দিয়ে যাচ্ছে, তুম্‌হি জায়গা ছুড়ে লাও, বুঝছ ?

আতুর মার ঘাড় কাঁপছে ঘড়ির দোলকের মতো। পেয়াদার হুকুমের কোন জবাব সে দিতে পারল না।

পেয়াদা যাবার সময় বলে গেল, হ্যাঁ, এই চুক্তি রইলো। দেশের ভালাই কাজে সব তেয়াগ করতে হয়,—বুঢ়ি!

ছোট্ট লাঠিটি ধ'রে গিয়ে বুড়ী সকাল বেলায় কোথা থেকে ভাঙা মাটির সরায় ক'রে আমানি ভাত এনেছিল। এতক্ষণ পরে তার কথা মনে পড়লো! ঘরে তার বিশেষ কিছু নেই বটে। একখানা ছেঁড়া দোলাই আছে শীতের জন্য, আর আছে কলাইয়ের একটা চটাওঠা বাটি, আর আছে বুঝি একটা কেরোসিনের কুপি। এক টুকরো মরচে ধরা করোগেটের টুকরো—হাত দুই লম্বা—সেই দিয়ে গিয়েছিল গোবিন্দ পাল,—সেইটুকু আড়াল দিয়েই ঘরের আব্রু রাখা হয়। এক কোণে মাটির উনুন পাতা, কিন্তু ব্যবহার আর হয় না ব'লে সেখানে এখন ইঁদুরের বাসা। অন্যান্য আসবাবের মধ্যে ফালিবাঁধা একটি সরষের তেলের ভাঁড়, তাতেও ময়লা জমেছে। চালের আধখানায় খড় নেই,—রোদ-বৃষ্টি সমানেই ভেতরে আসে।

কিন্তু আসল কথা এটা নয়। এ গ্রাম তার। ওদিকে সেই নিশ্চিহ্ন বারোয়ারিতলা আর গাজনতলা, বটপুকুরের ধার, পালেদের হাটের জায়গাটা, ওই মাঠ আর নদীপথ—সবই যে তার।—চোখ দুটোয় যেদিন তার সম্পূর্ণ ছানি পড়েনি, তখন সে দুই চোখ ভরে দেখে রেখেছে গাজতলার পাশ দিয়ে বাঁশবাগানের ধার দিয়ে যাওয়া যেত মাঠের দিকে—সে মাঠও যে তার! নাই বা রইলো এ গাঁয়ে তার সাড়ে তিন হাত জমি,—কিন্তু তবু যে সাতপুরুষের অচ্ছেদ্য শিকড়! কেউ নেই আর গ্রামে সে জানে, আটঘরার বস্তির শেষ

চিহ্ও কিছুদিন আগে মুছে গেছে—তাও বলে গেল রাখু। আছে শুধু ঝোপঝাড়, শ্যাওলা-পড়া ডোবা, মোহান্তদের ভিটের স্তূপ, বটপুকুরের ঝুরিনামা পঞ্চবটি,-বাকিটা শুধু শ্মশান। আদুর মাকে ভিক্ষেয় বেরোতে হয় অন্তত তিন ক্রোশ রাস্তা। সেই সাঁওতা পেরিয়ে বুড়োশিবতলা ছাড়িয়ে তবে গিয়ে সেই মুন্সিপাড়া। এখন নাকি চাল নেই কোন ঘরে, লোকে খেতে পায় না। পরনে কাপড় নেই, কানি দেবে কোত্থেকে ? তাই কোন কোন দিন আমানি খেয়েই তাকে ফিরে আসতে হয়। চোখে দেখতে পায় না ভালো, কিন্তু পা দুটো তার ঠিক পথটি চেনে। লাঠিটা মাটিতে সে ছুঁলেই পথের সমস্ত পরিচয়টাই সে যেন পেয়ে যায়। কোন্ গাছের পর কোন্ গাছ, কোন্ বাগানের পর কোন্‌টা,—বুড়ি তাদের ছায়ায় আর গন্ধে বুঝতে পারে। কতবার খবর এসেছে তার কাছে,—দামোদরের ওপারে ক্রোশ দুই গেলে দাসু কামারদের মস্ত গাঁ। সেখানে কামারদের নতুন হাটখোলা তৈরি হয়েছে। এপার থেকে মনিরুদ্দির লোকেরা সেখানে গিয়ে নাকি প্রকাণ্ড হাঁস-মুরগীর কারবার জমিয়েছে। দাসু কামারদের সেখানে মস্ত ঠাকুরবাড়ি,—অনেক লোক সেখানে খায়। এই সব লোভ আদুর মা সম্বরণ করেছে।—সেখানে গেলে আর কোথাও না হোক, ঠাকুরতলার কোথাও তার একটু রাত্রির বাসা অবশ্যই জুটতো। কিন্তু সে কেন যাবে এ গাঁ ছেড়ে? নতুন জায়গায় গেলে ভিন্‌দেশীয়দের মান থাকে কি? ঠান্‌দির মা বলতো, মান খোয়ালে মেয়েমানুষের আর রইলো কি? বাপদাদার মাটিতে মরতে পারলে তবেই তো খাঁটি সোনা!—বলা বাহুল্য আদুর মার যারা সমসাময়িক তারা সবাই আত্মসম্ভ্রম বজায় রেখেই বিদায় নিয়েছে।

প্রায় বছর তিরিশ হ'তে চললো, ওই দামোদরের বাঁধ একবার ভেঙেছিল! সে কী জলপ্লাবন! বানে ভেসে গেল সব, গরু-বাছুর কোথাও কিছু রইলো না। কিন্তু ঘাসের ঘুন্টি যেমন অনেক সময় প্রবল স্রোতেও নিজে মূল আঁকড়ে থাকে, আদুর মা তেমনি ছিল এই গাঁয়ে,—কোথাও এক পা নড়েনি। কিন্তু আজকে মনে হচ্ছে, তার চেয়েও বড় বন্যা এসেছে,—এ বানে সবাই ভাসবে,—আদুর মাও। আদুর মার দাম নেই, দাম হ'ল ফসলের। ধান-চালে ভরে যাবে, পৃথিবী হবে পরিপূর্ণ,—সেই ভালো। তার এই ঘরখানার মাটিতে উঠবে বড় বড় ধানের শীষ,—সোনার বরণ,—রোদ্দুরে ঝলমল করবে। আর কোনকালে কাউকে ভিক্ষে ক'রে খেতে হবে না! সুতরাং রাখু মোড়লের কথাই সত্যি। এ মাটি তাকে ছাড়তেই হবে। কেননা এ-মাটি ও-মাটি কোনটাই তার নিজের নয়, কোনটাতেই তার কোন দাবি নেই। যাবার হুকুম এসেছে তার ওপর, তাকে

মান খুইয়েই চলে যেতে হবে। রাখু এও ব'লে গেছে, নতুন জায়গায় গেলে তুমি খেতে পাবে পেট ভ'রে—চাই কি একটা হিল্লেও হয়ে যেতে পারে আতুর মার।

আন্দাজে আন্দাজে আতুর মা আমানির পাত্রটা কাছে টেনে নিয়ে টাউ টাউ ক'রে খেতে লাগলো। ওর মধ্যে খুদ আর একটু নুনও মেশানো ছিল। তার জন্যে বালতি থেকে দু খোস্তা খুদ আর আমানি না রেখে ভুবন বোরেগী গোয়ালে বালতি দেয় না। বোরেগীদের গোয়ালে আতুর মা অনেক সময় কচি কচি ঘাস জুগিয়ে আসে। এ হ'ল তারই বিনিময়।

বুড়ির শীর্ণ গাল বেয়ে ঠোঁটের নীচে জলের ফোঁটা এসে ভিজে লাগতেই বুড়ি সচেতন হ'ল। এ জল ত' নুনগোলা আমানির নয়,—এ জল অন্য প্রকারের লবণাক্ত। বুড়ি তার কানির খুঁট দিয়ে এবার চোখ দুটো মুছলো। ঠান্‌দির মার শেষকালকার উপদেশগুলো আজ সকাল থেকে যত‌ই মনে পড়ছে, বুড়ির চোখে ততই আসছে জল। দিন দুই বাদে রাখু এসে আবার দরজার কাছে দাঁড়ালো। হাতে তার একখানা নোটবই, আর সুতো বাঁধা পেন্সিল। সে ডাকলো, বুড়িমা? ও বুড়িমা?

বুড়ি প্রথমটা সাড়া দিল না। পরে বললে, মোড়ল নাকি গো?

হ্যাঁ, আজ ভিক্ষেয় বেরোও নি?

গা-গতরে ব্যথা, তাই যাই নি।

ভাত পুঁজি আছে বুঝি?

বুড়ি এবার একটু উঠবার চেষ্টা করলো। বললে, একটা নোক এসেছিলো গো।

হ্যাঁ, সে আমারই প্যায়দা। বললে কিছু?

বুড়ী জবাব দিল না। রাখু বললে, এখানকার নম্বর প'ড়ে গেছে, আর ত' সময় দিতে পারি নে আতুর মা। কবে যাচ্ছ?

বুড়ী বিজ বিজ ক'রে বললে, তুমি বুঝি আর রাখতে পাল্লে না।

না গো। এবার গাঁইতি-কোদাল এসে পড়বে হু হু ক'রে,—আমার কথা আর শুনবে না—রাখু বললে, শেষকালে কান্নাকাটি করার চেয়ে ভালোয় ভালোয় যাওয়াই বুদ্ধির কাজ। তা, প্যায়দা কি বললে গো?

বুড়ি এবারেও জবাব দিল না দেখে রাখু একটু সন্দেহ করলো। বললে, প্যায়দার হাতে পড়লে তোমার পুঁজিপাটা সব যাবে তা বলে দিচ্ছি। ও বেটা চোরের যাশু। তিন নম্বর বস্তিতে ঢুকে বেটা ধাপ্পা দিয়ে পাঁচ টাকা কামিয়েছে। আমি কিন্তু তোমার কাছে ঘুষ চাইনি আতুর মা।

বুড়ি ক্ষীণকণ্ঠে বললে, প্যায়দা কি আসবে মোড়ল ?

রাখু সন্দেহক্রমে এবার ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। বললে, আসবে না ত' যাবে কোথায় ? বেটা উইপোকা! তুমি ওকে আস্কারা দিচ্ছ, কিন্তু পরে পস্তাবে। মেড়োর সঙ্গে কারবার করতে যেয়ো না বুড়িমা।

বুড়ি চুপ ক'রে চোখ দুটো বুজে রইলো। রাখু তার দিকে একবার রোষ-কষায়িত দৃষ্টিতে তাকালো। স্বগতোক্তি ক'রে বললে, সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না। মেড়োকে দিয়ে কাজ হাসিল করতে চাও, কেমন ? ওটি হচ্ছে না! —আচ্ছা, আমিও রইলুম পাহারায়, প্যায়দার বাবাও তোমাকে বাঁচাতে পারবে না।

কি একটা মতলব আঁটতে আঁটতে রাখু তখনকার মতো চ'লে গেল। আদুর মা তার দরকারী কথাগুলোর জবাব দিল না, এতেই রাখুর সন্দেহ আরও ঘনিয়ে উঠলো। কিছু দূরে গিয়ে সে থমকে দাঁড়িয়ে নিজের দাঁতে দাঁত চেপে বললে, মাগী জানেনা কিছু! বুড়ি মাগী আর বুড়ি গাই,—এ থাকলেই বা কি, আর গেলেই বা কি! ভাগাড়েই ওদের জায়গা।

রাখুর সাড়াশব্দ আর পাওয়া যাচ্ছে না বুঝে আদুর মা একটু নড়াচড়া করলো। ভিক্ষের ছেঁড়া ঝুলিটা হাতড়ে হাতড়ে কাছে নিয়ে আন্দাজে ওর ভেতর থেকে তুলসীর মালাটা সে বার ক'রে দিয়ে হাতের মধ্যে রাখলো। আজ ভিক্ষে নেই, তবু মালাটা তার হাতেই থাক। বুড়োশিবতলার মেলায় গিয়ে সে দু পয়সা দিয়ে এই মালাটা আনে,—তা প্রায় বছর পনেরো হ'ল। দানাগুলোর রং কালো হয়ে গেছে, কিন্তু এই মালাটা ঘুরিয়ে সে ভিক্ষেও পেয়েছে অনেক। পেটটা যাহোক ক'রে চ'লে গেছে।

দেখতে দেখতে বৃষ্টি এলো অবেলার দিকে। আকাশের চেহারা দেখে মনে হয় না সে-বৃষ্টি সহজে ছাড়বে। গাঁয়ের এদিকটা হ'ল নাবালো জমি,—সুতরাং অল্প বৃষ্টিতেই জল জ'মে ওঠে। আদুর মার মস্ত সুবিধে, তার কাছে শুকনো চারটি ভাত পুঁজি আছে,—কাল সকালে ভিক্ষেয় বেরোতে হবে না। বৃষ্টি বেশি হলে সাঁওতাল বিল এমন ভ'রে উঠে যে, ওদিকে পা বাড়াতে ভয় করে। বাউরীপাড়ার ওদিকের পথটা শুকনো, কিন্তু গোটা দুই বাঘা কুকুর তাকে দেখলেই ক্ষেপে ওঠে—সুতরাং পারতপক্ষে ওদিকে সে হাঁটে না। আজ আর কাল—এ দুটো দিন তার ভালোই কাটবে।

কী বৃষ্টি সমস্ত সন্ধ্যায়! ঝড়ের হাওয়ায় সেই বৃষ্টির ঝাপটা ভিতর দিকে আসছে। চাটাইয়ের তলায় জল জ'মে উঠেছে। এক সময়,—তখন রাত্রি কত

কে জানে—ঝন্ ঝন্ শব্দে গোবিন্দপালের দেওয়া সেই করোগেটের টুকরোখানা ঝড়ে খসিয়ে নিয়ে গেল। আওয়াজটা শুনে বুড়ির আচমকা ঘুম ভেঙে গেল। কাল সকালে জল ছেঁচে গিয়ে আবার ওই টুকরোখানা তাকে খুঁজে আনতে হবে।

· কিন্তু পরদিন সকালেও আকাশের একই অবস্থা। আজ থেকে নাকি গাঁইতি-কোদালের কাজ আরম্ভ হবার কথা ছিল, কিন্তু এমন দুর্যোগে মুনিষ-কামিনরা কাজ করতে চাইবে কেন? সুতরাং আজও সব কাজ-কর্ম বন্ধ। সারাদিন ধরেই এ গ্রাম সাধারণতঃ জনশূন্য থাকে। অন্যদিন যদি-বা রাখু কিংবা পেয়াদার মতো দু' একজনকে দেখা যায়, আজ তারাও ঘর থেকে বেরোয়নি। সারাদিন ধরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি চললো।

বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল অবশ্য দ্বিতীয় দিনের শেষরাত্রে। সকালের দিকে পেয়াদা যখন জলকাদা বাঁচিয়ে এসে দাঁড়ালো তখন রোদ উঠেছে। এ পাশে ছিল একটা বনশিউলীর গাছ, এরই মধ্যে দু'চারটে শিউলী পড়েছে কাদার মধ্যে। সেদিকে একবার তাকিয়ে পেয়াদা হাঁক দিল, ও বুড়ি, কোদালিরা আসিয়েছে কাম করতে,—কামরা ছাড়িয়ে দাও।

রাখু বোধ হয় দূরে কোথাও ওৎ পেতে ছিল। ছুটতে ছুটতে এসে বললে, এই,—খবরদার।

পেয়াদা মুখ ফিরিয়ে তাকালো। রাখু বললে, আমি রিপোর্ট করবো, জানিস? আমার চেনা লোকের কাছে ঘুষ খাস?

ঘুষ!—পেয়াদা আগুন হয়ে উঠলো। বললে, কোন্ হারামি—? তুম্‌হি দেখিয়েছে আঁখোসে?

রাখু বললে, আমার কাছে চালাকি মারছিস?

খবরদার, বেইমান!—পেয়াদা তাকে ধমক দিল।

দুজনে মারামারি বাধে আর কি! এমন সময় একজন জংলী কোদালি কোদাল কাঁধে নিয়ে এসে ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে বললে, এই জমাদার, ঘরকে ভিতর মুর্দা আছে!

মুর্দা কিরে বেটা?—রাখু ঝগড়া থামিয়ে এবার এগিয়ে এলো। দেখলো, বেড়াটা কাত হয়ে পড়েছে এবং তারই ভিতর দিয়ে আদুর মা সপ্‌সপে ভিজে দোলাই জড়িয়ে প'ড়ে আছে। কোনপ্রকার সাড়া শব্দ নেই। ঘুম নয়, ঘুমের চেয়ে বড় কিছু। মুখখানা বীভৎস, বিকৃত, দু-তিনটে অবশিষ্ট দাঁত বেরিয়ে পড়া।

পেয়াদা মহাস্ফূর্তির সঙ্গে ব'লে উঠলো, রাখু, দেখছিস, বুঢ়ি মোরবার আগে হাসিয়েছিল! হাসিমুখ রে!

রাখু শুধু বললে, হুঁ। হাসিই বটে!

কিন্তু তার বিশ্বাস হ'ল না যেন। কাছে গিয়ে রাখু আলগোছে আতুর মার বুকের কাছে অনেকক্ষণ কান পেতে পরীক্ষা করলো। না, মিথ্যে নয়। ঘড়ির কাঁটা কখন যেন চলতে চলতে বন্ধ হয়ে গেছে।

পেয়াদা বাইরে রৌদ্রে দাঁড়িয়ে সকৌতুকে ভিজে গাঁপিটা জড়িয়ে গাঁজার কল্‌কেটা ধরিয়েছিল। রাখু যখন বাইরে এসে একপাশে চুপ করে দাঁড়ালো, পেয়াদা তার দিকে হাসিমুখে একবার তাকিয়ে কল্‌কেটায় সুদীর্ঘ গোটা দুই টান দিল। তারপর বললে, ভাবিস না কুছু, ভাগোয়ানকে মর্জি রে ভাই রাখু। —নে ধর!

আড়ষ্ট হাতে রাখু কল্‌কেটা ধ'রে নিল।

তৃতীয় রিপু

বাড়ীর কাছাকাছি প্রায় এসে পড়েছি, এমন সময় মুষলধারে বৃষ্টি এলো। এই বিঘা দুই ফাঁকা জমিটুকুর ভিতর দিয়ে পেরিয়ে যেতে পারলেই বড় রাস্তায় পড়তুম। কিন্তু বৃষ্টি নামলো।

ছোট মেয়েটার জন্য ওষুধ আনতে গিয়েছিলুম ডাক্তারখানায় ; ফিরে গিয়ে আবার আপিস বেরোতে হবে। কিন্তু এ জামা কাপড় ভিজলে আজকে আপিস যাওয়া আর চলবে না। দ্বিতীয় ধোবদস্ত কাপড় পেতে গেলে ধোবার বাড়ি ছুটতে হবে।

শ্রাবণ মাসের বৃষ্টি,—দিন চারেক রোদের পর আবার আকাশ ভেঙেছে। একি থামবে সহজে ? বেলা ন'টা বাজতে চললো। একটু মুশকিলে পড়েই মাঠের এই নড়বড়ে চালাটার তলায় ঢুকে আশ্রয় নিলুম।

এই মাঠটুকু নিয়ে পাড়ায়-পাড়ায় কত রকমের কথা ঘুরে বেড়ায়। কেউ বলে, নাবালকের সম্পত্তি ; কেউ বলে, এর জমিদার থাকে খিদিরপুরের ওদিকে—তাদের বংশে বাতি দেবার নাকি কেউ নেই। কেউ বা বলে, এখানে আজ বিশ বছর ধরে বারোয়ারী পুজো আর যাত্রা থিয়েটার হচ্ছে—এ এখন জনসাধারণের সম্পত্তি, এর ওপর এখন পাড়ার সকলেরই অধিকার। আসল কথা, এই জমিটুকুর ওপর লোভ আছে বহু লোকের। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আমলের সস্তা টাকা আছে অনেকের হাতে,—কোনমতে এই দুই বিঘা দখল ক'রে নিতে পারলেই বাজিমাৎ। সেই কারণে এই জমিটুকু নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় চক্রান্তের আর অবধি নেই। যে ব্যক্তি সর্বাগ্রে গ্রাস করবে তারই পোয়াবারো!

বৃষ্টির ঝাপ্টা আসছে প্রবল বেগে ; দু'পা পিছিয়ে চালা ঘরখানার দরজায় উঠে দাঁড়াতেই হ'ল। কিন্তু হঠাৎ আশপাশের বিশ্রী দুর্গন্ধে সজাগ হয়ে এদিক ওদিক তাকালুম। এটি ঠিক চালাঘর নয়, কোন এককালের এক মাটকোঠারই ভগ্নাবশেষ। পাশেই কাজ করছে একজন ছুতোর মিস্ত্রি। দুটো গরু এসে কখন যেন আশ্রয় নিয়েছে ওধারে। এপাশে একটি হাঁড়ি-কলসীর

দোকানের পিছন দিক। বুঝতে পারা যাচ্ছে এ ঘরখানা ভেঙ্গে চুরে দাঁড়িয়ে আছে। ওপাশে থাকে এক ঝাড়ুদার পরিবার; তারই গায়ে-গায়ে বসবাস করে বাজারের এক ফড়ে,—ছাগলের মাংস বিক্রি করে। অনেককাল ধরেই দেখে আসছি এই চালাঘর এমনি ভাবেই কাৎ হয়ে আছে,—মাঝে মাঝে বদলায় শুধু এর বারান্দা।

ছুতোর মিস্ত্রি আমার জড়োসড়ো অবস্থা লক্ষ্য ক'রে ওধার থেকে ব'লে উঠল, ভেতরে উঠে এসে দাঁড়ান না বাবু, বড্ড ছাট আসছে!

উঠে এসে হাসিমুখে বললুম, তুমিই না আমাদের বাড়িতে গিয়ে সেবার তক্তাখানা মেরামত করেছিলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ, আমারই নাম সন্তোষ। দেখবেন, বুড়ি শুয়ে আছে আপনার পায়ের কাছে। হোঁচট খাবেন না।

এমনি বেহুঁস আমি, লক্ষ্যই করিনি এতক্ষণ। মনে করেছিলুম জঞ্জালের স্তূপ! ছেঁড়া কাঁথা, খড়ের আটি, ভাঙ্গা টিনের কানেস্তারা, ইঁট কাঠ আর ঝুরো মাটির রাশীকৃত জটলা, এ ছাড়া এ ঘরে বুঝি আর কিছু নেই। সহসা ঠাহর ক'রে দেখি, সত্যি প্রায় পায়ের কাছে আপাদমস্তক নোংরা কাঁথা আর খড় চাপা দিয়ে প'ড়ে আছে একজন, তার সাড়াশব্দ নেই। একটু আড়ষ্ট হয়ে দরজা ঘেঁষে দাঁড়ালুম। মুষলধারে বৃষ্টি চলছে।

জল নামছে গোলপাতার বড় বড় ছিদ্র দিয়ে। কোথায় যেন বিড়ালের বাচ্চারা ডাকছে। গরু দাঁড়িয়ে আছে স্তব্ধ হয়ে। বৃষ্টির অত ছাট সত্ত্বেও সন্তোষ তার র্যাঁদা চালাচ্ছে!

এমন সময় আবার এক নেড়িকুকুর উঠে সোজা ভিতরে ঢুকে কান ও গা-ঝাড়া দিল। বাইরে পা বাড়াবার উপায় নেই, এত বৃষ্টি। ভিতরে দুনিয়ার নোংরা, তাদের সঙ্গে বীভৎস দুর্গন্ধ জড়ানো। অত্যন্ত বিপন্ন অবস্থায় কেবলমাত্র জামা কাপড় বাঁচাবার জন্যই ভিতরে দাঁড়িয়ে থাকতে বাধ্য হলুম।

ছাতা নিয়ে বেরোতে হয়, বাবু—বর্ষা বাদলের দিন!—সন্তোষ আবার নিজের মনেই কাজ করতে লাগল।

কুকুরটা একটু বদ-খেয়ালী। কাঁথার উপর শুঁকতে শুঁকতে হঠাৎ একবার নাক ঝাড়া দিল। কিন্তু সেই শব্দে কাঁথার স্তূপ এবার নড়ে উঠলো। ভিতর থেকে কি যেন একটা গালমন্দ দিয়ে বুড়ি এবার মুখের উপর থেকে কাঁথা সরালো। এদিক ওদিক তাকিয়ে আমারই দিকে তার নজর পড়লো বটে, তবে কুকুরটা সেখান থেকে সরে গিয়ে অদূরে বসল। আমি নিজে কুণ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে

রইলুম। মেঝের উপর পুঁটলী পাকিয়ে ওই নোংরা কাঁথার মধ্যে বুড়ি কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে। বয়স সত্তর বছরের কম নয়।

সন্তোষ আবার ওধার থেকে বলল, দেখবেন বাবু, ওর কাঁথা যেন ছোঁবেন না, বড্ড নোংরা!

আরেকটু সরেই আমি দাঁড়ালুম। রুমাল চাপা দিলুম নাকে।

বুড়ি এবার একটু ক্ষীণ কণ্ঠে বললে, দরজাটা বন্ধ করো না বাছা, জল আসছে যে। ইঁটের ঠেকোটা দিয়ে দাও।—

দেখতে পাচ্ছি দরজা বন্ধ করলে দম আটকে আসবে। কিন্তু বুড়ির অনুরোধ আধাআধি পালন করতে হ'ল। আকাশ আজ ভেঙ্গে পড়েছে, পা বাড়াবার কোনও উপায় নেই।

সন্তোষ বললে, ওই দেখুন, অমনি ক'রে প'ড়ে আছে এক হপ্তা। কাল আবার আমানি খেলে। বারণ করলুম, শুনলে না,...আজ আবার বাড়াবাড়ি।

বললুম, কি হয়েছে ওর?

সন্তোষ কি যেন জবাব দিতে যাচ্ছিল, কাঁথার ভিতর থেকে ফোঁস ক'রে উঠলো বুড়ি,—থাম তুই, হারামজাদা—তোর আর তর সইছে না! ছাই দেবো তোর মুখে। নচ্ছার!

সন্তোষ একবার মুখ ফিরিয়ে তাকালো আমার দিকে। তারপর নিজের কাজে মনোযোগ দিয়ে বললে, দেখছেন বাবু,—জাত সাপের ছোবল্, বিষ একবার দেখুন। প্রায় সত্তর বছর হ'তে চললো ওই ছোবল মারছে সবাইকে।

ভিতরে একটা বিসদৃশ কাণ্ড না বেধে ওঠে,—আমি যেন সন্তোষের কথায় একটু আড়ষ্টই বোধ করলুম। কিন্তু বুড়ি গ্রাহ্যও করলো না,—চুপ ক'রে রইলো নিজের মনে। সম্ভবত বুড়ি এখানে-ওখানে ভিক্ষে ক'রে খায় সেজন্য সে কারোকে বেশী রকম চটাতে চায় না। কিন্তু বুড়ির মুখের চেহারা দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এ জীবনে ধিক্কার সয়েছে সে অনেক। সমস্ত ধিক্কার এবং অসম্মানকে শুধু যে সে গায়ে মাখেনি তাই নয়, সন্তোষের মতো ব্যক্তিকে সে মানুষ ব'লেও মনে করেনি।

বৃষ্টি যেন আবার নতুন ক'রে ঝাঁপিয়ে এলো। গোল পাতার ভিতর দিয়ে জল নামছে চালার মধ্যে। গরু দাঁড়িয়ে কি যেন অশ্রান্ত চিবোচ্ছে, কুকুরটা গিয়ে এক পাশে গা এলিয়েছে—কিন্তু মাঝে মাঝে মুখ তুলে দেখছে বিড়াল-বাচ্চাগুলোর দিকে। র‍্যাদা চালাচ্ছে সন্তোষ অবিশ্রান্ত। হাঁড়ি কলসীর দোকানের ভিতরে ব'সে কে যেন বর্ষা উপলক্ষে বোম্বাই সিনেমার বিরহ সঙ্গীত

ধরেছে। আমি দাঁড়িয়ে রইলুম কাঠ হয়ে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে। এমন বিব্রত কোনদিন বোধ করিনি।

এমন সময় বুড়ি ক্ষীণ কণ্ঠে আমাকে ডাকলো। কাছে সরে এলুম। একটুখানি ঝুঁকে তার দিকে চেয়ে বললুম, কি বলছ?

এই কলায়ের বাটিটায় একটু জল ধ'রে দাও দিকি, বাবা!

বললুম, খাবার জল চাও বুঝি?

হ্যাঁ হ্যাঁ খাবার জল, দাওনা একটু।

এদিক ওদিকে তাকিয়ে বললুম, খাবার জল ত' এখানে কোথাও দেখছিনে, বাছা?

ও মা, কি বুদ্ধি তোমার! চারদিকে এত জল, আর একটু খাবার জল দিতে পারছ না? আক্কেল নেই ঘটে? তুলে নে যাওনা বাটিটা, চালার নীচে ধরো, —ওই তো হুড় হুড় ক'রে জল পড়ছে!

বুড়ি যে এই নোংরা চাল ধোওয়া বৃষ্টির জলই খেতে চায়, এটা ঠিক আগে বুঝতে পারিনি। কিন্তু নিজের হাতে ক'রে এ জল কেমন ক'রে দেবো, এ কথাটা তলিয়ে ভাববার আগেই বাটিটা নিয়ে দরজার বাইরে ধরলাম। পাঁচ সেকেণ্ডে বাটি ভ'রে গেল। বাটি নিয়ে বুড়ির সামনে দিলুম। বুড়ি পরিতুষ্ট হয়ে, শুয়ে শুয়েই সেই জল পান করল। অবাক হয়ে গেলুম।

বুড়ি বললে, এ ভগবানের জল বাবা,—পেটের ব্যামোর এমন ওষুধ আর নেই। —হ্যাঁ বাবা, শোনো এক কথা বলি। চারটে পয়সা দাও দেখি,—এই চেয়ে নিচ্ছি বাবা,—না হয় ভিক্ষেই দিলে! সামান্য চারটে পয়সা!

আজকাল দুটো পয়সা পর্যন্ত কায়ক্লেশে ভিখারীকে দেওয়া যায়, চারটে পয়সা এক থোকে দিতে গেলে গায়ে একটু লাগে। কিন্তু পয়সাটা বার করার আগে বুড়ি খরতর দৃষ্টিতে আমাকে ইঙ্গিত ক'রে বললে, ওই আবাগের ব্যাটা যেন দেখেনা, চোখ টাটাবে। একটু লুকিয়ে দাও।

ঠিক তাই হ'ল। র‍্যাঁদা থামিয়ে ঘাড় উঁচু ক'রে ওধার থেকে সন্তোষ বললে, ও ভদ্দর লোকটাকে এবার বাগে পেয়েছ, না? পয়সা চাওয়া হচ্ছে চোখ টিপে? দেবেন না বাবু, একটি আদলাও দেবেন না, ওই শুকুনির হাতে। মাগি বড় শয়তান!

বুড়ি চুপ।

সন্তোষের এবম্বিধ মন্তব্যে আমি একটু আহতই হলুম। সর্বপরিত্যক্তা বৃদ্ধা ভিখারিণী কাদামাটিতে মুখ থুবড়ে প'ড়ে রয়েছে,—এবং চেহারা দেখে মনে হচ্ছে

হতভাগী তার অন্তিম শয্যাই পেতেছে। এর ওপর এই অপমান বর্বরতারই পরিচয়। একটু ক্ষুব্ধ কণ্ঠেই বললুম, সন্তোষ, এটা কি তোমার ভালো হচ্ছে, ভাই? যার বাঁচবার কোন আশা নেই, তাকে এমন ক'রে মারছো কেন?

কথাটা শুনে সন্তোষ হঠাৎ হেসে উঠলো কিন্তু আমার এই সমবেদনার কথা শুনে জবাব দিল বুড়ি। একটু নড়ে উঠে রুগ্নকণ্ঠে বললে, তুমি কেমন মানুষ, বাছা? চারটে পয়সা চাইছি ব'লে গায়ে প'ড়ে আমার মরণ টাঁকতে এসেছ? এতক্ষণ ঘরে দাঁড়িয়ে মাথা বাঁচাচ্ছ, ঘরের ভাড়াও ত' আছে!

আমি একেবারে হতবুদ্ধি।

বুড়ি কিন্তু থামলো না। ক্ষীণকণ্ঠে বলতে লাগল, দয়া চাইনি কারো। নিজের গায়-গতরের ওপরেই আছি। যাওনা বাছা বেরিয়ে, না-হয় বৃষ্টিতেই ভিজলে খানিকটে।

এবার ছুটতে ছুটতে দুটো ছাগল কোথা থেকে যেন চালার মধ্যে উঠে এলো। গরুটা নির্বিকার, তেমনি জাবর কাটছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। বুড়ি আমাকে বেরিয়ে যেতে বললেও নড়তে পাচ্ছিনে, এমনি সাপটে বৃষ্টি চলছে। নিছক সহানুভূতি জানাতে গিয়ে এমন চপেটাঘাত খাওয়া কৌতুকজনক বৈকি।

কথাটা সন্তোষের কানে গিয়েছিল। হাসিমুখে সে বললে, দেখলেন ত' বাবু কুলোপানা চক্কর? আপনি ত' এ পাড়ায় এসেছেন দশ পনেরো বছর। ও মাগির দাপটে এ তল্লাট চিরকাল থরহরি, ওকি আজকের শয়তান? এ পাড়ার তিন পুরুষকে ও মাগি জ্বালিয়ে খেয়েছে। ওর বয়সকালে বাঘে-গরুতে একসঙ্গে জল খেতো!

বুড়ি কাঁথার ভিতর থেকে খিঁচিয়ে উঠলো,—আ মর, হারামজাদা, দুটি চখের মাথা খা। চাল নেই, চুলো নেই। —আমি না থাকলে যেতিস কোথা? চুকলি কাটছিস যে নতুন লোক পেয়ে?

সন্তোষ আবার চুপ। গজকাঠি দিয়ে মনোযোগের সঙ্গে সে একখানা তক্তা মাপতে লাগলো, কোনও গালাগালির জবাব দিল না। আমার কিন্তু একটু খটকা লেগে রইলো। তাহ'লে ব্যাপারটা কি? চারটি পয়সা ভিক্ষে চাইলো, কিন্তু পরে বললে—ঘরভাড়া! তবে কি ঘরখানা এরই? কিন্তু সন্তোষের প্রতি যে-মন্তব্যটা বুড়ি ক'রে বসলো—কই সন্তোষ তার কোন জবাব দিল না ত'?

গজকাঠি রেখে সন্তোষ এবার বললে, চোখ রাঙাবার চেহারাটা দেখলেন? অথচ দেখুন, আমার ঘরে পান্তা রাখার জো নেই,—মাগির এমনি হাতটান।

ওই দেখুন, সকাল থেকে দাঁত লেগে পড়েছিল, আপনার কাছে পয়সার গন্ধ পেয়েই চিতিয়ে উঠেছে।

বললাম, অসুস্থ হয়ে পড়েছিল বুঝি?

অসুস্থ!—সন্তোষ এবার দু'পা এগিয়ে এল,—আজ ছ'দিন হ'তে চললো ওলাউঠোয় ভুগছে। বছরে তিনবার চারবার ওর ওলাউঠো হয়! গেল বছর বাঁশ বেঁধে ওকে যেই সবাই মিলে কাঁধে তুলবে, অমনি বেঁচে উঠলো। বজ্জাতের হাড়, ওকি সহজে শ্মশানে যাবে! আশী বছর পেরিয়ে গেছে ওর।

আমি আর এদের কথার ফাঁদে পা দিচ্ছিনে, উচিত মতো শিক্ষা আমার হয়ে গেছে। হাসিমুখে বললুম, না না, এসব কথা বলতে নেই—। প্রাচীন কালের মানুষ, যতদিন বাঁচে ততদিনই ভালো। সুখেরই কথা।

বুড়ি আমার কণ্ঠস্বর শুনে সন্দেহ করলো কিনা বুঝলেম না। কিন্তু এবার বিরক্ত হয়ে সে বললে, খুব ত' তখন থেকে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে চুকলি কাটছো,—চারটে পয়সা ফেলতে বুঝি হাত উঠলো না?

তাড়াতাড়ি চারটে পয়সা বার ক'রে বুড়ির হাতের কাছে হেঁট হয়ে দিয়ে বললুম, যে যাই বলুক, বুড়ো মানুষের দুঃখ সবাই বোঝে না! এ পয়সায় তুমি খাবার খেয়ো।

বিদ্যুৎ ঝলসিয়ে আকাশ পথে কোথায় যেন একটা সশব্দে বাজ পড়লো। দেখতে দেখতে নতুন ঝাপ্টা নিয়ে আবার প্রবল বর্ষণ নেমে এলো। সামনের জমি পেরিয়ে রাস্তার চারদিকে জল দাঁড়িয়ে গেছে। এতক্ষণে আমার বাড়ি পৌঁছে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এই জলপ্লাবনের মধ্যে যানবাহনাদির চলাচল যে বন্ধ হ'তে বাধ্য, এতে আর কোনও সন্দেহ নেই। মুশকিল এই, ধোপার বাড়ি থেকে আর এক প্রস্থ জামাকাপড় না আসা পর্যন্ত এই পোষাকেই আমাকে চালাতে হবে। সুতরাং এই জামাকাপড় সুদ্ধ পথে নামলে আজ আর কাল দু'দিনই আপিস কামাই,—সে অসম্ভব।

পয়সা দিয়েও আমি ধারে দাঁড়িয়ে রইলুম। বুড়ি কিন্তু না দিলে ধন্যবাদ, না জানালো কৃতজ্ঞতা, এটা যেন নিজের প্রাপ্য হিসেবেই সে নিল। এ না দিয়ে যেন আমার নিস্তার ছিল না।

পরম ফুর্তিতে পুনরায় র‍্যাঁদা টানতে টানতে সন্তোষ বললে, পয়সা দিয়ে বুড়ি কি করবে জানেন? আর দু'ঘণ্টা পরেই গা ঝাড়া দিয়ে উঠবে, তারপর গড়িয়ে-গড়িয়ে যাবে তেলে ভাজা ফুলুরির দোকানে। এই ওলাউঠো তার

ওপর ওই ফুলুরি! বাবু, দুঃখের কথা বলবো কি, যা খেলে সবাই মরে, ও মাগি তাই খেয়ে বেঁচে ওঠে।

শোনো গুয়োটার কথা! বুড়ি খিটখিটিয়ে উঠলো আবার,—যাওনা বাছা নিজের কাজে, খামোকা দাঁড়িয়ে কেন চুকলি শুনছো? ও ভ্যাকরার তিনপুরুষে কি জাতজন্মের ঠিক আছে? ও হ'ল বাঁদর বাচ্চা!

ঘাড় তুলে সন্তোষ এবার হাসিমুখে জবাব দিল, বলি জাতজন্ম খেলে কে? তুই খাসনি?

বুড়ি বললে, ওই নাও! বলি বাপকে মানুষ করলে কে? বল্ না তোর ঠাকুমা পালিয়েছিল কার সঙ্গে? বলবো তোর মায়ের কথা লোক-সমাজে?

এত বড় কলঙ্কের কাহিনী শুনেও সন্তোষ কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করলো না। বোধকরি তার ছুতোরের কাজটা ছিল চুক্তিবদ্ধ, অন্যদিকে মনোযোগ দেবার সময় ছিল কম। সুতরাং তেমনি হাসিমুখেই ক্ষিপ্রহস্তে তার কাজ চলতে লাগল। কাজ করতে করতেই এক সময় সে বললে, বাবু, ওর কথায় চটবেন না। ভদ্দর লোকের সামনে ও মাগি মান, খাতির রাখতে জানে না।

বুড়ি গজগজিয়ে বললে, মান-খাতির! জবাব দে না কি দিবি?

সন্তোষ এবার একটা বিড়ি ধরালো। তারপর শান্তকণ্ঠে বললে, বুঝলেন বাবু, আমার ঠাকুরদাদাকে নিয়ে ওর মোট সাতটা মরদ ছিল; সব মিলিয়ে ওর ষোলটা ছেলেপুলে। আমার বাপ কিন্তু ওর পেটে হয়নি। সেই জন্যে আমি ওর দু'চোখের বিষ।

সে সব ছেলেপুলেরা কোথায় এখন? ওর এই দুঃসময়ে তারা দেখেনা কেন?—আমার কণ্ঠে আবার সহানুভূতি ফুটল।

সন্তোষ বললে, তবেই হয়েছে? তাদের বেশী অর্ধেক মারাই গেছে বুড়ো হয়ে। নাতি-নাতনিরা ওর ভয়ে যে যার পালিয়েছে। কেউ কারো খোঁজ রাখে না।—বড় ঘর কিনা!

বড় ঘর,—সন্দেহ কি? এবার বললুম, কিন্তু নাতি-নাতনিরা যদি যে-যার কাজ হাসিল ক'রে ওকে ফেলে পালায়, তাহ'লে তাদের কেমন ক'রে ভালো বলব সন্তোষ?

বুড় যেন চিতিয়ে উঠল একেবারে। বললে, এতক্ষণে কথার মতো কথা বলেছ, বাছা। একেই ব'ল মরদের ব্যাটা! ওই মাদির বাচ্চাটা যা বলছে, একটু বিশ্বাস করোনা, বাছা। শূয়োরে কি মানুষের কথা কইতে জানে?

কি ভাগ্য, বৃষ্টির শব্দে সবগুলি গালাগালের ভাষা সন্তোষের কানে পৌঁছলেও সে যে মারমুখী হয়ে ছুটে আসতো এমন মনে হয় না।

বিড়িতে টান দিয়ে সন্তোষ এবার হি হি ক'রে হাসল। বললে, ওকে সবাই ঠকিয়ে পালাতে চায়, একথা শুনলে বুড়ি ভারি খুশী।

বুড়ি চুপ ক'রে রইল।

সন্তোষ পুনরায় বললে, জিজ্ঞেস করুন দিকি, আমার বাপকে মিথ্যে ফৌজদারি মামলায় ফেলে দেড় বচ্ছর জেল খাটিয়েছিল কেন? বাপের পা ভেঙ্গে দিয়েছিল গুণ্ডো লাগিয়ে ওই মাগি, বুঝলেন বাবু?

বললুম, ছি সন্তোষ, ইনি তোমার গুরুজন, বারবার তুমি এভাবে গাল দিয়ো না।

গুরুজন!—বিড়িতে শেষ টান দিয়ে বিড়িটা ফেলে দিয়ে সন্তোষ বললে, তা সেকথা একশোবার। গুরুজন বৈ কি। তবে কি জানেন বাবু, মন-মেজাজ ও মাগি ঠিক রাখতে দেয় না সব সময়ে। নৈলে দেখুন না কেন, পাঁচটা মরদকে ধরে ও বুড়ি কারবার করতো বটে, তবে আমার ঠাকুরদাকে নিয়েই শেষ পর্যন্ত ঘরে উঠল। বয়েস কালে ওর মনটা উঁচুদরের ছিল বৈকি। সেই জন্যেই ত' ঠাকুমা ব'লে আজও ডাকি।

বুড়ি আবার তার কাঁথার তলায় চুপ ক'রে রইলো।

প্রবল বর্ষণের ভিতর দিয়ে ছুটে মেয়ে-পুরুষ এবার ওদিকের দরজা দিয়ে ভিতরে উঠে এলো। বৌটাকে দেখেই চিনলুম, এ-পাড়ার মেথরানি, দুজনেরই হাতে দুটো সেই মার্কামারা বালতি! বালতি ধুয়ে এনেছে নর্দমার জলে।

ভিতরটা আমার পক্ষে এবার যেন অসহ্য হয়ে উঠছে। আন্দাজে বুঝতে পারি বেলা দশটা বাজে। বাড়ি ফিরবার জন্য ছটফট করছিলুম! গরুটা, ছাগল দুটো, কুকুরটা বাইরে বৃষ্টির জন্য সবাই নির্বিকার। শুধু ভিতরে এক আধটা ইঁদুরের আনাগোনার জন্য কুকুরটা মাঝে মাঝে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে আবার যেন গভীর নৈরাশ্যে ডুব দিচ্ছে।

আমার চাহনিতে বোধ করি নানাবিধ কৌতূহল ছিল; একসময় ওধার থেকে সন্তোষ বললে, গরু ছাগল কুকুর যা দেখছেন সবই ওই বুড়ির পোষা। কুকুরটা পাহারা দেয় রাত্তিরে। গরুটা দুধ দেয় দেড় সের, দুটো ছাগলেও প্রায় তিন পো। মেথর বৌ ভাড়া দেয় মাসে তিন টাকা,—জিজ্ঞেস করুন দিকি এত টাকা যায় কোথায়?

কথাটা শুনে একটু অবাক হলুম বৈকি। সমস্ত ধারণা এবং কল্পনা যেন

ওলট-পালট হতে লাগলো! সন্তোষের মুখের দিকে শুধু চেয়ে রইলুম। না, এতটা বিশ্বাস করা বোধহয় সম্ভব নয়। কিন্তু আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সন্তোষ খুব এক চোট হেসে উঠলো! তারপর বললে, বুড়ি বাঁচবে না। দেখছেন, কিন্তু আর পাঁচটাকে নিয়েই ও মরবে!

কেন!

আটটা ন'টা মামলা ঝুলছে ওর খতে। পাঁচ সাতটা উকীল মোক্তার ওর তাঁবেদার।—সন্তোষ মহাখুশী হয়ে বলতে লাগল, সাধে কি ওর পা ধ'রে প'ড়ে থাকি, বাবু? যদি মাগির একটু মন ফেরে, তাহ'লে আমাকে আর বাটালি করাত চালিয়ে মজুরি খাটতে হয় না,—পায়ের ওপর পা রেখে ব'সে খাবো চিরকাল!

কি রকম?

সন্তোষ বললে, কিছু জানেন না দেখছি আপনি। নয় ত' কি! পাড়ার লোক হয়েও কোন খোঁজ-খবর রাখেন না! ওই হাঁড়ি-কলসীর দোকানখানা দেখছেন ত?

হ্যাঁ—

ওর পাশে চৌধুরী কোম্পানির মনোহারীর দোকান?

রয়েছে ত'!

পানের দোকান ওর গায়ে?—এই তিনখানা দোকানের ভাড়া প্রায় একশো দশ টাকা! জিজ্ঞেস করুন দেখি বুড়ি অত টাকা কি করে? কোথায় জমিয়ে রাখে?

বলো কি সন্তোষ?

সন্তোষ একবার আড়চোখে বুড়ির কাঁথা-কুণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে বললে, কিন্তু একটা পয়সা গলান দেখি মাগির হাতের ফাঁক দিয়ে? পারবেন না। ওর হাতের মধ্যে ভেল্কি! আমি অনেক তালাস করেছি বাবু, কিন্তু টাকা কোথায় রাখে কোন সন্ধান পাই নি।

বললুম, ওর যখন এত ভালো অবস্থা, অসুখের সময় ওকে হাসপাতালে দাওনা কেন?

হাসপাতাল! তবেই হয়েচে! কার ঘাড়ে ক'টা মাথা যে সেকথা তুলবে?

বুড়ি আবার ন'ড়ে উঠেছে। আমি চুপ ক'রে গেলুম। কিন্তু সন্তোষের যেন কোনদিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই। সে আবার বলতে লাগল, খরচা করবে না, শুধু পুঁজি করবে—এই ওর চিরটা কাল! পাঁচটা গরীব দুঃখীকেও ত'

ডেকে-ডুকে খাওয়াতে পারে, তাও না। দুনিয়ার লোকের সঙ্গে ঝগড়া আর মামলাবাজি।

বুড়ি এবার আর থাকতে পারলো না। বললে, মামলাবাজি? তোর মায়ের সেই মরদটা আমাকে সেবার ফাঁদে ফেলে নি?

সন্তোষ এবার যেন একটু রেগে উঠল। বললে, সে ছিল ভদ্দরলোক, তোর মতো নচ্ছার নয়। তুই কি ছেড়েছিলি তাকে? তুইও ত' ঘুঘুর ফাঁদ দেখিয়ে ছলি!

বললুম, কে সে লোকটা হে?

সন্তোষ বললে, সে ওই মান্নাপাড়ার সেজবাবু—খাঁটি ভদ্দরলোক। বুকের ছাতি ছিল এই, বাবু। দু'হাতে খরচ করত!

তোমাদের কে হয়?

আমাদের কেউ নয়, তবে আমার মায়ের খুব আলাপী ছিল। এই ত' গেল বছর মারা গেছে। তার টাকাতেই আমরা মানুষ।

চুপ ক'রে গেলুম। সন্তোষ বলতে লাগলো, তোর গুণ কে না জানে, চিরকাল একজনের পেছনে আরেকজনকে লেলিয়ে দিয়েছিস। দুজনে ঝগড়া বেধেছে, আর তুই ভেতরে ভেতরে কাজ গুছিয়েছিস! আমি বলছি বাবু আপনাকে, ওর ওই কাঁথার মধ্যে নোংরাও যত আছে, নোটের তাড়াও তত আছে!

বুড়ি বললে, মুখপোড়া আয় না—নোংরা ঘেঁটে টাকা বার কর? বুঝবো তুই কত বড় মাদির বাচ্চা!

সন্তোষ বললে, তবে তুই ম'রে গেলে আমি পাবো কি, বল্‌ত দেখি? চিরকাল যে আমাকে আশায়-আশায় রেখে দিলি,—কোথায় তোর টাকা-পয়সা? বল্‌না সত্যি ক'রে, কেন এত টাকা পয়সা জমাচ্ছিস? তোর পুঁজি ত' মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে! মাস-মাস তোর দুশো টাকা রোজগার!

এবার বুঝিবা একটা বিশ্রী কাণ্ড বেধে ওঠে। বুড়ি এবার কাঁথাখানা সরিয়ে আস্তে আস্তে উঠে বসবার চেষ্টা করল। সেই প্রায়ান্ধকার ঘরের মধ্যে বুড়ির রুগ্ন বীভৎস মুখখানার ওপর দুটো চোখ দপ দপ ক'রে উঠল। বললে, দে না, হাতের কাছে করাতখানা এগিয়ে দে, তোর মাথাটা কেটে নিই!

সন্তোষ অদূরে দাঁড়িয়ে হি হি ক'রে হাসছিল। বললে, ওই দেখুন বাবু, পুঁজির কথা ধরিয়ে দিলেই আগুন হয়ে ওঠে। ওইজন্য দুনিয়ায় ওর বন্ধু নেই, সবাই ওর নামে ভয় পায়। ও না পারে হেন নোংরা কাজ নেই। টাকার গরম কিনা, তাই সবাইকে শাসিয়ে চলে।

বৃষ্টির বেগ এবার যেন একটু কমেছে। এখনও বাইরে পা বাড়াবার মতো আকাশের অবস্থা হয়নি বটে, তবে এবার যেতেই হবে,—জামা কাপড়ের অবস্থা যাই হোক না কেন।

ভয়ে ভয়ে সন্তোষের দিকে আমি কয়েক পা এগিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম,—অন্তত মারাত্মক রোগের ছোঁয়াচটা বাঁচুক। সন্তোষ বললে, কুকুরটাকে সাবধান বাবু, বুড়ি একবার চটলেই মুখের শব্দ ক'রে কুকুরটাকে লেলিয়ে দেয়। ওটা ভারি পাজি।

বুড়ি আবার কাঁথা মুড়ি দিয়ে আড় হয়ে শুয়ে পড়লো। ভিতরে ঢুকে বিড় বিড় ক'রে কি যেন বকছে। সন্তোষ বললে, অতগুলো মামলা বাধিয়ে রেখেছে, মাগি মরলে সকলের হাড় জুড়োয়, বাবু।

বললুম, কিসের এত মামলা সন্তোষ?

ওই ত' বলে কে? একজনের পেছনে আরেকজনকে উসকিয়ে দেয়, এই ওর চিরকালে স্বভাব। এই দেখুন না এই যে সামনের জমিটা,—প্রায় পৌনে তিন বিঘে,—এ জমি হ'ল খিদিরপুরের চাটুয্যেদের। ও মাগি বেনামীতে চোদ্দ বছর খাজনা জুগিয়ে এই জমি দখল নিয়েছে। অত বড় জমিদার হিমসিম খাচ্ছে হাইকোর্টে গিয়ে। দু হাজার টাকা ক'রে এ জমির কাঠা!

কুকুরটা এবার আমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ গোঁ গোঁ ক'রে উঠল। সন্তোষ তাড়াতাড়ি করাতখানা হাতের কাছে টেনে নিল। চেয়ে দেখি বৃষ্টি এবার ধ'রে গেছে। এবার এ নরককুণ্ড থেকে বেরোতে পারলে বাঁচি।

চারিদিকে জল জমেছে। আকাশ কিন্তু এবার শান্ত। আমার সঙ্গে সঙ্গে সন্তোষ কয়েক পা বাইরে বেরিয়ে এলো। বললে, বুড়ির মরবার আর দেরি নেই। তবে পুরনো হাড় কিনা বাবু, ক্ষয় হ'তে সময় লাগে। কিন্তু ওর চেহারা যা দাঁড়িয়েছে, এবার যাবে। আর একটা ওলাউঠোর ধাক্কা যদি যায়, ও নিজেই কাৎ হবে! এ সব কি জানেন, মরবার আগে কামড় দিচ্ছে! মরবে নিশ্চয়ই।

সন্তোষকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে হন হন ক'রে এবার বাড়ির দিকে অগ্রসর হয়ে চললুম।

কানাকানিতে খবরটা অনেকদূর পর্যন্ত র'টে গিয়েছিল। শেষের দিকে এমন অবস্থায় এলো যে, কারো মুখেই হাত চাপা দেবার উপায় রইলো না।

দূর সম্পর্কের এক বৌদিদি ওকে সতর্ক ক'রে বলেছিলেন, না হয় মনের একটা বিকার ঘটেই গেছে, তাই ব'লে কি ওটাকে আঁকড়ে থাকতে হবে? এমন ত' আর কিছু নয় যে তুই বাঁধা পড়েছিস! মানুষ কত শোক-তাপ দুঃখ ভুলে যায়, ভাঙ্গা মন জোড়া দিয়ে কাজকর্মে লাগে, আর তুই এই সামান্য ব্যাপারটা সইয়ে নিতে পারবিনে?

ছোট মামী ব'লে গিয়েছিলেন, জন্মে অরুচি ধ'রে গেল! আকাশের চাঁদ ত' আর নয় যে, একটি বই দ্বিতীয় নেই। কি এমন রাজপুত্তুর আর অর্ধেক রাজত্ব পাবি যে, ধনুর্ভাঙ্গা পণ! গা জ্বলে যায়! কপালে তোর দুঃখ আছে!

পিসেমশাই সেবার কি যেন চাকরি নিয়ে দিল্লী যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, ছেলের পরিচয়টাও ত' ভালো নয় শুনছি। আগে নাকি জুয়া খেলতো। স্বভাব-চরিত্রটাও সম্ভবতঃ জুয়াড়ির সঙ্গে মেলানো!

বড়পিসি বললেন, চাল নেই চুলো নেই—ভাব ক'রে অমনি বিয়ে করলেই হ'ল! ভাত কাপড় পাবি কোত্থেকে শুনি? দেশে বুঝি আর সৎপাত্র খুঁজে পেলিনে?

একজন টিটকারি দিয়ে বললে, সাবিত্রী চলেছেন কাঠুরিয়া সত্যবানের ঘরে।

বড়পিসি বললেন, তার পেছনে রাজা অশ্বপতি ছিল গো। এ যে শুকনো চ্যালাকাঠ, এতটুকু রস নেই। শেষকালে কাঠ বেচেই পেট ভরাতে হবে।

সেদিন সকলের সব কথা আরতিকে মুখ বুজে শুনতে হয়েছিল। কেবল তাই নয়, ট্যুইশনি ক'রে তাকে কলেজের মাইনে জোগাতে হ'ত—কিন্তু এই প্রকার কানাকানির ফলে তাকে ট্যুইশনিও ছাড়তে হ'ল। কোনো কথাতেই সে আঘাত পেল না, এবং কোনো কথাই তার কাছে মূল্যহীন ব'লে মনে হ'ল না। কিন্তু ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল এই যে, একটা দুশ্ছেদ্য অন্ধ আকর্ষণ তাকে টেনে নিয়ে চলেছিল একটা পরিণতির দিকে। তার ফিরবার পথ ছিল

না। যাবার সময় তাকে কেবল এই কথাটা শুনে যেতে হয়েছিল, তোর মা বাপ মরেছিল ধান ভেনে, তুই এসে পরের বাড়িতে গাঁ-সম্পর্ক পাতিয়ে মানুষ হলি, —তোর লজ্জা নেই! ভাব ক'রে বিয়ে হয় বড় মানুষের ঘরে,—গরীবের মেয়ের অত ঘোড়া-রোগ কেন?

বিদায় নেবার আগে আরতিকে এবাড়ির সঙ্গে সকল সম্পর্ক মুছে যেতে হয়েছিল। তাতে বেদনাবোধ ছিল অনেক, কিন্তু অনুশোচনা ছিল না।

ভরা বর্ষার কোনো এক সকালের দিকে আরতি ট্রেণ থেকে নামলো সাঁওতাল পরগণার একটি স্টেশনে। সঙ্গে মীরাদির একখানা চিঠি ছিল। তিনি লিখেছিলেন, স্টেশনে নেমে পূর্বদিকে চওড়া রাস্তা ধ'রে কিছুদূর উত্তরে আসবি। টিলাপাহাড়ের ধার, পাশেই বালু নদী। নদী পেরোতে হবে না, আবার পূর্ব-দিকের পথ ধরবি নদীর ধার দিয়ে। আমাদের দোতলা বাড়ি মাঠের মাঝখানে একা দাঁড়িয়ে,—শাদা রং। বাড়ির দক্ষিণে পুরনো শিব মন্দির।

শিবমন্দিরের পাশ দিয়ে আরতি বাড়ির ভিতরে এসে ঢুকলো। মীরাদিদি তাড়াতাড়ি নেমে এসে আরতির হাত ধ'রে বললেন, চোখে জল কেন রে?

স্নেহের স্পর্শে অনেকটা কান্নাই আরতির গলার ভিতর দিয়ে উঠে এসেছিল, কিন্তু সংযত কণ্ঠে বললে, না, কিছু না—তোমার ছেলে-মেয়ে ভালো আছে?

মীরাদি বললেন, অনেক ভুগিয়ে এখন একটু ভালো। আয় ভেতরে আয়। ওপরে দক্ষিণ দিকের ঘরে তুই থাকিস। আমি জানতুম আজই তুই আসবি।

কেমন ক'রে জানলে?

হাত গুণে!

আরতি হেসে বললে, হাত গুণতে জানো তুমি?

খুব জানি—এই দেখনা!—মীরাদি আঙুল গুণে বললেন, বুধবারে আমার চিঠি পেয়েছিস। বেস্পতিবার সারাদিন ভেবেছিস আর পাঁচজনের খোঁটা খেয়েছিস। শুক্রবার রাত্তিরে গাড়িতে উঠেছিস,—আজ হ'ল শনিবার। কেমন, মেলেনি?

আরতি বললে, এবার হাত গুণে আমার ভবিষ্যৎটা বলো ত'?

মীরাদি বললেন, তোর ভবিষ্যৎটাও শেকল দিয়ে বেঁধে রেখেছি। দেখগে যা ওপরে গিয়ে। আজ আটদিন হ'ল বিছানায় প'ড়ে আছে।

কে? নবেন্দু?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ,—এবার যাও সেবা করগে। আরতি ভীতকণ্ঠে বললে, এ তুমি কী করলে মীরাদি? লোকে কি বলবে?

মীরাদি বললেন, লোকের মুখ চেয়ে কি তোমরা প্রণয়কাণ্ড ঘটিয়েছিলে?

কিন্তু নিজের কাছে মাথা হেঁট হবে যে।

কেন?

আমরা কি কোনোদিন একবাড়িতে থেকেছি?

মীরাদি আরতির দিকে তাকালেন। আরতি কম্পিত কণ্ঠে বললে, আমাকে আজ বিকেলের গাড়িতে ছেড়ে দাও, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, মীরাদি।

মীরাদি বললেন, যে-বিদ্যে নিয়ে বি-এ পড়েছিস, সে-বিদ্যে পালালো কোথায়? নিজের ওপর বিশ্বাসের জোর নেই কেন?

আরতি ভগ্নকণ্ঠে বললে, ওকে আমি ঘরের মধ্যে কোনোদিন দেখিনি, যে! কোনোদিন দেখিনি বিছানায় শোয়া! সেবা করবো কোন অধিকারে?

যে-অধিকারে ওকে পুড়িয়ে মারছিস তিন বছর ধ'রে!

পুড়ে মরতে চাই, পুড়িয়ে মারতে চাইনে, মীরাদি।

ঝি এসে চায়ের সঙ্গে খাবার দিয়ে গেল। মীরাদি বললেন, চা খেয়ে ওপরে যাই চল্।

আরতি বললে, ও কি জানে আমি আসবো?

জানে।

কিছু বলেছে?

আমার ওপর রাগ করেছে।

কেন?

যে-কারণে তুই এখন রাগ করলি?

চায়ের পেয়ালা রেখে আরতি একাই ওপরে উঠে গেল। মীরাদি গেলেন রান্নাঘরের দিকে।

একখানা বই হাতে নিয়ে নবেন্দু তক্তার ওপর শুয়েছিল। পায়ের দিকে একখানা চাদর টানা। আরতি আস্তে আস্তে ভিতরে এসে দাঁড়ালো।

বইখানা পাশে রেখে নবেন্দু বললে, সমস্তটাই মীরাদির ষড়যন্ত্র। আমার দোষ কিছু নেই!

আরতি বলল, কলকাতা ছাড়বার আগে আমাকে জানাওনি কেন?

তোমাকে জানিয়ে কি কোনো কাজ করি?

আরতি কিছুক্ষণ দাঁড়ালো। পরে বলল, জ্বর কি আছে এখনও?

থাকলেই বা।

এপ্রকার কথালাপ ওদের পক্ষে গা-সওয়া। উভয় পক্ষের উত্তর এবং

প্রত্যুত্তরের মধ্যে কোনো সংযোগ না রেখেই আরতি এক সময় বললে, যে চাকরিটার চেষ্টা করছিলে, সেটার কি আশা আছে ?

নবেন্দু বললে, আশা হয়ত আছে, কিন্তু তার ভরসায় বিয়ে করা চলে না। মীরাদি যতই বলুন।

আরতি বললে, আমি কি বলেছি যে, তুমি চাকরি করবে, আর আমি ব'সে থাকবো ?

নবেন্দু বললে, কপালে সিঁদুর উঠলে মেয়েছেলের ওপর ভরসা কতটুকু ?

আরতি বললে, তবে কি তুমি বলতে চাও, আমি দুদিক থেকেই এমনি ক'রে মার খেয়ে বেড়াবো ?

তুমি সেই রাজসাহীর মেয়ে-ইস্কুলে গিয়ে মাষ্টারী করতে পারো!

আর তুমি ?

আমি ?—নবেন্দু ক্ষীণ হাসি হেসে বললে, আমি ভোজনং যত্র তত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে!

আরতি বললে, জ্বর কি একবারও ছাড়েনি ক'দিন ?

না। ভূত না ছাড়লে জ্বর ছাড়ে না।

ভূত চেপেছে আমার ঘাড়ে তিন বছর। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারলে!

নবেন্দু বললে, আমার ঘাড়ে চেপেছে পেত্নী,—ছাড়বার কোনো লক্ষণ দেখিনে!

তুমি বুঝি ছাড়াতে চাও ?

একশো বার।

আরতি বললে, তোমার জন্যে আমি সব খুইয়ে এসেছি তা জানো ?

নবেন্দু বললে, সংসারে তোমার একখানা ভাঙ্গা খুন্তিও নেই! সব খোয়াবার মানে কি ?

দুধ-সাগুর বাটি হাতে নিয়ে মীরাদি ঘরে ঢুকলেন। বললেন, তোমাদের কপাল মন্দ। কলকাতার পথে-ঘাটে, আড়ালে-আবডালে লোকের চোখে ধূলো দিয়ে দুজনে ঘুরে বেড়াতে,—একটু নিরিবিলি দেখাশোনা হবার ঠাঁই মিলতো না। এখানকার মতো এত সুবিধে পেয়েছো কোনোদিন ?

নবেন্দু বললে, সেই জন্যেই ত' ভয় করে।

মীরাদি বললেন, লুকোচুরি করা বেশীদিন ভালো নয়, ওতে নোংরা জমে ওঠে। তার চেয়ে এই ঘরের মধ্যে ব'সে দুজনে মুখোমুখি তাকাও। যারা ধ'রে রাখতে পারে না, ছেড়ে দিতেও চায় না—তা'রা কষ্ট পায়, নবেন্দু।

নবেন্দু বললে, আমার শেষ কথা কাল রাত্রে ত' আপনাকে জানিয়েছি, মীরাদি !

মীরাদি বললেন, মেয়েটা কেঁদে কেঁদে পথে ভেসে বেড়াবে, সেই কি তোমার পৌরুষ ? তিন বছর আগে তোমার এই নীতিবোধ ছিল কোথায়, নবেন্দু ?

আমরা ত' আজো কোনো অপরাধ করিনি !

তোমরা যে জন্তু জানোয়ার নও, সেকথা চেঁচিয়ে বলার দরকার নেই। মেয়েমানুষের সামাজিক দায়িত্ব পুরুষের হাতে, একথা ভুলে মেলামেশা করেছিলে কেন ? –নাও, খেয়ে নাও ভাই। কই দেখি –জ্বর ত' ছেড়েছে মনে হচ্ছে।

মীরাদি নবেন্দুর কপালে হাত দিয়ে পরীক্ষা করলেন। তারপর একবাটি সাগু খাইয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আরতি চুপ ক'রে জানালার ধারে দাঁড়িয়েছিল। তার দিকে তাকিয়ে নবেন্দু বললে, এসব কথায় তোমারও সায় আছে বোধ হয় ?

আরতি বললে, যতই দিন যাবে, ততই এসব কথা উঠবে।

নবেন্দু কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। পরে বললে, তুমি এখানে এসেই মাটি করলে। তোমার মতলব ভালো নয়।

মতলব তোমারই কি খুব ভালো ছিল ?

এর চেয়ে দুজনে দুদিকে চ'লে গেলেই ভালো হ'ত। নবেন্দু ক্ষুব্ধভাবে মুখ ফিরিয়ে নিল।

আরতি বললে, তার চেয়ে ভালো দুজনের একজন যদি মারা যায়।

নবেন্দু বললে, তুমি কি আমার মৃত্যুকামনা করো ?

করি।

কেন, অপরাধ ?

তুমি থাকলে পাছে আর কেউ জ্ব'লে পুড়ে মরে, তাই জন্যে।

কিন্তু তুমি বাঁচলেও ত' সেই একই কথা !–শোনো, শুনে যাও।

আরতি মুখ ফিরিয়ে থমকে দাঁড়ালো। নবেন্দু বললে, কাছে এসো।

আরতির গা কেঁপে ওঠে। বলে, না।

আচ্ছা, আর এক গজ এগিয়ে এসো।

বলো না, শুনছি। –আরতি একটু এগিয়ে আসে।

নবেন্দু বললে, তোমার দাঁড়াবার জায়গা নেই জানি, আমারও নেই, –অথচ বিয়ের সখ দুজনের। আচ্ছা, তুমি ঘরকন্না করতে পারবে ? মনে রেখো রীতিমতো ঘরকন্না।

ঘরকন্না আবার কি?

বিয়ের পর থেকে দুজনে যেটা আরম্ভ। অর্থাৎ ঘুঁটে কয়লা, কুটনো-বাটনা আলু-পটলের ফর্দ।

আরতি বললে, তোমার কথা শুনলে বিয়ের ওপর ঘেন্না ধরে।

নবেন্দু বললে, এবং বিয়ের পর থেকে নিজের ওপর ঘেন্না ধরবে। আগুনের আঁচে মনটা আঁউরে যাবে।

বিয়ে করতে চাই তোমার জন্যে, বিয়ের জন্যে নয়। আরতি মুখ ফুটে বললে।

নবেন্দু বললে, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য কি জানো? বিয়ের নর্দমায় আমরা না মুখ থুবড়ে প'ড়ে মরি। বিয়ে দেয় বন্ধন, ভালোবাসা দেয় মুক্তি! তাছাড়া শোনো আর এক কথা। এ-বিয়ে সামাজিক হবে না, কেননা জাতিগত প্রভেদ। অর্থনৈতিক হবে না, কেননা দুজনেই গরীব। ফল হবে এই, একদল কুকুর আমাদের পিছু নেবে।

বাইরে মীরাদির গলার আওয়াজ পেয়ে আরতি পুনরায় স'রে দাঁড়ালো। মীরাদি ভিতরে গলা বাড়িয়ে বললেন, আর নয়। মেয়েটা রাত জেগে গাড়িতে এসেছে। আরতি যা, স্নান ক'রে নে।

আরতি নতমুখে বেরিয়ে গেল।

এর পরে ওদের যা অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, তাই ঘটলো। মীরাদি মাঝখানে দাঁড়িয়ে থেকে যে কাজ করলেন, সেটাকে সামাজিক অথবা সাংসারিক কোনোটাই বলা চলে না—আচারগত ত' নয়ই।

পরদিন সন্ধ্যায় মীরাদি নিজের তোরঙ্গ থেকে একখানা পোষাকী শাড়ি আরতিকে পরিয়ে নিয়ে গেলেন শিবমন্দিরে, অসুস্থ নবেন্দু গেল সঙ্গে সঙ্গে। সেখানে গিয়ে ঠাকুরের সামনে দাঁড়িয়ে নবেন্দু নিজের হাতে প্রসাদী সিঁদুর নিয়ে আরতির সীঁথিমূলে পরিয়ে দিল। মীরাদি একবার শঙ্খধ্বনি করলেন এবং তাঁর ছেলেমেয়ে দুটি মিষ্টান্ন হাতে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলো।

আত্মীয় বন্ধুজনের থেকে ওরা অনেক দূরে চ'লে গিয়েছিল। যারা ওদের অধোগতি দেখার জন্য উৎসুক ছিল, ওরা গেল তাদের নাগালের বাইরে। ঘরকন্নার চেয়ে ওদের কাছে বড় ছিল প্রণয়, ছিল অনেক দিনের অবরুদ্ধ রংয়ের বন্যা। ওরা জানতে দিলো না কারুকে ওদের অস্তিত্বের সংবাদ। মেদিনীপুর জেলার এক ছোট শহরে গিয়ে আরতি সত্যই নিল বালিকা বিদ্যালয়ের

শিক্ষয়িত্রীর কাজ এবং নবেন্দু নিল এক উকিলের মুহুরিগিরি। স্টেশন মাষ্টার-মশাই ওদের বসবাসের একটা সুবিধা ক'রে দিলেন। দুজনে মিলে পঞ্চান্ন টাকা। এত টাকা দুজনে রোজগার করা যায়, ওরা ভাবতেও পারেনি। পল্লী অঞ্চলে খরচ কম, সুতরাং কিছু জমাতে লাগলো। কিন্তু বছর খানেক না যেতেই জানা গেল এখানকার ছোট হাকিম নাকি নবেন্দুর পিসতুতো দাদার মাসতুতো শালা। কুটুম্ব সম্বন্ধে নবেন্দুর যত ঘৃণা ছিল, নবেন্দুর সম্বন্ধে কুটুম্বমহলে ততখানি ঘৃণা ছিল না। ফলে তার জাতিদ্রোহী গান্ধর্ব বিবাহের পরিণতি দাঁড়ালো এই যে, আরতিকে নিয়ে নবেন্দু একদিন মেদিনীপুর ত্যাগ করতে বাধ্য হ'ল। এই ঘটনার অল্প দিনের মধ্যে আরতি একটি কন্যা প্রসব করে।

নবজাত কন্যাকে নিয়ে আরতি আর নবেন্দু কোন দিকে ভাগ্য-অন্বেষণে বেরিয়ে পড়লো, সে সংবাদ ওই দুটি তরুণ-তরুণী ভিন্ন আর কারো জানা ছিল না। অবশ্য মীরাদিদির কথা স্বতন্ত্র, কেননা এরও বছর দেড়েক পরে ঠিকানাকাটা একখানা চিঠি ঘুরতে ফিরতে তাঁর কাছে এসে পৌঁছয়। তা'তে জানা যায়, ২৪ পরগণার একান্তে কোনো এক চটকলের ধারে তারা দুজনে এক বস্তিতে বাসা নিয়েছে। দিন তাদের যাচ্ছে বড় কষ্টে। মীরাদিদি সেই চিঠি পড়ে একটুও ক্ষুব্ধ হননি, কেননা তাঁর কোনো অনুশোচনা ছিল না। সমাজনীতির গোড়ার কথাটা তাঁর জানা ছিল বৈকি। চিত্তদৌর্বল্য ও সঙ্কোচবৃত্তি তিনি বরদাস্ত করেন নি, দুজনকে তিনি মিলিয়ে দিয়েছেন। যদি ওদের শক্তি থাকে বাঁচবে; যদি না থাকে, তবে ঈশ্বর ওদের সহায় হোন!

এর পরে মীরাদি লিখছেন তাঁর ডায়েরীতে—

"আরতির বিয়ের পরে বার তিনেক মাত্র আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কিন্তু প্রথম যখন ওর সঙ্গে দেখা হ'ল, তখন ওর দুটি মেয়ে, একটি ছেলে। অনেক-দিন আগেকার সেই পুরনো ঠিকানা নিয়ে আমি বস্তির মধ্যে ঢুকেছিলুম, কিন্তু সেই বস্তির বর্ণনা করতে গেলে মাথা হেঁট হয়ে আসে। দুটো লেখাপড়া জানা ছেলেমেয়ে কোথায় গিয়ে নামলো তাই দেখে অবাক হলুম। ওরা বই পড়েছে, কিন্তু জীবনের সঙ্গে যোগ নেই; ভালোবেসেছে, কিন্তু কল্যাণচিন্তা করেনি। ওদের হৃদয় ছিল, বুদ্ধি ছিল না। কল্পনা ছিল, সাধারণ জ্ঞান ছিল না।"

দেখে এলুম ওদের দারিদ্র্য। তিনটে শিশু স্বল্পাহারে ধুঁকছে, যেন বিকলাঙ্গ বানর-শিশু। ঘরকন্না ওরা জানে না, জানলে দারিদ্র্যের মধ্যেও শ্রী থাকতো। এখানে ওখানে দু একটা ভাঙ্গা কলাইয়ের বাসন ছড়ানো, এদিকে ওদিকে নোংরা। একই চালায় একটি কোণ ভাড়া নিয়ে থাকে এক ভ্রষ্টা নারী। তাকে

দেখে আমি আঁৎকে উঠেছিলুম। আরতি এসে আমার কাছে বসে বললে, ভালো আছি মীরাদি।

ভালো আছিস? নবেন্দু কি করে?

চটকলে কাজ নিয়েছে।

তুই কি করিস?

দেখতেই পাচ্ছ।

পাছে আঘাত পায়, এজন্য আলগোছে বললুম, জীবনটাকে অন্যভাবে গ'ড়ে তুলতে পারলিনে?

আরতি বললে, এই বা মন্দ কি? তুজনে যেখানেথাকি সেটাই কি স্বর্গ নয়?

আমাকে চিঠি লিখে'ছিলি কেন?

আরতি বললে, আমাদের বিয়ের প্রত্যেক বাৎসরিক তিথিতে তোমাকে মনে পড়ে। এবারে তাই লিখেছিলুম। তুমি এসে দেখলে খুশী হবে এই ছিল আশা।

তবে সুখেই আছিস বল?

আমি তুঃখ পাচ্ছি, এই ভেবে কি তুমি কাঁদতে এসেছিলে?

আমি হাসলুম। বললুম, এটা অভিমানের কথা, আরতি। সন্ন্যাসীরা যখন যোগাসনে বসে, তখন তাদের পরনে হয়ত লেংটিও থাকে না। কিন্তু তুই? একি তোর যোগাসন? একখানা আস্ত কাপড় প'রে এসে অতিথির মান রাখতে পারলিনে?

নবেন্দুর সঙ্গে আমার দেখা হ'ল না। ঠিক বুঝতে পারিনে, দেখা হলে ধৈর্য রাখতে পারতুম কিনা। বোধ হয় পারতুম, কারণ নবেন্দু বলেছিল—এ বিয়েতে কাজ নেই মীরাদি। ভাঙ্গা মন একদিন হয়ত জোড়া লাগতে পারে, কিন্তু জীবনটা যদি ভেঙ্গে তচনচ হয়ে যায়, তবে তাকে নতুন ক'রে জোড়া দেওয়া বড় কঠিন। তুমি আমার কাছ থেকে আরতিকে সরিয়ে দাও।

আমি বলেছিলুম, তবে কি তোমাদের এই ভালোবাসা মিথ্যে?

নবেন্দু হেসে উঠেছিল। বলেছিল, এ-যুগের যৌবন দাউ দাউ ক'রে জ্বলছে, ফুলের গোছা তার কাছে আনলে ফুলের অপমৃত্যু। ভালোবাসা এ যুগে স্থগিত থাকুক।

ডায়েরীর পাতা উলটিয়ে মীরাদি আবার লিখেছেন, "ভোলবার চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু আরতি আমাকে ভুলতে দেয়নি। বছর তুই পরে বেলেঘাটার এক ঠিকানা থেকে সে আমাকে লিখেছিল, আগের চেয়ে এখন আরো ভালো

আছি, তার কারণ আমার চারটি ছেলেমেয়ের মধ্যে সম্প্রতি মহামারীতে দুটি মারা গেছে। এখন খরচপত্র কিছু ক'মে গিয়ে কতকটা সুবিধা হয়েছে। তোমার সঙ্গে দেখা হলে কিছু নতুন অভিজ্ঞতার কথা শোনাতে পারতুম। আমি ভালো নেই—একথা ভেবে যেন তুমি মিথ্যে দুঃখ পেয়ো না।"

বেলেঘাটার সেই বস্তির ঠিকানায় একদিন গিয়ে দাঁড়ালুম। নবেন্দু এগিয়ে এলো বটে, কিন্তু নবেন্দুকে আমি চিনতে পারলুম না। হেসে বললুম, প্রায় সাত বছর পরে দেখা, আমাকে চিনতে পারো, নবেন্দু।

নবেন্দু হাসিমুখে বললে, চিনতে যে পারতো, সে বেঁচে নেই!

বললুম, জীবনযুদ্ধে জয় হ'ল, না পরাজয়?

নবেন্দু জবাব দিল, ঠিক বুঝতে পারলুম না। যন্ত্রের কোনো স্বকীয়তা নেই, যন্ত্রীর হাতে সে পুতুল। আমরা সেই যন্ত্র, আমাদের ধ্বংস হয়েও হয়ত যুদ্ধে জয় হয়!

বললুম, এটা অদৃষ্টবাদীর কথা, পুরুষের কথা নয়, নবেন্দু!

পুরুষ!—নবেন্দু হাসলো। বীরপুরুষরাও কি জুয়া খেলায় হারে না, মীরাদি?

এমন সময় আরতি ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে মীরাদির পাশে বসলো। মাথায় রুক্ষ চুলের জটা, কোটরগত দুই চোখ, মুখখানা ভেঙ্গে লম্বা হয়ে গেছে, দেহখানা কঙ্কালসার। আমি আরতিকে প্রায় আমার কোলের মধ্যে টেনে নিলুম। কিন্তু হঠাৎ তার আলগা পিঠের ওপর হাত বোলাতে গিয়ে চমকে উঠে বললুম, এ কি রে? দড়া দড়া ফুলেছে কেন?

নবেন্দু বললে, আমার দানবীয় উত্তেজনার চিহ্ন পড়েছে ওর পিঠে মীরাদি।

আমি বললুম, চাবুক, না চ্যালাকাঠ?

উত্তেজনার সময়ে কোনটা ব্যবহার করেছিলুম, ঠিক মনে নেই।

বললুম, ঘটনাটা ঘটলো কখন?

নবেন্দু বললে, জানতুম রোজ সন্ধ্যেবেলা ওর জ্বর আসে, সেইজন্য ঘণ্টা চারেক আগে কাজটা সেরে রেখেছি।

এর স্থূল কারণটা কি, নবেন্দু?

প্রেতকায় নবেন্দু আবার হাসলো। বললে, খুব সহজসাধ্য ব্যাপার! জীবনযুদ্ধে মার খাওয়া, চিত্তপীড়া, দারিদ্র্য, আত্মগ্লানি, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভয়—আর কি শুনতে চান বলুন?

আরতির চোখের জল গড়িয়ে পড়ছিল আমার পাঁজরের কাছে। তাকে এবার একটু নাড়া দিয়ে প্রশ্ন করলুম, কি রে, তোর আত্মগ্লানি নেই? বল্ না?

আরতি জবাব দিল, না নেই!

হেসে বললুম, পিঠের চামড়া ফেটে গেল মার খেয়ে, তবুও নেই?

আরতি বললে, সহ্য করতে পারি, তাই মার খাই। দুর্বলকে ত' কেউ মারে না, মীরাদি?

নবেন্দু নতমুখে চ'লে গেল বাইরের দিকে। তার আর দাঁড়াবার সাধ্য ছিল না।

বললুম, আচ্ছা, আরতি—একটা কথা বল ত', আমি কি তোদের দুজনকে নষ্ট করেছি?

আরাত বললে, না।

সত্যি বলছিস?

আরতি বললে, তুমি দুজনকে মিলিয়ে দিয়েছিলে। কিন্তু আমি কেবল তার থেকে একটা মানে খুঁজে পেয়েছি—যেটা আমার নিজের কাছে সত্যি।

বললুম, নবেন্দুর কাছে সত্যি নয়?

না। সত্যি নয় বলেই ও প্রতিবাদ করে, ছোবল মারে, আমারও পিঠে দাগ টেনে দেয়!

আর তুই?

আমি মানে পাই, তাই আমার আনন্দ, তাই আমার কোনো দুঃখ নেই মনে। মার খেলে কান্না পায় না, কেবল ওই ওর দুঃখ সইতে পারিনে, মীরাদি।—আরতি ঝর ঝর ক'রে শেষ দিনের কান্না কাঁদলো আমার পিছন দিকে মুখ লুকিয়ে। কিন্তু আমার আর সেদিন বসবার সময় ছিল না। নিঃশব্দে উঠে অগ্রসর হলুম।

একটা ক্ষণিক আবেগ-বিহ্বলতা উঠে এসেছিল আমার কণ্ঠে। বললুম, তুই কি বলতে চাস তোদের এই মিলন সার্থক?

আরতি স্পষ্ট ক'রে বললে, নিশ্চয়ই।

বললুম, আমি হার মেনেছি. কিন্তু তুই কি কিছুতেই হার মানবি নে?

দেওয়াল ধ'রে ধ'রে রুগ্ন দেহ নিয়ে আরতি আমার দিকে এগিয়ে এলো। বললে, না, মানবো না। তুমি অন্ধকার সুড়ঙ্গপথে আমাকে ঠেলে দিয়েছিলে, আমি খুঁজে পেয়েছি সোনার খনি, সেই আমার পরমার্থ!

আর কোনো কথা না ব'লে আমি পথে নামলুম। অন্ধকার বস্তির নোংরা অলি গলি পেরিয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠলুম। ভাবছিলুম, আমি আরতিকে হত্যা করেছি, এ কথাটা মিথ্যে। ও নিজেই নিজের মৃত্যুবীজ বহন ক'রে এনেছে।

দারিদ্র্যটা কাটিয়ে উঠতে নবেন্দুর অবশ্য কয়েকটা বছর লেগেছিল এবং সেই দারিদ্র্য থেকে উত্তীর্ণ হবার জন্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মুদ্রাস্ফীতিরও দরকার হয়েছিল।

জরাজীর্ণ যে মন্দিরে দাঁড়িয়ে ঠাকুরের সামনে নবেন্দু একদা আরতির সিঁথিমূলে সিঁদুরের রেখা টেনে দেয়, সেই মন্দিরটাকে নবেন্দু পুনর্গঠন করে, এজন্য তার বহু টাকা খরচ হয়। নাটমন্দির, ফুলের বাগান, পূজারীর বাসস্থান, অতিথিশালা, ঠাকুরের দৈনিক ভোগের ব্যবস্থা,—কোনোটারই ত্রুটি ঘটলো না। আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়ে নবেন্দু নাকি ফুলে ফেঁপে উঠেছে!

নগরের রাজপথের উপর সে নাকি এক অট্টালিকা নির্মাণ করেছে। তারই গৃহ প্রবেশের উৎসবে আমন্ত্রণ জানিয়েছে মীরাদিকে। তাঁকে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে হবে।

একখানা নূতন মোটর গাড়ী এসে মীরাদিকে নিয়ে গেল। মীরাদি অকম্প, নিঃঝুম। আজকের আনন্দ-উৎসবে ওরা তাঁকে ভোলেনি। ওরা অন্ধকার থেকে আলোয় এনেছে, মৃত্যুর থেকে ফিরে এসেছে জীবনে। মাঝখানে কয়েকটা অভিশপ্ত বছর,—ওরা মূল্য দিয়েছে প্রচুর! সমস্ত ব্যাপারটা ভাগ্যের যাদুবিদ্যার মতো।

নবনির্মিত অট্টালিকার বিচিত্র দালান আর বারান্দা পেরিয়ে মীরাদি যখন শয়নকক্ষে এসে দাঁড়ালেন, তখন দেখা গেল, নবেন্দু বেহুঁস হয়ে প'ড়ে রয়েছে বিছানায়। পাশে তার নূতন বধূ ব'সে স্বামীর সেবা করছে। ঘরের হাওয়া ঘুলিয়ে রয়েছে সুরার গন্ধে।

নূতন বধূ উঠে এসে আস্তে আস্তে বললে, উনি যেন কি খেয়ে আসেন বাইরের থেকে……তারপর, এই ত'!—আপনি বসুন!

মীরাদি বললেন, দেওয়ালে ফুল দিয়ে সাজানো ছবিখানা কার?

বধূ বললেন, ওঁর আগেকার স্ত্রীর!

ছেলেমেয়ে দুটি?

তারা কনভেন্টে থাকে।

মীরাদি বললেন, আমি আর একদিন আসবো, নবেন্দুকে ব'লে রেখো ভাই।—

মীরাদি মুখ ফিরিয়ে বাইরের দিকে অগ্রসর হলেন এবং পিছন থেকে এক জোড়া চোখ তাঁকে অনেক দূর পর্যন্ত অনুসরণ করতে লাগলো। সেই চোখ নববধূর নয়, সে-চোখ দেওয়ালের ছবির থেকে নেমে যেন তাঁর পিছু নিয়েছিল।

রোগী দেখার জন্য এ বাড়িতে ডাক্তারবদ্যিরা আসে, কিন্তু যে-ব্যক্তি রোগীর সেবা ও পরিচর্যা করে, তাকে দেখবার জন্য আসে এপাড়া ওপাড়ার মেয়েরা। এমন কি বাড়ির সামনের পথ দিয়ে যে-সকল মুখচেনা ভদ্রলোকরা আনাগোনা করেন তাঁরাও উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে চ'লে যান—যদি কোনো সময়ে হঠাৎ শুশ্রূষাকারিণীর দর্শন মিলে যায়।

পাড়ার মেয়েরা বলে, এমন দেখিনি! অনেক পুণ্যে লোকটা এমন স্ত্রী পেয়েছিল। পাঁচ বছর ধ'রে স্বামীর মাথার পাশে ব'সে রাত জাগছে, একটি দিনও ঘুমোয়নি—এ ঘটনা কি না দেখলে বিশ্বাস করতো কেউ?

কেউ বা ওরই মধ্যে একটু ব্যঙ্গাত্মক হাসি মিলিয়ে বলে, আদর্শ হিন্দু স্ত্রী।

এমনি বিলেত ফেরতা ডাক্তার ভৌমিকও সেদিন কথায় কথায় বলছিলেন. স্বামীর প্রতি অন্ধ ভালোবাসা দেখে এসেছি লণ্ডনের কোনো কোনো পরিবারে, কিন্তু রুগ্ন স্বামীর মাথার পাশে পনেরো রাত্রি ধ'রে কোনো মেয়ে বসে থেকেছে—একথা শুনলে তারাও বিশ্বাস করবে না। এ কেবল ইণ্ডিয়াতেই সম্ভব। আপনি কি সত্যই রাত্রে ঘুমোন না, মিসেস রায়?

শিবানীর মুখে চোখে চিন্তাবৈলক্ষণ্যের রেখা মাত্র দেখা গেল না। তিনি বললেন, সময় পেলে ঘুমোতুম বৈ কি।

পনেরো বছরের মেয়েটি আজ প্রায় পাঁচ মাস শয্যাগত; বারো বছরের ছেলেটি আশৈশব মৃগী রোগে ভুগছে। পারিবারিক অবস্থাটা সচ্ছল। বাড়িতে ঠাকুর চাকর ঝি—সবাই আছে। ওরা থাকে ঘরসংসার নিয়ে, শিবানী থাকেন রোগীদের নিয়ে। বাড়ির ভিতরের চারিদিকে অদ্ভুত রোগের চক্রান্ত,—বিচিত্র এবং বিভিন্ন ঔষধের সংমিশ্রিত কড়া গন্ধ দিবারাত্র বাড়ির মধ্যে ভেসে বেড়ায়, —এবং এই সকল দুরারোগ্য ব্যাধির একটা নিত্যনৈমিত্তিক ষড়যন্ত্র প্রায় পাঁচ বছর থেকে শিবানীকে স্থির থাকতে দেয়নি। ওই কটু ও কঠিন গন্ধটাই ওঁকে সক্রিয় ক'রে রাখে।

সেদিন পাড়ার একটি মহিলা প্রশ্ন করেছিলেন, আপনার স্বামীর হাতে
এতখানি সুতো বাঁধা কেন, বৌদিদি ?

আসছি।—ব'লে শিবানী স্বামীর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। টেবিলের ওপর
থেকে এক দাগ ওষুধ নিয়ে স্বামীর মুখে ঢেলে দিলেন, পরে কাচের পাত্র থেকে
চারটি বেদানার দানা নিয়ে রোগীকে খাওয়ালেন। উচ্ছিষ্টের পাত্রটা ধরলেন
মুখের কাছে। কাজ সেরে আবার বেরিয়ে এলেন।

বাইরে এসে সেই মহিলার দিকে ফিরে বললেন, হ্যাঁ, ওগুলো সুতো। বাবা
তারকনাথের তাগা।

কবে পরালেন ?

দু'বছর আগে।

মহিলা প্রশ্ন করলেন, আপনাদের বিশ্বাস আছে বুঝি ?

রেখাহীন নির্বিকার মুখে শিবানী বললেন, তারকনাথে গিয়ে আমি ধর্না
দিয়েছিলুম। তিনদিন পরে ওষুধ পাই আঁচলে। সেই ওষুধ ওঁর গলায়
ঝোলানো।

আপনার মেয়ের গলার কবচখানাও বুঝি তাই ?

না, ওটা শুদ্ধিবাবার কবচ। হাতে সিদ্ধেশ্বরীর মাদুলী।—শিবানী চ'লে
গেলেন অন্য ঘরে।

সেদিন বত্রিশটি টাকা পকেটে পুরে ডাক্তার ভৌমিক বেরিয়ে যাচ্ছিলেন।
রোগীর সামনেই শিবানী বললেন, ডাক্তারবাবু, আপনার হাতে রোজ দিতে
আমি লজ্জা পাই। এক কাজ করুন, এই টানায় আমার টাকা আছে, আপনি
ওর থেকে আপনার ফী গুণে নিয়ে যাবেন রোজ।

মুখের চেহারায় ও কণ্ঠস্বরে কিছুমাত্র উত্তাপ নেই, যেন কলের পুতুল
কথা কইলো। যে আজ্ঞে—ব'লে ডাক্তার চ'লে গেলেন। এমন সময়
বারান্দার পূর্বদিকের দালানে শোনা গেল মসমসে জুতোর আওয়াজ। একটু
পরা গেল কন্যার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন হোমিওপ্যাথী ডাক্তার। ভদ্রলোকের
বয়স কম, চোখে চশমা, কোটপ্যান্ট পরা—মাথায় মস্ত টাক। ওই ধার থেকেই
ভেসে এলো কড়া ফিনাইলের গন্ধ। বাড়ি এতক্ষণে ফিনাইল দিয়ে ধোয়া হচ্ছে।
স্বামীর ঘরে এলেন শিবানী। বেলা ঠিক সাড়ে ন'টা ঘড়িতে। গরম জলে
তোয়ালে ডুবিয়ে নিংড়ে স্বামীর মাথা ও গা মুছিয়ে দিলেন। স্বামী যেন কী
বলছিলেন বিজ বিজ ক'রে—কিন্তু শিবানী নিজের মনে কাজ ক'রে গেলেন।
রোগীর মুখে পথ্য দিয়ে এক সময়ে তিনি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ডাকলেন, মালী!

চাকর এসে দাঁড়ালো। শিবানী বললেন, দিদিমণির ঘরে দুধ দাও।

মালী চ'লে গেল। একটা ছোট শিশির ছিপ খুলে শিবানী একবার স্বামীর নাকের কাছে ধরলেন, তারপর শিশিটি যথাস্থানে আবার রেখে তিনি বেরিয়ে এলেন? গন্ধটা শোঁকানো দরকার।

বারান্দা পেরিয়ে শিবানী কোণের ঘরে এসে ঢুকলেন। সামনে যে-দৃশ্য দেখা গেল, সন্তানের জননী ছাড়া আর যে-কেউ দেখলে শিউরে উঠতো। ছেলেটা অজ্ঞান হয়ে একতাল মাংসপিণ্ডের মতো বেঁকেচুরে পড়ে রয়েছে। বাঁকা পা দুটো ঢুকেছে পেটের মধ্যে, বাঁকা মুখের পাশ দিয়ে চোখ দুটো নাকের পাশে কোথায় হারিয়ে গেছে। ছেলেটা অজ্ঞান হয়ে রয়েছে দেখে শিবানী কয়েক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালেন। তারপর তাকের উপর থেকে সরষের তেলের বাটি নিয়ে এসে সেই অচেতন ছেলেটাকে তেল মাখাতে ব'সে গেলেন। চাকর এক বালতি জল দিয়ে গেল, ঝি এনে দিল গামছা আর সাবান। শিবানী নিত্যনৈমিত্তিক নিয়মে ছেলেটাকে স্নান করাতে ব'সে গেলেন। মৃগীবিকার সারবে একটু বাদে—শিবানী জানেন। অতএব তাকে স্নান করিয়ে সেই কদাকার বিকারের মধ্যে রেখে তিনি গেলেন কন্যার ঘরে। হোমিওপ্যাথী ডাক্তার ততক্ষণে চ'লে গেছেন। শিবানী গিয়ে দুধের গেলাসটা ধরলেন মেয়ের মুখে। তিনি হলেন যন্ত্র। তাঁর ক্রিয়া আছে, চালনা আছে, উত্তমও আছে। তাঁর ক্লান্তি নেই, অবসাদও নেই।

বাইরে কার গলার আওয়াজে তিনি একসময়ে আবার বেরিয়ে এলেন একটি ছোকরাকে দেখে বললেন, কি রে দেবেন?

দেবেন বললে, কবিরাজমশাই এই ওষুধগুলো পাঠালেন। এর মধ্যেই নিয়ম আর অনুপানের ফর্দ আছে, পিসিমা। আর শুনুন, আপনার ছোড়দার ওখানে গিয়েছিলুম।

শিবানী তার দিকে তাকালেন। দেবেন বললে, তাঁর স্ত্রীর অবস্থা খুব খারাপ। বোধ হয় বাঁচবেন না।

হ্যা জানি। ব'লে কবিরাজী ওষুধের মস্ত মোড়কটা তুলে নিয়ে শিবানী ভিতরে চ'লে গেলেন। তাঁর কণ্ঠে কাঁপন নেই, ব্যথা-বেদনা অথবা সহানুভূতির লেশমাত্র নেই। দেবেন তাঁর পথের দিকে একবার তাকিয়ে চ'লে গেল।

ঘড়ির দিকে একসময় তাকিয়ে শিবানী গেলেন রান্নাঘরে। সেখান থেকে কাচের প্লেটে ভাত আর সিদ্ধ তরকারি নিয়ে এলেন কোণের ঘরে ছেলেটার কাছে। খাদ্যের চেহারা দেখে শৃঙ্খলাবদ্ধ জন্তুর মতো বিকলাঙ্গ ছেলেটা

আনন্দে কিলবিল করে উঠলো। শিবানী তাকে খাওয়াতে বসে গেলেন। পোড়াকাঠের মতো কালো জন্তুটা!

কিন্তু মেয়েটা তেমন নয়। এই সেদিন পর্যন্ত মেয়েটা ছিল সুশ্রী। পনেরো বছর বয়সে সবেমাত্র সর্বাঙ্গে তারুণ্যের নধর সুকুমার ছন্দ এসে পৌছেছিল, এমন সময়ে এলো জ্বর। দেখতে দেখতে চোখের কোণে কালি, দেখতে দেখতে মাথার চুলের রাশি বিবর্ণ—মেয়েটাই স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে এসে বিছানা নিল। পাঁচ মাস হ'ল শুয়েই আছে। বিছানাটা যদি আর না ছাড়ে তবে বিস্ময়ের কারণ নেই।

পাশের বাড়ির গিন্নী বলেন, বোঝা সয়, যে বোঝা বয়! কী ধৈর্য, আমরা অবাক হয়ে যাই। মুখে একটি কথা নেই সারাদিন। একালে এমন মেয়ে দেখা যায় না কোথায়ও! পাঁচ বছর হ'ল, মা!

আরেক জন বলেন, পাঁচ বছর হ'ল ওই চারখানা ঘরের মধ্যে শিবানী ঘুরছে। আমরা কত বলি বাছা বিকেলের দিকে ছাদে উঠেও ত' একটু নিঃশ্বাস ফেলতে পারো? কিন্তু কিছুতেই আমাদের কথা শোনে না।

ও বাড়ীর পিসি বলেন, আজকাল কলকাতায় কত সিনেমা হয়েছে, কত লোক বেড়ায় কত দিকে,—কিন্তু শিবানী এক পা দেয়না বাড়ির বাইরে। নিজের শরীর বাঁচলে তবেই ত' স্বামী-সন্তানের সেবা করবি, মা?

কে যেন চাপা গলায় বলে, স্বামী যে বাঁচবে না এ সবাই জানে। মাঝ থেকে নিজের শরীরটাই অযত্নে নষ্ট করা বৈ ত' নয়!

সেদিন ডাক্তার ঘর থেকে বেরিয়ে চ'লে যাচ্ছিলেন, শিবানী এলেন পিছনে পিছনে! ডাক শুনে ডাক্তার থমকে দাঁড়ালেন। শিবানী বললেন, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করতে পারি কি?

কি বলুন?

আমার স্বামীকে কেমন দেখলেন আজ?

ঠিক বলা কঠিন, মিসেস রায়।

শিবানী প্রশ্ন করলেন, পাঁচ বছরে কি ওঁর কোনো উন্নতি হয় নি?

ডাক্তার ভৌমিক বললেন, আপনারা মাঝখানে আমাকে প্রায় বছর খানেক ডাকেন নি। এই পাঁচ বছরে প্রায় কুড়িবার আপনারা ডাক্তার বদল করেছেন।

শিবানী বললেন, ফল না পেলেই ডাক্তার বদলাতে হয়। কিন্তু আর ক'বছর আমাকে রাত জাগতে হবে, ডাক্তার ভৌমিক?

ডাক্তার একটু অপ্রতিভ হাসি হাসলেন। শিবানীর কণ্ঠস্বরে পাওয়া যায় সমগ্র চিকিৎসক সমাজের প্রতি অনুযোগ। ডাক্তার আড়ষ্ট কণ্ঠে বললেন, ব্যাপারটা কি জানেন, ওঁর শরীরে আছে চাপা পক্ষাঘাত, তার ওপর বাত, ব্রেণের দোষ, হার্টের গোলমাল। তা ছাড়া আমার বিশ্বাস ওঁর চিকিৎসা-বিভ্রাট হয়েছে। মাঝখানে আপনারা হোমিওপ্যাথী করতে গিয়ে অনেকদিন সময় নষ্ট করেছেন।

শিবানী নির্বিকার মুখে প্রশ্ন করলেন, ওঁর বাঁচবার আশা কি একেবারেই নেই ?

ডাক্তার একবার তাকালেন তাঁর দিকে! পরে বললেন, আজ আপনাকে একটু বেশী চঞ্চল দেখা যাচ্ছে। এ আলোচনা আজ থাক মিসেস রায়। নমস্কার।

ডাক্তার ভৌমিক বাইরে গিয়ে নিজের মোটরে উঠলেন। কিন্তু অত্যন্ত ভুল ক'রে গেলেন তিনি। শিবানী একেবারেই চঞ্চল নন! চাঞ্চল্যটা তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তিনি কেবল জানতে চেয়েছিলেন স্বামীর জীবনের আশা আছে কিনা। যদি মোটামুটি একটা হদিস পাওয়া যেতো যে বেঁচে উঠতে এতদিন সময় লাগবে, অথবা মৃত্যুর আর মাত্র এতদিন বাকি,—তাহলে রাত্রি জাগরণের হিসাবটাও ওই সঙ্গে পাওয়া যেতে পারতো। এটা স্থিতবুদ্ধির কথা, চাঞ্চল্যের কথা নয়। ডাক্তার নির্বোধের মতো ভুল ক'রে গেল। এটা জীবনমৃত্যুর কথা, হৃদয়াবেগের কথা নয়। স্বামী বাঁচবেন, অথবা বাঁচবেন না—এটা জানবার দরকার শিবানীর আছে বৈকি।

এমন সময় বাইরে একখানা গাড়ি এসে দাঁড়ালো। গাড়ি থেকে নেমে এলেন এক ভদ্রলোক এবং বছর চারেকের একটি ছোট ছেলে। ভদ্রলোক নেমে এসে ডাকলেন, শিবানী, কই রে ?

শিবানী বেরিয়ে এলেন। ভদ্রলোক বিষণ্ণ মুখে বললেন, তোর বৌদিদি মারা গেছে কাল দুপুরে। শেষকালটা ভারি কষ্ট পেয়েছিল।

শিবানী প্রশ্ন করলো, শ্মশান থেকে ফিরলে কখন ছোড়দা ?

ছোড়দা বললেন, ফিরেছি তখন প্রায় রাত এগারোটা। কিন্তু মুশকিল হয়েছে এই, আমাদের সাহেব টেলিগ্রাম করেছে। আজ আমাকে বোম্বে যেতেই হবে। আমার ওখানে আর ত' কেউ নেই, ছেলেটাকে কোথায় রেখে যাই।

শিবানী বললেন, আমার এখানে রাখবে, কিন্তু এবাড়ি ত' দিনরাত ওষুধের গন্ধ ভরা। যদি তোমার ছেলে সুস্থ না থাকে, ছোড়দা ?

ছোড়দা বললেন, যা কপালে আছে তাই হবে। কিন্তু একে আমি নিয়ে যাবো কোথায়? তোর এখানে ছাড়া আর কোনো জায়গায় রাখতে আমি ভরসা পাইনে। রায়মশাই কেমন আছেন?

শিবানী জবাব দিল, একই রকম।

নীলিমা!

বুঝতেই পারো!

ছোড়দা বললেন, হুঁ। তোর ছেলেটারও ত' ওই দশা। কবে যে তুই মুক্তি পাবি!

মুক্তি! শিবানীর মুখখানা কঠিন হয়ে উঠলো, কিন্তু সে চুপ ক'রে রইলো। যাবার সময় ছোড়দা বললেন, আমার ওখানকার চাটি-বাটি সব তুলে নিয়ে গেলুম। এবার যাচ্ছি অনেকদিনের জন্যে। কানু তোর এখানে রইলো, তোর এখানেই থাকবে।

ছোড়দা চ'লে গেলেন। একটি সমবেদনার কথাও শিবানীর মুখে এলো না। কানুর মা মুক্তি পেয়ে গেছে রোগ থেকে,—দুঃখ কিছু নেই।

সমস্ত বাড়িখানা নিবিড় শান্ত। চুপ ক'রে থাকো, বাতাসের শব্দ কান পেতে শোনো। মানুষ আছে অনেকগুলি, কিন্তু শব্দ নেই। শব্দটাই জীবন, শব্দহীনতাই মৃত্যু। মাঝে মাঝে হয়ত কোনো রোগীর আর্তকণ্ঠের গোঙানি, হয়ত বা ওই মৃগীরোগী ছেলেটার একপ্রকার বিকৃত আওয়াজ,—তারপরে সব চুপ। বাইরে হয়ত কোনো মধ্যাহ্নকালের পাখীর এক টুকরো কলকূজনের আওয়াজ। আর কিছু নেই। এক ঘরে গিয়ে শিবানী ওষুধ খাওয়ায়, অন্য ঘরে গিয়ে মাথা ধোয়ায়, পাশের ঘরে গিয়ে বিছানা বদলে দেয়। এক গন্ধ থেকে আরেক গন্ধে; এ গন্ধ থেকে ও গন্ধে!

সমস্ত ঘরগুলি মূল্যবান আসবাবে সুসজ্জিত, মেঝেগুলি আরসির মতো ঝরঝরে পরিচ্ছন্ন। ধুলো-বালি-ময়লা-নোংরা কোথাও বিন্দুমাত্র নেই। কিন্তু প্রত্যেকটি ঘরের আসবাবপত্র যেন প্রেতের মতো দাঁড়িয়ে আছে, দেওয়ালের প্রত্যেকটি ছবির যেন কিছু একটা ভাষা আছে, একটা চাপা শব্দহীন চক্রান্ত। একা ঘরে ঢুকতে অনেক সময় যেন ভয় করে।

হঠাৎ ওঠে আওয়াজ,—পিসিমা?

ঘরগুলো যেন চমকে ওঠে, আসবাবপত্রগুলো যেন প্রাণ পেয়ে থরথর করতে থাকে। শিবানীর হাত থেকে চামচখানা খ'সে পড়ে। নিঃসাড় প্রেতপুরীর মাঝখানে যেন নবজীবনের ডাক

শিবানী এসে দাঁড়িয়ে বলেন, কি রে কানু, ভয় করছে, কোলে উঠবি ?

কানু ঘাড় নেড়ে বলে, উহুঁ না,—আমাকে যে তুমি বল কিনে দেবে বলেছিলে ?

ভাষাটা স্পষ্ট নয়, কিন্তু এই। শিবানী বললেন, আজই তোর বল আনিয়ে দেবো। আর কি চাই বল্।

কিচ্ছু না।—পিসিমা, আমি পান সেজে দেবো তোমার জন্যে !—কানু কাছে এসে আবদার ধ'রে বসে।

শিবানী হাসতে গিয়ে চমকে উঠলেন। এর নাম কি হাসি? এ তাঁর মনে নেই ! নিজের মুখের চেহারা পাছে তাঁর চোখে পড়ে, এজন্য আয়নার সামনে তিনি চুল বাঁধেন না। এ হাসি তাঁর মুখে কেমন মানালো, একবার দেখলে কেমন হয় ?

ছেলেটা কাছে আসতে জানে, ঔদাসীন্যটাকে কৌতূহলে পরিণত করতে জানে। শিবানীকে গম্ভীর দেখে সে আঁচল ধ'রে বললে, পিসিমা আমি কাজ করবো !

কী কাজ করবি তুই ?

সব কাজ করবো !

শিবানী হাসলেন। বললেন, আচ্ছা দেখে আয় দেখি বারান্দায় চাদর-খানা শুকিয়েছে কিনা ?

কানু অমনি ছুটলো। বারান্দা থেকে শুকনো চাদর তুলে আনলো। কী বিজয়গর্ব ওর মুখে চোখে ! কী আশ্চর্য সংহত চাঞ্চল্য ওর নধর স্বাস্থ্যশ্রীতে। শিবানী বললেন, এত কাজ করলে তোর যদি অসুখ করে, কানু ?

না, অসুখ করবে না, তুমি দেখো।—পিসিমা, আমি আজ থেকে তোমার কাছে শোবো।

আমি কি শুই যে, আমার কাছে তুই শুবি ?

তবে আমি থাকবো তোমার কাছে রাত্তিরে ?

শিবানী ওর পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, আমি যে রুগীর ঘরে থাকি !

কানু বললে, আমিও থাকবো !—আচ্ছা পিসিমা, ওরা অত ওষুধ খায় কেন ?

আমি যে অনেক পাপ করেছি তাই ওরা ওষুধ খায় !

কানু অবাক হয়ে পিসিমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। শিবানী বলেন, আয় কানু, তোকে জামা পরিয়ে দিই।

না, পরবো না!

ওমা, ঠাণ্ডা পড়েছে যে!

না, ঠাণ্ডা পড়েনি!—কানু ছুটে পালিয়ে যায়। রুগ্না জননীর মৃত্যু ঘটেছে সেজন্য ছেলেটার একটুও ভাবান্তর দেখা যায় না। ছেলেটা শূন্যঘরে গিয়ে দাঁড়িয়ে নিজের মনে কথা কয়। একদিন বাইরের ঘরের বড় আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে সে নেচেই অস্থির। এ বাড়িতে প্রত্যেক ঘরেই যেন তার একজন ক'রে বন্ধু লুকিয়ে আছে, কানু নিজের মনেই কানামাছি খেলতে খেলতে সেই বন্ধুদের খুঁজে বেড়ায়। খেলতে খেলতে নিজেই সে মেতে ওঠে; নানা কাজের ফাঁকে শিবানী ওকে লক্ষ্য করেন।

ওঘর থেকে স্বামীর ডাক শুনেই শিবানীর মুখখানা গম্ভীর হয়ে ওঠে। স্বামী অসুস্থ হ'লে স্ত্রীর প্রতি অনুরাগ বাড়ে। শিবানী তাড়াতাড়ি ওঘরে গিয়ে হাজির হন। রোগীর মুখে একটু জল, একটু ফল, একটুখানি গায়ে হাত বুলানো, বালিশটা ঠিক ক'রে দেওয়া, গায়ের উপর চাদর টানা, জানলাটা একটু ভেজানো, বেডপ্যানটা একটু সরানো। শিবানীর হাত অতি নিপুণ, সেবায় অতি একাগ্রতা, যত্নে একান্ত আন্তরিকতা। তারপরে তিনি বেরিয়ে আসেন, বেসিনের কাছে গিয়ে কটুগন্ধ কারবলিক সাবান দিয়ে হাত ধোন। তারপরে যান শ্রীমতী নীলিমার কাছে, সেখান থেকে ষষ্টির ঘরে। ষষ্টির তখন মৃগীবিকার দেখা দিয়েছে।

ওমা, কানু তুই কি করছিস এখানে রে?

ঝি এসে হাসিমুখে অভিযোগ জানালো, ওই দেখুন—এক বালতি জল এনেছে, গামছা এনেছে আপনার জন্যে,—আমার কাছে গিয়ে বলে, সৈরুবী, তেলের বাটি দাও! আমি বলি, তেলের বাটি কি হবে, দাদা? বলে, পিসিমা বুঝি চান করবে না? আমি যে পিসিমাকে খাইয়ে দেবো!—শুনুন ছেলের কথা!

আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন না শিবানী,—কেননা তাঁর মুখে হাসি দেখলে ঝি-চাকররা চমকে উঠবে। তিনি বললেন, আচ্ছা না হয় খাইয়েই দিবি, কিন্তু জল ঘেঁটে যদি অসুখ করে?

কানু মুখ ফিরিয়ে বললে, বললুম যে অসুখ করবে না।

তুই কি পণ্ডিত যে, সবজান্তার বড়াই করিস?

কানু ভাবলো, না, পণ্ডিত সে নয়। সুতরাং হতাশ হয়ে সে পিসিমার পাশে এসে দাঁড়ালো। ঝি একেবারে হেসেই অস্থির।

কানু এসেছে, যেন প্রাণ এসেছে বাড়িতে। তার চলাফেরার মধ্যে মুক্তির সংবাদ আছে। সে যেন অচল জড়তাকে আঘাত করে। সে যেন তুষারস্তূপের মধ্যে উত্তাপ আনে, সেই উত্তাপে বিগলিত প্রাণধারা নেমে আসে। তার সারাদিনের কলকণ্ঠ আর কাকলী যেন প্রত্যেকখানা ঘরের ভিতরকার বহুকালের অসাড়তাকে মুখর ক'রে তোলে। শিবানী চুপ ক'রে নতুন পাখীর কাকলী উৎকর্ণ হয়ে শোনেন। শুনতে শুনতে নিজের মধ্যে তিনি ডুবে যান।

কানু স্বাধীন। সে নিজে স্নান করবে, ভাতের থালা নিয়ে গিয়ে দাঁড়াবে বামুনঠাকুরের কাছে, নিজে জামা জুতো পরবে, এবং নিজের মাথা নিজেই আঁচড়াবে। পিসিমার কোনো সাহায্য না নিয়েই সে চলবে,—এবং যতটুকু হোক, পিসিমার পায়ে-পায়ে ঘুরে তাঁর কাজে কিছু সাহায্য সে করবেই। ছেলেটা অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান, এবং চেহারাটা সত্যকার সুশ্রী। সন্ধ্যার পর সে যখন যেখানে-সেখানে ঘুমে লুটিয়ে পড়ে, শিবানী এসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন তার সামনে। ভালোবাসতে ইচ্ছে করে তাঁর,—কোলে নিয়ে কিছুক্ষণ কাঁদতে ইচ্ছে করে। ছেলেটা এ বাড়িতে আসার পর থেকে তাঁর কাজ কিছু বাড়ে নি, বরং কাজ কমেছে, বরং আজকাল তাঁর কপালে একটু বিশ্রামও জোটে।

হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার একদিন বললেন, মিসেস রায়, নীলিমার আমি কোনো উন্নতি করতে পারলুম না। আপনি অন্য ব্যবস্থা করুন।

শিবানী বললেন, আর কতদিন মেয়েটা ভুগবে মনে করেন ?

তিনি বললেন, আমাদের ওষুধ হ'ল দীর্ঘমেয়াদী,—অনেকদিন পর্যন্ত ধৈর্য না রাখলে ফলাফল দেখতে পাওয়া যায় না। কিন্তু রোগীর অবস্থা খারাপ হচ্ছে, মিসেস রায়।

পরের দিন থেকে শিবানী অন্য ডাক্তারের ব্যবস্থা করলেন। ব্যবস্থাটা রাজোচিত এবং ব্যয়বহুল। কিন্তু সেদিকে শিবানীর ভ্রূক্ষেপ নেই। এ তিনি জানেন, এ হবে,—এ হ'ল নিয়তি। কিন্তু এর শেষ তিনি দেখতে চান, দেখতে চান অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। মেয়েটা যেন দিন দিন বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে যাচ্ছে। মোমবাতিটা জলছে, নিবেও যাবে এক সময়ে, কিন্তু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ঠিক আন্দাজ করা যায় না,—কাঁটায়-কাঁটায় মোমবাতিটুকু কখন শেষ হবে। কিন্তু প্রত্যেকটির চরম লগ্ন নির্ভুলভাবে জানা গেলে ভালো হ'ত। বলা বাহুল্য শিবানীর মুক্তি চাই। শুধু দৈহিক মুক্তি নয়,

ক্তি চাই মনে, মুক্তি চাই চিন্তায়, কল্পনায়। সমস্ত প্রকার বিভীষিকার ভিতর দিয়ে যদি সে-মুক্তি আসে, সেও ভালো।

পাড়ার লোকের মধ্যেও জানাজানি হয়ে গেছে যে, শিবানীর স্বামীর আর কোনো আশা নেই। যে-কোনো দিন যে-কোনো সময়ে বজ্রাঘাত হতে পারে। পাড়ার লোক থাকে কান পেতে, কতক্ষণে তারা শিবানীর ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে ডুকরে-ডুকরে কান্না শুনতে পাবে। ঝি-চাকর উঠবে চেঁচিয়ে, বাইরের লোক ছুটোছুটি করবে, শুনবে সম্মিলিত চীৎকার।

এমনি সময়ে এলেন বিধবা ননদ, এলেন মামাশ্বশুর, এলেন বড় বড় ছেলেমেয়ে তিন চারজন। বাড়ি ভ'রে উঠলো এবার কোলাহলে। কানু কচকিয়ে এসে দাঁড়ালো পিসিমার পাশে। শিবানী বললেন, ওদের দেখে ভয় করছে নাকি রে কানু?

ভয়? না—কানু হাসলো। তারপর ছুটে চ'লে গেল খেলা করতে।

এর পরে দিন হ'ল গোণাগুণতি! কেননা আত্মীয়রা এসেছিলেন মিঃ রায়ের অন্তিমকালে। তাঁরা সেবা করতে আসেন নি, এসেছেন সংকার করতে। তারা জানতেন, পাঁচ বছর ধ'রে বিনিদ্র রাত্রি যাপন ক'রে যে-নারী স্বামীকে বাঁচিয়ে তুলতে পারে না,—স্বামীর মৃত্যু সে কি বরদাস্ত করতে পারবে?

হেমাঙ্গিনী—শিবানীর বড় ননদ—শিবানীর পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, কখনো যা দেখি নি তাই দেখলুম তোর সেবায়,—অনেক করলি তুই। কিন্তু বাঁচা-মরা তোর হাত নয় বৌ!

শিবানী চুপ ক'রে রইলো। গা তার ঠাণ্ডা। হেমাঙ্গিনী পুনরায় বললেন, ভাইটির আশা আর নেই, চোখেই দেখছি। কিন্তু তোকে আর জাগতে হবে না—ছেলেমেয়েরা এসেছে, ওরাই সব করবে।

মামাশ্বশুর ওধার থেকে ডাকলেন, হেম?

হেমাঙ্গিনী সাড়া দিলেন, মামা কিছু বলছেন?

হ্যাঁ, বৌমাকে বলো,—উনি একটু বিশ্রাম নিন।

শিবানী শিউরে উঠে বললেন, বিশ্রাম নিতে গিয়ে যদি ঘুম আসে, দিদি?

বেশ ত' ঘুম আসে—ঘুমোবি? হয়েছে কি?

কিন্তু আপনারা কি পারবেন অত কাজ?

ওমা, তা কেন পারবো না? ওরা চারজন, আমি নিজে, মামা রয়েছেন মাথার ওপর,—তারপর ঝি-চাকর-বামুন—সবাই আছে। কিচ্ছু অসুবিধে হবে না বৌ!

ডাক্তার জবাব দিয়ে গেছে ঘণ্টা দুই আগে। কিন্তু অনেককাল পরে এতগুলি মানুষ চারিদিকে দেখে শিবানী যেন অপরিসীম ক্লান্তিতে অবসন্ন বোধ করছিলেন। ডাক্তার ব'লে গেছেন, আজকের রাতটা হয়ত কাটবে, কিন্তু আসছে কাল বেলা বারোটা পর্যন্ত কাটবে কিনা বলা খুব কঠিন। মিঃ রায় আচ্ছন্ন হয়ে প'ড়ে আছেন।

আসছে কাল বেলা বারোটা?—সে অনেক দেরী। শিবানী সমস্ত সযত্নে গুছিয়ে রেখে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম নিতে গেলেন। দরকার হ'লে মুহূর্তের মধ্যে তিনি উঠে আসবেন। রোগীর আর কোনো আশা নেই, কিন্তু তাঁরও আর দাঁড়াবার শক্তি নেই। অন্যদিন এমন সময় বিশ্রামের কথা তাঁর কল্পনাতেও আসে না, আজকে কিন্তু বিশ্রাম নেওয়া ছাড়া অন্য কিছু তিনি ভাবতেও পারছেন না।

নীলিমা রইলো একজনের হেপাজতে, ঘণ্টি রইলো আরেক জনের তদ্বিরে। ওদের জন্য কোনো অসুবিধা নেই। স্বামীর বিছানার চারপাশেও রয়েছে সবাই। পলকে-পলকে তাঁর তদারক চলছে। বিগত কুড়ি বছরের কথা আজ তাঁর মনে পড়েছে। একটি দিনের জন্যও স্বামীর সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ি হয় নি; কখনো কোনো কারণে স্বামীর সঙ্গে তাঁর বিতর্ক বাধে নি। দুই দেহ শুধু আলাদা, কিন্তু দুইয়ে মিলে এক, অভিন্ন, অবিচ্ছেদ্য! কুড়ি বছরের ইতিহাস সগৌরবে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে!

ক্লান্তিতে শিবানীর দুই পা অবসন্ন, সর্বশরীর টলটল করছে। তিনি বাইরের দিকে এলেন, যেদিকটায় ঔষধপত্রের গন্ধটা কিছু কম। দক্ষিণের ঘরে কানু নিজের বিছানায় এসে শুয়ে থাকে, কিন্তু আজ কানু সেখানে নেই। শিবানী ঘুরতে ফিরতে এলেন বাগানের দিককার কোণের ঘরের দিকে। জানালা দিয়ে সেখানে চাঁদের আলো এসে পড়েছে; সেই আলোর আভায় তিনি দেখলেন, কানু অকাতরে ঘুমিয়ে রয়েছে খাটের ওপর। একা ঘরে অন্ধকারে এসে শুতে ছেলেটার একটুও ভয় করে না।

সন্ধ্যার পরে এদিকটা একটু নিরিবিলি। দূরে কাদের বাড়িতে যেন রেডিয়ো যন্ত্রটা খোলা আছে। নারীকণ্ঠের মধুর কীর্তন শোনা যাচ্ছিল। কানুর পাশে এসে শিবানী তাঁর আড়ষ্ট দেহটা ছড়িয়ে দিলেন এবং আঁচলটা চাপা দিলেন কানুর গায়ে। চোখের পাতা তাঁর ঘুমে জড়িয়ে আসছিল। কিন্তু কীর্তনের সুরপ্রবাহটাকে ছাড়িয়েও তিনি কান খাড়া ক'রে রাখলেন ভিতর বাড়ির দিকে —যেদিকে রোগীর ঘর।

বোধ হয় ঘণ্টা দুই পরে হবে। একটি মেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে ঘরে ঢুকলো।—মামীমা, ও মামীমা,—শিগগির উঠুন, মামা কেমন করছেন! শিগগির আসুন, ও মামীমা— ?

শিবানী জেগে উঠলেন, জড়িত কণ্ঠে বললেন, চলো যাচ্ছি। কিন্তু আমি আর কী করবো, সবিতা ?

সবিতা ছুটে চ'লে গেল। যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েও শিবানী আবার শুলেন কানুর পাশে। তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

আবার এলো দুটি ছেলেমেয়ে আর হেমাঙ্গিনী নিজে। শিবানীর শয়নের ভঙ্গী আর নিশ্বাসের অসমতাল লক্ষ্য করে ওঁরা ধ'রে নিলেন শিবানী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। হেমাঙ্গিনী কাছে এসে শিবানীর মাথায় হাত রেখে বললেন, বড্ড কষ্ট পাচ্ছিল, তুই আর কাঁদিস নে বৌ তার জন্যে। সে জুড়িয়ে গেছে। আচ্ছা, তোর আর উঠে কাজ নেই,—ওরাই শ্মশানে নিয়ে গিয়ে সব কাজ করবে। তোকে আর কিছু দেখতে হবে না!—এই ব'লে ছেলে মেয়েদের নিয়ে তিনি কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে গেলেন।

শিবানী কিন্তু তখন অঘোর নিদ্রায় নিদ্রিত। কোনো কথাই তাঁর কানে ওঠে নি।

ঘুম তাঁর ভাঙ্গলো পরের দিন সকাল ন'টায়—ওরা সবাই তখন শ্মশান থেকে ফিরছে। ঘুম ভাঙ্গালো কানু। ঘুম থেকে উঠে টলতে টলতে শিবানী যখন রোগীর ঘরে গেলেন, দেখলেন ঘরে স্বামী নেই! স্বামী মারা গেছেন বুঝতে বাকি রইলো না,—কিন্তু কখন মারা গেছেন এবং মৃত্যুকালে তাঁকে ডাকা হয়েছিল কিনা কিছুই তাঁর মনে নেই! তাঁর মনে নেই গতরাত্রির কোনো কথা!

শিবানী ঘরের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছু ভাববার চেষ্টা ক'রেও তার মাথায় কিছু ঢুকলো না। শোক সন্তাপের চেতনা তাঁর আসছে না, আসছে শুধু দুই চোখ ভ'রে গাঢ় নিশ্চিন্ত নিদ্রা। যত শীঘ্র সম্ভব স্নান সেরে কোরা থান কাপড় প'রে তিনি ঘুমিয়ে পড়তে পারলে বাঁচেন!

দিন পনেরো বাদে কানুকে সঙ্গে নিয়ে শিবানী চ'লে গেলেন দেওঘরে। ওরা সবাই রইলো বাড়িতে। রইলো দুরারোগ্য ব্যাধি নিয়ে নীলিমা, রইলো বিকলাঙ্গ ছেলেটা একপাশে। কানুকে নিয়ে তিনি গিয়ে নামলেন সাঁওতাল পরগণার মাঠে। হেমন্তের আকাশ শিউরে উঠেছে তখন নীলবর্ণ সমারোহে। এ মাঠের হাওয়ায় ঔষধের গন্ধ নেই, বিকারের প্রলাপ নেই। আর্তের নৈরাশ্য

নিশ্বাস নেই। অথণ্ড অনন্ত মুক্তি মাঠে-ময়দানে। পাশে আছে তাঁর এক ক্ষুদ্র বালক। হাস্যমুখর, চিত্তচঞ্চল, বলিষ্ঠ আর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল! ও যেন ওই উদার মাঠের অপরিসীম মুক্তির মন্ত্রটি জানে। ও জানে নবজীবনের সংবাদ, নবতারুণ্যের জয়গান। ওকে নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়ান মাঠে মাঠে।

শিবানীর থাকবার কথা ছিল এখানে দিন পনেরো। কিন্তু প্রায় দেড়মাস তিনি থেকে গেলেন। তারপরে এক টেলিগ্রাম এল, নীলিমার অন্তিম ঘনিয়ে এসেছে, শীঘ্র এসো।

নীলিমা? মনে প'ড়ে গেল বটে বাড়িতে আছে রুগ্না নীলিমা আর বিকলাঙ্গ ঘণ্টি। সেইদিনই শিবানী জিনিসপত্র গুছিয়ে কানুকে সঙ্গে নিয়ে দুপুরবেলায় কলকাতার গাড়িতে উঠলেন।

গাড়ি যখন ছাড়বে, গার্ডের বাঁশী যখন বাজলো,—সহসা তাঁর নাকে এলো সেই কঠিন ওষুধের গন্ধ, সেই বাড়ির ব্যাধি ও বিকারের গন্ধ। তিনি চট্‌ ক'রে কানুর হাত ধ'রে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিলেন এবং জিনিসপত্র নিজের হাতেই তাড়াতাড়ি টেনে নামালেন। গাড়ি ছেড়ে দিল।

তিনি না গেলে কীই বা ক্ষতি? মৃত্যুর সামনে তিনি আর নাই বা গিয়ে দাঁড়ালেন।

সন্ধ্যার পরেই লগ্ন। বর আসিয়াছে বিবাহ করিতে ; প্রচলিত নিয়মে বিবাহ
ন করিয়া হয়। আসর বসিয়াছে। দামী গালিচা পাতা, আশপাশে লাল
লের গোটা চারেক তাকিয়া, দু'দিকে বড় বড় রূপার ফুলদানিতে দুইটি
র তোড়া, মাথার উপরে ও দেয়ালের চারিদিকে ঝড়ের আলো জ্বলিতেছে।
যাত্রীতে বড় ঘরখানা ঠাসাঠাসি। ভিতরে বাহিরে সর্বত্র গোলমাল, লুচি-
ার গন্ধ, চুরুটের ধোঁয়া, ফুলের খোসবায়, গানের আওয়াজ, সুলভ রসিকতার
ত, অতিথি-অভ্যাগতের আদর-আপ্যায়ন। ঠিক সাধারণ-বিবাহ যেমন
য়া হয়, অতি সাধারণ প্রথায়।

বরের মাথায় টেরি, কপালে চন্দন, চোখে উৎসাহ, মুখে সংযত হাসি, সর্বাঙ্গে
াটি প্রসাধন। সভায় প্রকাশ, ছেলেটি শিক্ষিত, বিনয়ী, রূপবান এবং ধনী
ন্তু অত্যন্ত সাধারণ, অন্যের চোখের পছন্দে সে বিবাহ করিতে আসিয়াছে।
তে তাহার বিরক্তিও নাই ; এই প্রচলিত প্রথা। মনের খুশিতে ও চাপা
তে বর এদিক ওদিক তাকাইতেছিল। তাহার পাশেই দু'তিনটি আধুনিক
গান গাহিতেছে।

রজার কপাটে হেলান দিয়া তাহার যে-বন্ধুটি চুপ করিয়া এতক্ষণ
ইয়াছিল, বর তাহাকে ইঙ্গিতে হাত বাড়াইয়া ডাকিল। বন্ধুটি কাছে
য়া বসিতেই বর হাসি-হাসি মুখে কহিল, বেশ লাগচে, না রে অমিয় ?

মিয় তাহার কথাটাকে তাচ্ছিল্য করিয়া কহিল, অত্যন্ত বিরক্তিকর কিনা,
তোর ভালো লাগচে।

াই বটে, ঠিক বলেচিস্ তুই, বিরক্তিকর ! সেই থেকে একটানা ঘ্যান্
করে' চলেছে।

কটু হাসিয়া অমিয় কহিল, তাহলে নিশ্চয় বাজে কথা বলেচি। আমি
াজে কথা বলি তখন সবাই আমার প্রশংসা করে।

তাহার কথা বুঝিতে পারিল না। কহিল, ওখানে এতক্ষণ চুপ ক'রে
ছিলি কেন ?

দাঁড়িয়েছিলাম, হ্যাঁ—এম্‌নি।

চুপ করে' দাঁড়িয়েছিলি? দেখছিলি বুঝি কারো দিকে?

চুপ করে' দাঁড়িয়েছিলাম।

বর কহিল, গান শুন্‌ছিলি নাকি?

না, গান শুন্‌ব কেন? হ্যাঁ, গানই শুন্‌ছিলাম। বেশ গান।

কি করছিলি তোর মনে নেই।

অমিয় কহিল, হ্যাঁ মনে নেই, গান শুন্‌ছিলাম।

বর বলিল, চুরুট ধরাস্ ত' নে, ঐটাতে রয়েছে। যাক্, তোর ঘট্‌কালি
বাহাদুরী আছে কিন্তু, যাই বলিস্।

হ্যাঁ, চেনা মেয়ে, নিজেদের জানাশোনার মধ্যে। শ্বশুরবাড়ী কাছাকাছি
হ'ল। রোজ একবার করে' যাতায়াত চল্‌বে। বিদেশ বিভূঁয়ে না হয়ে এ বরং
তোরই জানা মেয়ে, নিতান্ত একেবারে অচেনা নয়। আচ্ছা ঠিক বয়েস
কত বল্ ত'?

অমিয় কহিল, মেয়েদের বয়েস দেখতে নেই, দেখতে হয় বাঁধুনি,—যৌবন
তবে এর বয়েস বছর আঠারো!

আঠারো? ওরা যে বলেছে ষোল?

ওরা যে মেয়ের পক্ষ!—হ্যাঁ, এই বছর আঠারো, কিম্বা, এই ধরো দু'
কম। আঠারোর মতই তাকে দেখতে, ষোলও নয়, কুড়িও নয়—সম্পূর্ণ পরি
আঠারো! আঠারোটি বছরকে সর্বাঙ্গে সে থাকে-থাকে সাজিয়ে রেখেছে।

বর মনে মনে কৌতুক অনুভব করিয়া চুপ করিয়া রহিল। প্রশ্নের পর
ফুটিয়া তাহার মাথার ভিতর ভিড় করিতে লাগিল। এক সময় কহিল, আ
মেয়ে ত' সুন্দরী তুই বলেছিস!

নানা গোলমাল, নানা কণ্ঠের কোলাহল, সকলেই এদিকে ওদিকে ছুটা
করিতেছে। পান তামাক সরবৎ সিগারেট ও অসংলগ্ন হাসি-মস্করা চারি
ছড়াছড়ি হইতেছিল। কন্যাপক্ষীয়রা অতি সন্তর্পণে অতি-ভদ্রতার মু
পরিয়া অতি-ক্ষিপ্রতার সহিত তদ্বির করিয়া বেড়াইতেছিলেন।

অমিয় চুরুটটা ধরাইয়া লইল। মুখের মধ্যে ধোঁয়া টানিয়া আবার ছা
দিয়া বলিল, সুন্দরী!

বর বলিল, বলতে গিয়ে চুপ করেছিলি কেন? খুব সুন্দরী নয় বুঝি?

আবার চুরুটে অমিয় টান দিল এবং আবার ধোঁয়া ছাড়িয়া কহিল,
খুবই সুন্দরী।

খুব নয় বোধ হয়, শুধু সুন্দরী।

হ্যাঁ শুধু সুন্দরী ; সুন্দরীই শুধু। খুব বললে বোঝানো যায় না, কত।

তবু কি রকম সুন্দরী? কার মতো?

কারো মতো নয়। তার মতো হবার যোগ্যতা কারো নেই। যে শুধু সুন্দরী, তার সঙ্গে কারো তুলনা হয় না।

তুলনাই হয় না? এত রূপ?

এত রূপ নয়, এত সৌন্দর্য! বিয়ে করা উচিত রূপ দেখে নয়, সৌন্দর্য দেখে। সত্যিকারের সৌন্দর্যের কোনো সত্য বর্ণনা নেই।

চোখ উজ্জ্বল করিয়া বর বলিল, মাথায় চুল আছে খুব?

দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলির দিকে অমিয় তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। তারপর দেখিল ঝাড়ের সব আলোগুলি ঠিকমত জ্বলিতেছে কিনা। ওপাশে বন্ধুরা তাস খেলিবার আড্ডা বসাইয়াছে। মনে হইতেছে বিবাহের লগ্নের আরও একটু দেরি আছে।

সাজা পানের কপাল হইতে একটি লবঙ্গ খুলিয়া লইয়া মুখে পুরিয়া অমিয় কহিল, হ্যাঁ, অনেক চুল। চুলের অন্ধকার। সুমুখের দিকে কোঁকড়ানো, একরাশ আংটির মতো, আর পেছন দিকে অসংখ্য সাপের মতো, আঁকাবাঁকা —হিল্‌হিলে। অরণ্যের মতো গভীর ; চুল নয়, চালচিত্র। ঘরে এসে দাঁড়ালে চুলের গন্ধে ঘুম ভেঙ্গে যায়। সে যদি পথ হারায় তুমি তার চুলের গন্ধ অনুসরণ করে' তাকে খুঁজে পাবে। সে যদি চুলের রাশি খুলে সর্বাঙ্গ ঢাকে, তবে তার কাপড় না পরলেও চলে।

গভীর মনোযোগের সহিত বর তাহার কথা শুনিতেছিল। শেষের কথায় বিস্ময় অনুভব করিয়া কহিল, মুখখানি ভাল, কি বলিস্? তুই ত' কতবারই দেখেচিস্!

হ্যাঁ, অনেকবার দেখেছি, বহুবার। সে কেমন দেখতে এ কথা বহুবার তাকে দেখে ভেবেছি।

কেমন দেখতে রে?—বর কৌতূহলী হইল।

বলা কঠিন। দেখতে সে ভাল। দেখতে সে ভাল এইজন্তে যে, পৃথিবীর আর কোনো মেয়ের দিকে তাকাতে ইচ্ছে করে না। পৃথিবীর একটিমাত্র মেয়ে সে। চন্দ্রের চারিদিকে যেমন কোটি কোটি তারা, তেমনি তার পাশে পৃথিবীর আর সব মেয়ে। সে মেয়ে নয়, মেয়েদের রাণী।

বর কহিল, আমি বলছি তার মুখখানি কেমন দেখতে!

অমিয় কহিল, শ্যাওলা-পড়া দিঘীতে অনেক পদ্ম ফুটে রয়েছে। তুলতে তুলতে হঠাৎ দেখা গেল, একটি তার মধ্যে পদ্ম নয়, সেটি একটি মেয়ের মুখ। মুখখানির ওপর শরতের শিশির বিন্দু। সেই মুখখানি এই মেয়ের, এই, তুমি যাকে বিয়ে করবে।

আচ্ছা, তা ত' হ'ল! মেয়ে লেখাপড়া জানে?

যথেষ্টই জানে! বিদ্বান নয়, সুশিক্ষিত!

বর কি ভাবিয়া কহিল, কিন্তু লেখাপড়া জানা মেয়ে শুনেছি তেমন—

হ্যাঁ, লেখাপড়া জানা মেয়েরা ভালবাসতে পারে না, আর নিরক্ষর মেয়েরা ভালবাসতে জানে না,—এই ওদের মধ্যে তফাৎ।

তাহলে এ মেয়ের সঙ্গে—

এ মেয়ে বিধাতার সর্বপ্রথম সু-সৃষ্টি! এর মধ্যে নিরক্ষর মেয়ের সারল্য আর শিক্ষিতা নারীর সৌজন্য, দুই আছে। এ মেয়ের মধ্যে ভালবাসা ছাড়া আর একটি বস্তু আছে, যা আর কোনো মেয়ের মধ্যে নেই। সে হচ্ছে প্রেম!

আচ্ছা, ভালবাসা আর প্রেমের মধ্যে কি তফাৎ?

অমিয় কহিল, ভালবাসা হচ্ছে বোঁটা, প্রেম হচ্ছে ফুল! সব বোঁটায় ভাল ফুল ফোটে না।

বর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর বলিল, মেয়েটির আচার-ব্যবহার কি রকম অমিয়?

অমিয় কহিল, হয় অত্যন্ত সরল, নয় অত্যন্ত রহস্যজনক।

রহস্যজনক?

না, সরল। মেয়েদের সবই পুরুষের চোখে রহস্যজনক লাগে। অত রহস্য আছে বলেই অত সরল।

পাশাপাশি বসিয়া দুইজনে ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা কহিতেছিল, কথার আর তাহাদের বিরাম নাই। বর আনন্দে বসিয়া বসিয়া পান চিবাইতেছিল। পান যে তাহার খাইতে নাই এ কথা সে তখন ভুলিয়া গেছে।

একটি কন্যাপক্ষীয়ের লোক গামছা কাঁধে ফেলিয়া কি একটা কাজে তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতেছিল, একজন বরযাত্রী বলিয়া উঠিল, আচ্ছা মশাই, বিয়ের লগ্নটা ঠিক ক'টার সময় বলুন ত'?

লোকটি বলিয়া গেল, এই, সময় প্রায় হয়ে এল আর কি, ঘণ্টাখানেক দেরি, ন'টার পর।

ন'টার পর, অথচ বর এল সাতটার সময়। এতক্ষণ তাহলে ব'সে ব'সে

—অমিয়বাবু, চুপি চুপি কি গল্প করছেন বরের সঙ্গে? পাত হয়েছে কিনা দেখুন না একবার। আপনি ত' কন্যেপক্ষের—

অমিয় কহিল, হ্যাঁ এদিকে আমি মাসি, ওদিকে পিসি।

সবাই হাসিয়া উঠিল। যে লোকটি বসিয়া গান গাহিতেছিল, সে আরও উঁচুতে গলা চড়াইয়া দিল। ও-পাশে বাঁয়া-তব্‌লায় চাঁটি পড়িতে লাগিল।

বালিশে হাত চাপিয়া বর কাৎ হইয়া বসিল। তারপর চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, মেয়ের চোখ দুটি কেমন, অমিয়?

অমিয় হাসিল, হাসিয়া বলিল, মেয়ে দেখে যে বিয়ে করে না তার এই দুর্দশাই হয়! চোখদুটি তার অত্যন্ত সাধারণ, এত সাধারণ যে মনে হয় সে চোখ বহুবারই দেখেছি। বহু মেয়ের মধ্যে বহুবার সে চোখ দেখেছি দেখে চিনে রেখেছি। সে চোখ এত সাধারণ আর এত স্বাভাবিক।

বর চুপ করিয়া রহিল। মনে হইল সে যেন ভগবৎ গীতা শুনিতেছে। অমিয় বলিতে লাগিল, কোথায় তুমি সে চোখ দেখেছ তোমার মনে নেই! মনে হবে বহু জন্ম আগে থেকে তুমি ওই চোখদুটি খুঁজে এসেছ। সে-চোখের কাছে দাঁড়ালে তোমার মুখের ছায়া পড়বে তার মধ্যে। সেই চোখ যেন দুই বিন্দু আকাশ।

বর মুখ তুলিয়া তাহার দিকে তাকাইল। অমিয় নিজের মনে বলিয়া চলিল, অতিরঞ্জিত নয়,—সে চোখে ইসারা-ইঙ্গিত নেই, সুন্দরী মেয়ের স্বভাব-সুলভ ছলাকলা নেই, তাতে আছে প্রাণের গভীরতা। সে চোখে পিপাসা নেই, আছে নিবিড় তপস্যা।

বর কহিল, তপস্যা? তাহলে ঘর করবে কেমন ক'রে?

অমিয় মৃদু হাসিল,—ঘর করবারই তপস্যা! তুমি যখন তাকে ভাল ক'রে চিনবে, তোমার মনে হবে সে সন্ন্যাসিনী নয়, নিতান্তই গৃহবাসিনী।

খুব শান্ত বুঝি?

খুব। শান্ত আর ধীর। ঝড় যখন ছোটে না, তখন সে বসে' ধ্যান করে। এত শান্ত যে মানুষের বিস্ময় আনে। তাকে দেখলে মনেই হয় না যে এই দক্ষিণ হাওয়ার পিছনে রয়েছে প্রলয়ের ঝড়। হ্যাঁ, তুমি যখন তার কাছে যাবে, মনে হবে, তোমার পাশেই বিশাল বিশ্বপ্রকৃতি। এ মেয়ের সর্বাঙ্গে তরুলতা, ফুল-ফল, বন-প্রান্তর, গিরি-গহ্বর, অরণ্যের শ্যামশোভা, অপরিমাণ আকাশ,—সূর্য-চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র। তোমার শরীর হবে রোমাঞ্চ, আবেগে আন্দোলিত হবে তোমার সর্বদেহ, তোমার স্তব করতে ইচ্ছে হবে।

স্তব করতে ? ভালবাসতে নয় ?

ভালবাসতে আর স্তব করতে। ভালবেসেই তুমি তৃপ্ত হবে, ভালবাসা পেয়ে নয়।

বর কহিল, সে কি রে ? সে ভালবাসবে না ? ভালই যদি না বাসবে তাহলে এত কাণ্ড ক'রে — ?

অমিয় বলিল, এক একটি মেয়ে থাকে, তারা ভালবাসতে আসে না, ভালবাসা পেতে আসে। তুমি তাকে স্ত্রী ব'লে পরিচয় দেবে এই তোমার পরম ঐশ্বর্য ! মেয়েরা ত' ভালবাসে না, তোমাদের ভালবাসায় তারা মুগ্ধ হয়, এই মাত্র। মেয়েদের আসক্তিকে প্রেম না বললে সব পুরুষই সন্ন্যাসী হয়ে যেত। মেয়েরা পূজায় তুষ্ট হয়, তাই তাদের নাম — দেবী। তুমি দেবে পূজা, সে দেবে প্রসাদ।

এ মেয়েটি কেমন ?

কেমন — এ কথাটাই ত' তোমাকে আবিষ্কার করতে হবে ! এ মেয়েটি তোমার মুখের দিকে যখন মুখ তুলে তাকাবে, তোমার মনে হবে তুমি জীবনে অনেক অন্যায় ও অনেক পাপ করেছ। মনে হবে তুমি অত্যন্ত দুর্বল, অত্যন্ত ভীরু। এমন একটা চোখের দৃষ্টি, যাতে তোমার মনে হবে তুমি অতিশয় ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, তুমি তার পায়ের কাছে বসবারও যোগ্য নও। এর কাছে এসেই তুমি বারে বারে নিজের দৈন্য অনুভব করবে।

চুপি চুপি বর কহিল, এ কথা তোমার বুঝতে পারলাম না অমিয়।

বুঝতে পারবে, প্রথম যখন তোমার সঙ্গে দেখা হবে। বুঝবে, তুমি কী। তোমার প্রতি রোমকূপ থেকে তোমার সব লজ্জা ফুটে বেরোবে, তোমার যত পঙ্গুতা, যত গ্লানি, — তার চোখের দৃষ্টিতে হবে তোমার শুদ্ধি, তোমার নবজন্ম। তুমি যদি সারাজীবন ধরে' দুঃখ পেয়ে থাকো, এর কাছে বসে' তুমি সকল দুঃখের কৈফিয়ৎ পাবে, সকল বেদনার। এ মেয়ে তোমার কাছে হবে বিস্ময় !

বিস্ময় ?

হ্যাঁ, বিস্ময় ! বিস্ময় আর বিচিত্র ! নারীজাতি বহুদিন ধ'রে তপস্যা করেছে একটি নারীর জন্য ; সে এই মেয়েটি। শ্রাবণের আকাশ আপন অন্তর্বেদনায় কালো হয়ে উঠেছিল, সেই প্রসব-বেদনায় ফুটল একটি কেয়াফুল !

বর যেন তাহার কথাগুলির মধ্যে একটি সুস্বাদ গ্রহণ করিতেছিল। বলিল, যাক্ তোকে বহু ধন্যবাদ, তোর জন্যেই এ মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হওয়া সম্ভব হ'ল

তোর সঙ্গে পরিচয় ছিল বলেই ত'—আচ্ছা, আমাকেও ত' চিনিস, বেশ বনিবনা হবে ত' আমার সঙ্গে ?

অমিয় প্রথমে কথার উত্তর দিল না। সমস্ত কোলাহলের মাঝখানে বসিয়া একা তাহার মন কোথায় যেন উধাও হইয়া ছুটিয়াছিল। যেদিকে তাকাইয়াছিল সেদিকে তাহার দৃষ্টি ছিল না। মৃদুস্বরে বলিল, বনিবনা তোমার সঙ্গে নাও হতে পারে !

বিস্মিত হইয়া বর কহিল, সে কি রে ?

হ্যাঁ, এর অহঙ্কার একটু বেশী।

অহঙ্কার ? সর্বনাশ—

অহঙ্কার সুন্দরী ব'লে নয়, সুন্দর ব'লে। অহঙ্কার এর কলঙ্ক নয়, অলঙ্কার। কোথাও মাথা হেঁট করে না, তার কারণ এর আছে গভীর আত্মবিশ্বাস। আত্মবিশ্বাসই এর অহঙ্কার। তোমার স্ত্রী হবে, কিন্তু তোমার কাছে ছোট হবে না। তুমি যদি তার সমান না হতে পারো, অনায়াসে সে তোমাকে ছাড়িয়ে যাবে। জীবনে সে কিছুর জন্যেই অপেক্ষা করেনি। প্রেমের জন্য নয়, ঐশ্বর্যের জন্য নয়, সংসারের জন্যও নয়।

স্বাধীন মেয়ে নাকি ?

স্বাধীন নয়, সহজ। সহজ হতে পারাই তার মন্ত্র !—চুরুটে আর একটা টান দিয়া ধোঁয়া ছাড়িয়া অমিয় কহিল, তোমার সঙ্গে যখন প্রথম আলাপ হবে, বুঝবে, সে নিতান্ত নারী নয়।

নারী নয়, মানে ?

মানে তার মেয়েলিপনা কম। নারীর স্বার্থপরতা তার মধ্যে নেই; ছোট লোভ, তুচ্ছ ঈর্ষা, ক্ষুদ্র হিংসা, ছলনা ও লালসার ছোট ছোট ইঙ্গিত—এগুলো তার কাছে স্বপ্ন। এগুলো সে জয় করেছে তা নয়, এগুলোকে সে আনতে ভুলে গেছে। আনতে ভুলে গেছে বলেই তার এত অহঙ্কার।

বর বলিল, এই যদি সত্য হয় তবে সে ত' কাদার পুতুল। প্রাণহীন মাটির মূর্তি। তার গায়ে মানুষের রক্ত কোথায় ?

অমিয় হাসিল। হাসিয়া কহিল, সাধারণ নরনারীর দেহে আছে দুই রক্ত, মানুষের আর জানোয়ারের। এর শিরায় আছে শুধুই মানুষের রক্ত। এ মেয়ে হচ্ছে দেবতার আসন।

খুব তেজ আছে নাকি ?

তেজ নয়, জ্যোতি। দিনের আলোতেও তুমি দেখবে তার চারিদিক

ঘিরে জ্যোতির্মণ্ডল। সেই জ্যোতির্মণ্ডলের কাছে বসলে মাথার মধ্যে তোমার প্রলাপ জ'মে উঠবে। আনন্দে তুমি হবে অস্থির, তোমার হাসি পাবে, কিন্তু কান্নায় গলা বুজে আসবে; আরামের অসহ্য ব্যথায় তোমার সর্বশরীর থর থর ক'রে কাঁপবে। তোমায় মাতাল করবে না, কিন্তু বিভ্রান্ত করবে। তৃপ্তিতে অচেতন হবে, ঘুম পাবে।

বর কহিল, সে ত' মোহ!

মোহ নয়, মোহমুক্তি!

একটু অস্বস্তি বোধ করিয়া বর বলিল, এ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হচ্ছে অমিয়। তার আসল পরিচয়টা চেপে রেখে তুমি অনর্থক ধোঁয়ার সৃষ্টি করছ! আচ্ছা, সে কী ভালবাসে বলো দেখি?

অমিয় বলিল, সে ভালবাসে অশোক আর শিমূল আর জবা-কৃষ্ণচূড়া, রক্ত, সিঁদূর, আল্‌তা, সূর্যাস্তের আকাশ, আগুনের আভা, রেলপথের বিপদসূচক আলো।

দুইজনে কিয়ৎক্ষণ নির্বাক হইয়া রহিল। পর এক সময় তাহার হাতঘড়িটা ফিরাইয়া সময় দেখিয়া লইল। অমিয় আপন মনে মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল, সব চেয়ে কঠিন···সব চেয়ে কঠিন তুমি যখন তাকে ভালবাসার কথা বলতে যাবে। মনে হবে তাকে ভালবাসা জানাবার ভাষা তোমার হাতে নেই, তুমি একেবারে দেউলে হয়ে গেছ। তুমি অনেক কথা ভেবে তার কাছে বসবে, কিন্তু কিছুই বলা হবে না। তুমি যত বড় ঐশ্বর্যশালীই হও, তার কাছে মনে হবে তুমি ভিখারী। সব চেয়ে কঠিন তাকে ভালবাসা জানানো, সত্যি, সব চেয়ে কঠিন।

অমিয় চাপিয়া চাপিয়া অলক্ষ্যে একটা নিশ্বাস ফেলিল। তারপর বলিল, যত দিন যাবে ততই তুমি তার কাছে ছোট হতে থাকবে। একদিন তুমি তার নাগাল পাবে না···তুমি তার পায়ের তলায় আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, তুমি চীৎকার করতে পাবে না, কাঁদতে পাবে না, তোমার পালাবার শক্তি নেই, তোমার টুঁটি টিপে ধরেছে, তুমি ক্লিষ্ট, ক্লান্ত···নিজের কাঙালপনায় তোমার চোখে জল আসবে। মনে হবে জন্ম জন্ম ধরে ছায়ার মতো ওর পেছনে পেছনে তুমি ঘুরছ, অনাগত বহু জীবন ধরেও তোমাকে ওর অনুসরণ করতে হবে।

তাকে ভালবাসতে গিয়ে এই হবে আমার শাস্তি?

একটা অতি উগ্র আনন্দ অনুভব করিয়া অমিয় বলিল, হ্যাঁ, এই শাস্তি। এই শাস্তিই পুরুষের প্রেম!

বর কথা কহিল না। অমিয় একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিল

প্রতিদিন তুমি আয়োজন করবে একটি কথা বলবার জন্য, 'তোমায় ভালবাসি'— প্রতিদিন চূর্ণ হবে তোমার সে স্বপ্ন। ভালবাসার কথা শোনবার আগ্রহ যার আছে কিনা তুমি বুঝতে পারবে না, তাকে ভালবাসা জানাবার মতো সাহস তোমার হবে কেমন ক'রে? সে যে-ঘরে থাকবে, আপন অস্থিরতায় তুমি সে-ঘরে টিঁকতে পারবে না, তোমার দম আটকে আসবে। তোমার কেবলই মনে হবে এ মেয়ে সঙ্গীহীন, নিরন্তর কি একটা অনির্দিষ্ট বস্তুর জন্য ধ্যান করছে। তোমার কাছে কেবলই সে জটিল হতে জটিলতর হতে থাকবে।

বর কহিল, এমন মেয়েকে তা হলে বিয়ে করা উচিত নয়, তাই না?

অমিয় হাসিল। তারপর গভীর কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, তোমায় মনে হবে বিয়ে ক'রে তার কোনো পরিবর্তন হয়নি। পরিবর্তন হয় তার ভেতর থেকে, বাইরের আস্থা থেকে নয়। হৃদয়টা তার পুরুষের, মাথার ভেতরটা তার তীক্ষ্ণ কুশলী, পুরুষের মতো তার প্রতিভা, বাবের মতো তার সাহস ও শক্তি কিন্তু তবু সে মেয়ে। সেই গোপন মেয়েটি তার ভেতরে যে কোন গহনে বাস করছে, তাই আবিষ্কার করাই হবে তোমার সাধনা, তোমার প্রেম! নিজে তাকে ভালবাসি—এ কথা বলতে গেলেই সে হেসে উঠবে, তার কারণ সে নারী নয়। সে নারী নয়, এই কাঁটাই বার বার ফুটে ফুটে তোমায় ক্ষত-বিক্ষত করবে, যন্ত্রণায় তোমাকে জর্জরিত করবে, বেদনায় তোমার জীবন হবে দুর্বিসহ, দেহে আর মনে এমন জ্বালা ধরবে যে মনে হবে, তোমার শরীরের সমস্ত রক্ত নিঃশেষে বার ক'রে দিলে তুমি শান্তি পাও। তোমার মনে হবে—

বর বলিল, যথেষ্ট হয়েছে, আর আমি শুনতে চাইনে।—বলিয়া পরম আগ্রহ-ভরে সে বক্তার মুখের কাছে মুখ সরাইয়া আনিল।

ভিতরের অনুপ্রেরণায় ও আবেগে অমিয়র চোখ দুইটা জ্বালা করিতেছিল। তাহার চোখের ভিতর তাকাইলে মনে হইত, চোখের ধারগুলি তাহার সজল হইয়া আসিয়াছে। সে বলিল, কেবলই তোমার মনে হবে সে নিষ্ঠুর, তার হৃদয় নেই, অন্তরটা তার মরুভূমি, তোমার প্রতি সে উদাসীন; তোমার মধ্যে যখন ঝড় বইছে, তার তখন সময় হ'ল ছবি দেখবার। আর সব চেয়ে কঠিন পরীক্ষা তোমার, সে যখন তোমাকে ভুলে থাকবে।

ভুলে থাকবে? স্বামীকে?

হ্যাঁ, ভুলে থাকবে আর ভুলেও তোমার খোঁজ নেবে না। চোখের আড়ালে তুমি গেলেই মনের মঞ্চে সে যবনিকা ফেলে দিল। তোমার প্রতি তার অবজ্ঞা নয়, বিতৃষ্ণা নয়—এই তার রূপ।

স্বামীর প্রতি এই ব্যবহার করবে ?

স্বামীর প্রতি নয়, তোমার প্রতি। স্বামী তার কেউ নয়। হ্যাঁ, রাত্রে তোমার কণ্টকশয্যা। ঘুমের ঘোরে তুমি শিউরে উঠবে, দুঃস্বপ্নের ভয়ে তুমি অস্থির হয়ে পায়চারি ক'রে বেড়াবে। শত শত কঠিন বাহু দিয়ে কে যেন তোমাকে বাঁধবে, তুমি চীৎকার করতে যাবে, পারবে না, তুমি শক্তিহীন, নিশ্বাস নেবার হাওয়া তোমার ফুরিয়ে যাবে, সমস্ত শরীর তোমার পক্ষাঘাতগ্রস্ত !

বর উদ্ভ্রান্ত হইয়া কহিল, আর আমি শুনতে চাইনে ভাই, তুই চুপ কর অমিয়। —বলিয়া সে একবার ঘড়িটা দেখিয়া লইল।

অমিয় চুপ করিল না, মুখখানা আরও সরাইয়া আনিয়া বলিতে লাগিল, ভাঙা খেলনার মতো যদি কেউ তার কাছে গড়াগড়ি যায়, সে ফিরেও তাকায় না। নিজের মাথা তোমার চূর্ণ বিচূর্ণ ক'রে ফেলতে ইচ্ছে হবে, মনে হবে, এ প্রবঞ্চনা, এ অন্যায়—বিধাতার বিরুদ্ধে তোমার যুদ্ধ ঘোষণা করতে ইচ্ছে হবে, আকাশ তোমার চোখে হবে বিষাক্ত, জীবন তোমার কাছে হবে ভয়াবহ বিদ্রূপের মতো একটিমাত্র নারীর জন্য তোমার চোখে পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টি ওলোট-পালোট হয়ে যাবে। অথচ এই দুঃখের মধ্যেও তোমার ভেতরে জ্বলবে আনন্দের অগ্নিশিখা। দুঃখের পাত্র থেকে আনন্দ পান করবে অঞ্জলী ভ'রে। তার জন্য দুঃখ পেতেও তোমার ভাল লাগবে। একদিন সেই তোমাকে—বলিতে বলিতে গলা ধরিয়া আসিতেই সে হঠাৎ সচেতন হইয়া মুখ সরাইয়া লইল। বর তাহাকে এতক্ষণ ধরিয়া সন্দেহ করিতেছে নাকি ?

ভয়ে তাহার সর্বশরীর অবশ হইয়া আসিতেই সে আর বসিল না, তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

এমন সময় আসরে একটা সোরগোল উঠিল। কন্যা পক্ষের লোক আসিয়া করযোড়ে নিবেদন করিল, দয়া ক'রে উঠুন আপনারা, লগ্ন হয়ে এসেছে।

একসঙ্গে সবাই উঠিয়া হুড়োহুড়ি করিয়া ভিতরে যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বরকে লইয়া গেল সর্বাগ্রে।

বাহিরের নির্জনে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া অমিয় একবার রাত্রির আকাশের দিকে তাকাইল। দুই দিকে বড় বড় বাড়ীর মাঝখান দিয়া সে-আকাশ সামান্যই দেখা গেল। তারপর মুখ ফিরাইয়া কাছে একটা বাড়ীর রোয়াকে উঠিয়া সে পা ঝুলাইয়া বসিল। তারপর পকেট হইতে সিগারেট ও দেশালাই বাহির করিয়া সে যখন অন্ধকারে ধরাইল তখন দেখা গেল, তাহার দুই গাল বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া আসিয়াছে।

আগ্নেয়গিরি

সোনাগাঁ হইতে সাত ক্রোশ গোরুর গাড়ী। মাঝে মাঝে বাঁশ আর খেজুরের জঙ্গল, মাঝে মাঝে মাঠ—শীতের মাঝামাঝি এখনও ক্ষেত হইতে ধান উঠে নাই। সবেমাত্র ইতুপূজা ও নবান্ন শেষ হইয়াছে। গ্রামে গ্রামে ছোটবড় উৎসব লাগিয়াই ছিল।

ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তা দিয়া গোরুর গাড়ী অনেকদূর চলিয়া আসিয়াছে, পথে দুই একটা শুকনো নদী পড়িয়াছিল, তাহারই কাছাকাছি পানীয় জল পাইয়া সবাই খাইয়াছিলাম। দুপুরের রৌদ্র, দিগন্তজোড়া মাঠ, শীতের স্নিগ্ধ হাওয়া, গাছে গাছে পাখীর কলরব,—চতুর্দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া পথ আমাদের ফুরাইয়া আসিতেছিল।

ছয়খানা গোরুর গাড়ীতে আমরা সবশুদ্ধ ষোলটি মানুষ। আমার গাড়ীতে আমি ছিলাম একা। আমাদের গ্রামের বড়বউ এবং তাহার আত্মীয়স্বজন আগের গাড়ীগুলিতে চলিয়াছেন। তাহার কাছে আমরা সকলে আমাদের পথ-খরচ জমা রাখিয়াছি। তিনি আমাদের কর্ত্রী। তাঁহার উপর মাথা তুলিয়া কেহ কথা বলিতে পারি না, এই নিয়ম-নীতি মানিতেই হইবে।

শেষের গাড়ীতে কুসুম তাহার বুড়া বাপকে লইয়া চলিয়াছে। বৃদ্ধের বাতের ব্যারাম, পক্ষাঘাতের লক্ষণ। বাবা মজেশ্বরের মাদুলি অঙ্গে বৃদ্ধ সারিয়া উঠিতে পারে এই আশায় কুসুম তাহাকে লইয়া তীর্থ করিতে চলিয়াছে। এতদিন সঙ্গী পাওয়া যায় নাই বলিয়া মনের বাসনা মনেই ছিল। গাড়ীর ভিতরে বৃদ্ধ জড়ের মতো পড়িয়া আছে।

ছইয়ের ভিতর হইতে এক সময় গলা বাড়াইয়া কুসুম কহিল, আমি ত' কোনো দোষ করিনি। আমার অন্যায়টা কি হ'ল?

আমার ঠিক পিছনেই তাহার গাড়ী। গোরু দুইটা অভ্যাসমতো চলিতেছে, গাড়োয়ান কাৎ হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মুখ বাড়াইয়া ইঙ্গিতে কুসুমকে চুপ করিতে বলিলাম। জানি তাহার প্রতিবাদে ফল হইবে না, অশান্তিই বাড়িবে।

কুসুম চুপ করিল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে পুনরায় বিনীত কণ্ঠে কথা কহিল, টাকা ক'টা ওঁর কাছে রাখতে গেলাম, উনি দিলেন গালমন্দ। উনি ব্রাহ্মণ, উনি বড়, আমি ওঁর পায়ের ধূলোর যুগ্যি নই।—তুমি বুঝি ওঁর আত্মীয়?

বলিলাম, আমার এখানে কোনো আত্মীয় নেই। ওরা পথ চেনে না, আমি তাই সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।

কুসুম কহিল, তখন উনি জল খেলেন না কেন?

আমাকে ইঙ্গিত করিয়া কুসুমকে থামাইতে হইল। ছেলেমানুষ বলিয়া তাহার কৌতূহল বেশী, সকল কথা প্রকাশ করিয়া না বলিলে সে বুঝিতে পারে না। রতনপুরে একটা কূয়া পাওয়া গিয়াছিল, সেই কূয়ার জল লইয়াই বিপত্তি। বাপের জন্য ঘটি নামাইয়া কুসুম জল লইয়াছিল, বড়বউ তাহা দেখিতে পাইয়াছিলেন। মুখে কিছু বলিলেন না, কিন্তু নিজে তিনি তৃষ্ণা চাপিয়া রহিলেন। তাঁহার সেই গম্ভীর কঠিন মুখ দেখিয়া আমরা আর তাঁহার সহিত কথা বলিতে সাহস করি নাই।

কুসুম আবার যেন কি বলিতে গেল, আমি চটিয়া উঠিলাম। বলিলাম, সব কথা তুমি শুনবে এমন অধিকার তোমার নেই। ব্রাহ্মণের মেয়ে যদি যেখানে-সেখানে জল না খেয়ে থাকেন তবে তোমাকে তার কৈফিয়ৎ দিতে যাবেন কেন?

কুসুম তিরস্কারে একটুও দমিল না। কেবল কহিল, আমি ছোটলোক, আমার বাপ ছোট জাত, মারলেও কথা বলা উচিত নয়।

এত যদি জানো তবে চুপ ক'রে থাকো। তুমি যে ওঁর সঙ্গে যেতে পাচ্ছো এও কি তোমার কম লাভ?

কুসুম চুপ করিয়া গেল।

মোচাখোলা পার হইয়া আমাদের গাড়ীগুলি একটা রেলপথের লেবেল্-ক্রসিংয়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। গাড়ী চলিয়া গেলে তবে ঠিকাদার লোহার গেট তুলিয়া ধরিবে। দূরে সিগ্‌নাল ডাউন হইয়াছে। শীতের বেলা। তিনটা বাজিতেই রৌদ্র আলগা হইয়া আসিতেছিল। ধূলা জড়াইয়া মাঠে মাঠে রুক্ষ ঠাণ্ডা হাওয়া এদিক ওদিক ফিরিতেছে। পিছনের গাড়ী হইতে কুসুম পুনরায় প্রশ্ন করিল, রাস্তা আর কত বাকি?

সকাল হইতে সমস্ত পথটা তাহার প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে হায়রাণ হইয়াছি। মানুষের বিরক্তি সে বুঝিতে পারে না, সে মনে করে পৃথিবীর সবাই বুঝি তাহারই মতো কৌতূহলী, তাহারই মতো নিশ্চিন্ত; তাহার প্রশ্নের জবাব

দেওয়া ছাড়া মানুষের আর কোনো কাজ নাই। অনেক কষ্টে সংযত কণ্ঠে কহিলাম, কোশ খানেক আর আছে। ছটফট করলে পথ ফুরোয় না।

বাবা, এখনো এক কোশ? পথ ভুল করোনি ত'? কুসুম কহিল।

তাহার দিকে তাকাইলাম। বলিলাম, সোজা পথটা তুমি দেখিয়ে দিলেই পারতে?

কুসুম বুঝিতে পারিল, আমি রাগ করিয়াছি। তবু কহিল, ওমা, মেয়ে-মানুষ বুঝি আবার পথ চেনে? কে জানে কোথা দিয়ে কোথায় যাচ্ছি। আমি অত বুঝিনে।

সুতরাং চুপ ক'রে থাকো।

কুসুম কহিল, বেলা গড়িয়ে এল, পথে চোর ডাকাত নেই ত'?

বলিলাম, থাকলেই বা তোমার ভয় কি?

কুসুম হাসিয়া কহিল, ওমা, আমার আবার কি ভয়, পাহাড়ের আড়ালে আছি। তোমরা থাকতে আমার—

তবে চুপ ক'রে থাকো।

এমন সময় হুস হুস শব্দে ট্রেণ আসিয়া পার হইয়া গেল। ঠিকাদার আসিল, লোহার বেড়া তুলিয়া ধরিল, আমাদের গাড়ীগুলি একে একে পার হইয়া ওপারের গ্রামের পথ ধরিল।

পিছন ফিরিয়া একবার দেখিলাম, কুসুম তাহার বুড়া বাপের মুখে ঘটি হইতে জল খাওয়াইতেছে, আঁচল দিয়া মুখ মুছাইয়া দিতেছে। গোরুর গাড়ীতে চড়ার পরিশ্রম আর সে সহ্য করিতে পারে না। মাদুলি পরাইয়া যাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করা হইতেছে, পথের মাঝখানেই বুঝি তাহার প্রাণবায়ু বাহির হয়। বৃদ্ধকে আনা উচিত হয় নাই।

বলিলাম, ভালো আছে ত'? তোমার বাবার কথা বলছি।

কুসুম কহিল, ভালো আর মন্দ! প্রাণটা আছে এই যা।

পুরুষমানুষ একজনকে সঙ্গে আনতে পারলে না? ধরো পথে যদি কোনো বিপদ ঘটে? তুমি একা মেয়েমানুষ—

কে আর আছে!—বলিয়া কুসুম ছইয়ের বাহিরের মাঠের দিকে একবার তাকাইল; পুনরায় কহিল, আছেন ভগবান, দুঃখীর আশ্রয়।—বলিয়া সে বাহিরের দিকে তাকাইয়া রহিল।

কুসুমের বয়স কম নয়, বাইশ চব্বিশ হইবে। অনেক কথাই তাহার সম্বন্ধে শুনিয়াছি, কিন্তু কোনো কথা বিশ্বাস করিবার মতো তাহার ভাবভঙ্গী দেখি

নাই। নীতির মূল্য আমার জানা আছে সুতরাং সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করিব না। কুসুম সংসার করে নাই এই পর্যন্তই আমি জানি। কিন্তু বড়বউয়ের ধারণা অন্যরূপ, কোনো যুবতী স্ত্রীলোককেই তিনি বিশ্বাস করেন না। কুসুমের সম্পর্কে নানা কারণ দেখাইয়া তিনি তাহাকে এখানে আনিতে ঘোর আপত্তি দেখাইয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত সে আসিতে পারিয়াছে। তাহার সকল ঝক্কি আমাকেই পোহাইতে হইবে। আমারই যত জ্বালা!

কুসুম কহিল, আর বোধ হয় দেরি নেই, কেমন? গোরুর গাড়ীর ধকলে গা-গতর ব্যথা হয়ে গেল! ধন্যি তীর্থ। অঃ অপরাধ নিয়ো না, বাবা যজ্ঞেশ্বর —বলিয়া পথের দিকে সে একটা প্রণাম জানাইল।

বলিলাম, এত আরামপ্রিয় হ'লে পুণ্য করা চলে না।

ম্লান হাসিয়া কুসুম কহিল, আমার পুণ্য তোমাদের পায়ের তলায়। বাবার মাদুলির জন্যেই আসা, নৈলে,—

নৈলে কি?

তুমি শুনলে রাগ করবে ঠাকুরমশাই, পুণ্যির লোভ আমার একটুও নেই, আমার দেবতা তোমরাই, তোমাদের সেবা করলেই আমি ধন্য বাবা যজ্ঞেশ্বর আছেন আমার বুকের মধ্যে।

বলিলাম, চুপ ক'রে থাকো।

কুসুম রাগ করিয়া কহিল, তোমার কেবল ওই এক কথা, আমি কি বোবা যে মুখ বুজে থাকব? ঠাকুরমশাই, তোমার মেজাজ দেখছি ভারি গরম। সঙ্গে এনে মাথা কিনেছ, কেমন? বলে—'নিজের লেবো, নিজের খাবো, কেবল মাত্তর সঙ্গে যাবো!' তোমার গায়ে বড়োমার হাওয়া লেগেছে!

হাসিয়া বলিলাম, বড়বউয়ের ওপর এত রাগ কেন তোমার? ব্রাহ্মণের মেয়ে ব'লে?

কুসুম জিব কাটিল। বলিল, ওমা, শোন কথা। রাগ করব ঠাকুরের ওপর, সাত জন্ম নরকবাস হবে যে! বলছিলুম আমার বড্ড জ্বর হয়েছে, বোধ হয় আমারই মেজাজ ভালো নেই···গাড়ী থেকে নামলে বাঁচি।

জ্বর হয়েছে। কই, আগে বলোনি ত'?

পথে এসে জ্বর হ'ল।

দুশ্চিন্তায় পড়িলাম। অসুখ বাড়িলে চিকিৎসা করিবার সুবিধা নাই, মহকুমা শহর এখান হইতে অনেক দূর। যজ্ঞেশ্বর গ্রামে আশ্রয় বলিতে কোথাও কিছু নাই, দুই-একটা হোগলার চালা আছে তাহাতেই কোনো মতে তিন রাত্রি বাস

করিতে হইবে। যদি আগে হইতে সেখানে যাত্রীর ভিড় হইয়া থাকে তবে হোগলার চালাও না মিলিতে পারে। সম্মুখে শীতের রাত্রি, মাঠের কন্‌কনে বাতাস, গ্রামের অন্ধকারে কাহার কিরূপ ব্যবস্থা হইবে তাহাও এক সমস্যা— ইহার ভিতরে রোগীর কোনো সুব্যবস্থা হওয়া সম্ভব নয়। কুসুমের উপর এইবার সবাই রাগ হইল।

বলিলাম, বাপ অকর্মণ্য, তার ওপর তোমার জ্বর, আমাদের কী বিপদে ফেললে বলো ত'? দেখবে কে তোমাদের?

যজ্ঞেশ্বর গ্রাম আসিয়া পড়িয়াছে, দূরে মানুষের গলার আওয়াজ পাওয়া যাইতেছে। দুই একটা টিম্‌টিমে আলো ইহারই মধ্যে জ্বলিয়া উঠিয়াছে। বেলা সাড়ে পাঁচটা বাজিয়া গেছে। শীতের সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। সেইদিকে একবার করুণ দৃষ্টিতে তাকাইয়া কুসুম কহিল, দেখবেন তিনি, যিনি এ সবার মালিক।

কষ্টকণ্ঠে বলিলাম, কে তিনি বলো? আমি, না ভগবান? কোন দুর্ভাগ্য?

কুসুম কহিল, তুমি ব্রাহ্মণ, তুমিই আমাদের ঠাকুর।

কথায় কথায় তাহার এই একটা ভক্তির ভাষা, ইহা তাহার বিদ্রূপ অথবা আন্তরিক বিশ্বাস, তাহা এখনও আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। [illegible] ভিতরে [illegible] শব্দ পাওয়া যাইতেছে।

গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলাম, তখন বেলাও [illegible]। নিকটে দুই চারিটি তাল-গাছে ঘেরা ছোট [illegible], সম্মুখে [illegible] মন্দির। মন্দিরের দেবতা বিশেষ জাগ্রত, ইহা [illegible] বিখ্যাত তীর্থ। কয়েকদিন আগে মেলা হইয়া গিয়াছে তাহার চিহ্ন এখনো [illegible]। [illegible] আমাদের মত এতগুলি যাত্রী দেখিয়া পাণ্ডা আসিয়া দাঁড়াইল। বড়বউ আসিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন তুমি সরো, যা বলতে হয় আমি বলছি। আমাকে সাধারণ মনে ক'রো না।

আমি সরিয়া গেলাম। বড়বউয়ের গলার আওয়াজে যে দম্ভ প্রকাশ পাইল তাহা আমার পরিচিত। তাহার স্বামী [illegible] বাহাদুর, অনেক সম্পত্তির মালিক, তেজারতি কারবার ছিল তাঁহার। তিনি অনেক দেখিয়াছেন। পাণ্ডা-ঠাকুরের সহিত আলাপ করিয়া তিনি এই ব্যবস্থা করিলেন যে, আতপ চাল, জ্বালানি কাঠ ও কিছু সব্জি পাওয়া যাইবে এবং যে হোগলার চালাটা এখনো খাড়া হইয়া কোনো মতে দাঁড়াইয়া আছে সেটি বড়বউ নিজে তাহার বোনপোকে লইয়া দখল করিবেন। আমরা সবাই এই ব্যবস্থা দেখিয়া চুপ করিয়া গেলাম, কারণ বড়বউয়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য না দেখিলে আমাদের উপায় নাই। প্রথমত

তাঁহার স্বামী ছিলেন রায়বাহাদুর, তিনি ডেপুটি-গিন্নী ; দ্বিতীয়ত তিনি উচ্চ কুলের ব্রাহ্মণ কন্যা ; বিত্তশালিনী ! তাঁহার বাড়ীতে মন্দির, ঠাকুরের গায়ে সোনা রূপার গহনা, তাঁহার গোয়ালে গোরু, সিন্দুকে টাকা, কোম্পানীর কাগজ এবং পাটের কলে তাঁহার শেয়ার। বহুতীর্থে তিনি গো-দান করিয়া অপরিমেয় পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছেন। জীবনে তাঁহার কেবল একটিমাত্র দুঃখ এই যে, তাঁহার সন্তান নাই। যাহা হউক, আমরা চৌদ্দটি প্রাণী কেমন করিয়া কি ভাবে রাত্রি বাস করিব তাহা আহারাদির পরে ভাবিব, কিন্তু কুসুম ও তাহার বাপকে চালার ভিতরে না রাখিতে পারিলে বিপদ ঘটিবে এই মনে করিয়া আমি পুনরায় অগ্রসর হইয়া কহিলাম, দেখুন বড়মা, আপনি যদি পাণ্ডার বাড়ীতে জায়গা নেন তবে ভালো হয়। জায়গার বিশেষ অভাব ঘটছে।

বড়বউ কহিলেন, কেন ?

বলিলাম, কুসুম আর ওর বাপকে চালার মধ্যে জায়গা দিতে হবে, ওদের বড় অসুখ।

তীক্ষ্নকণ্ঠে বড়বউ বলিলেন, হুঁ। আমি কানা নই, বোকা নই, সবই স্বচক্ষে দেখেছি। সমস্ত পথটা পাশাপাশি গাড়ীতে ব'সে হাসি তামাসা করতে করতে এসেছো। বুঝলুম তোমাকে, দেশে ফিরে গিয়ে সব বলব। নষ্ট-দুষ্টকে আমি দেবো জায়গা ছেড়ে ?

কি বলছেন আপনি ?

বড়বউ চীৎকার করিলেন—তুমি না বামুনের ছেলে ? তুমি না ডাকসাইটে বিদ্বান ? একটা ইতিজাতের মেয়ের সঙ্গে ...এই তোমার রুচি ? দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে।

বলিলাম, এটা বিদেশ, আপনি চেঁচাবেন না।

কান ভারি ক'রে দিয়েছে, কেমন ?—বড়বউ বলিতেছিলেন, ওকালতি করতে এসেছো ওই একটা ঢলানে ছুঁড়ির পক্ষ নিয়ে ? আমার ত্রিসীমায় আসতে মানা ক'রে দিয়ো, জায়গা আমি দিতে পারব না।

জায়গা তিনি না দিন কিন্তু নিরপরাধ একটি মেয়ের চরিত্রের প্রতি এমন কদর্য কটাক্ষ, ইহা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া হজম করিতে হইল। তিনি সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে, বয়োজ্যেষ্ঠ, তাঁহার সম্মান আমাদেরই রাখিতে হইবে, তাহার দোষ-ত্রুটি ক্ষমা করিয়া চলিব—এই কথা ভাবিয়া আমি চলিয়া আসিলাম। সংসারে আপোষ না করিয়া চলিলে উপায় নাই, অন্যায় ও অবিচারকে সহনযোগ্য না করিয়া লইলে অশান্তি বাড়িবে বৈ কমিবে না।

বুড়া বাপকে লইয়া কুসুম এক জায়গায় বসিয়া পড়িয়াছিল। তাহাকে দেখিয়া অবাক হইতে হয়। সে কেবল পরিশ্রমী নয়, অত্যন্ত অস্থির আর চঞ্চল, এক জায়গায় তাহাকে কখনো বসিয়া থাকিতে দেখা যায় না। কিন্তু নূতন জায়গায় এমন ভাবে তাহাকে নিষ্ক্রিয় দেখিয়া চিন্তিত হইলাম। কহিলাম, কুসুম, তোমার জ্বর বুঝি বেড়েছে ?

বুড়া বাপ কম্পিত হাতখানা তুলিয়া কন্যার মাথায় রাখিল। কুসুম কহিল, বেড়েছে যেন। আঃ—মাথায় বড় যন্ত্রণা।

আশ্চর্য মানুষের মন। কাল হইতে এই মেয়েটির প্রতি সকলের অবজ্ঞা আর দুর্ব্যবহারের অন্ত নাই, ইহাকে অশুচি হিসাবে দেখিবার কেমন একটা আপ্রাণ চেষ্টা সকলের—অথচ ভিতরে ভিতরে ইহারই প্রতি আমার একটা অকারণ স্নেহ জমিয়া উঠিয়াছে। সকলে ইহার বিপক্ষে গিয়াছে—তাই বোধ করি ইহাকে মমতার আশ্রয় দিবার জন্য আমার মন লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ইহার কারণ কি ? কেন তাহার প্রতি আমি এমন সহৃদয় হইতেছি ? সে একজন যুবতী স্ত্রীলোক বলিয়াই কি আমার এই পক্ষপাতিত্ব ? কই, নিজের ভিতরে ত' এখনও আসক্তির আভাস খুঁজিয়া পাই নাই! সে অবনত জাতির মেয়ে, তাহার প্রতি স্নেহ দেখাইয়া কি বর্ণহিন্দুর উদারতা দেখাইতেছি, আপন আভিজাত্য প্রচার করিতেছি ? নয়ত কি পরোপকার করিয়া আত্মাভিমানকে তৃপ্ত করিতেছি ? কিছুই বুঝিতে পারি না, কেবল এই কথাটাই মনে হইতে লাগিল, তাহার অথবা তাহার পিতার কোনো বিপদ ঘটিলে আমিই সেজন্য দায়ী হইব, সে কলঙ্ক আমাকেই স্পর্শ করিবে।

কাছে দাঁড়াইয়া কহিলাম, তোমাকে কিন্তু ওষুধ খেতে হবে কুসুম, জ্বরের ওষুধ আমার সঙ্গেই আছে।

বাবার মন্দিরে এসে ওষুধ খাবো ?—কুসুম দুর্বল দেহে সরিয়া আসিয়া আমার পায়ের কাছে এক প্রণাম করিয়া কহিল, তোমাদের আশীর্বাদেই সেরে উঠবো, ঠাকুরমশাই। ওষুধ আমি খাবো না।

অনুরোধ মানিল না, দেখিতেছি আমাকে ভোগাইবে। কিন্তু এখন আর এদিকে নজর দিবার সময় নাই। আমার হাতেই সকলের আহারের ব্যবস্থা। তাহাদের নিকট হইতে পয়সা লইয়া বড়বউকে লুকাইয়া চিঁড়ে মুড়কি ও দুধ সংগ্রহ করিয়া আনিলাম! তাহাদের শুইবার জায়গা মন্দিরের ভিতর মিলিবে না, হোগলার চালাগুলি আমাদের দল পূর্বেই অধিকার করিয়া লইয়াছে, ময়রার দোকানে জায়গা নাই, গ্রামের ঘরে কে রাত্রে জায়গা দিবে!—সাত পাঁচ ভাবিয়া

এক কৌশল আবিষ্কার করিলাম। গাছের নীচে ঠেকো দিয়া দুইখানি গোরুর গাড়ী একত্র করিয়া এক অদ্ভুত উপায়ে আশ্রয় প্রস্তুত করা গেল। তিনটা রাত্রি কোনোরূপে তাহার ভিতরে পিতা ও কন্যার কাটিয়া যাইবে। সে-রাত্রে আমাকে একখানা গাড়ীর ভিতরে জায়গা লইতে হইল। শীতকাল বলিয়াই বিপদ, গ্রীষ্ম হইলে আরাম পাওয়া যাইত।

যাত্রীর কলরবে সকালবেলা ঘুম ভাঙ্গিল। মেয়েরা স্নান সারিয়া পূজার আয়োজন করিতেছে। বড়বউ ডালা সাজাইতেছিলেন। পাণ্ডা অদূরে দাঁড়াইয়া পূজা-বিধি নির্দেশ করিতেছিল।

হঠাৎ বড়বউ পিছন দিকে দেখিয়া হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন। বলিলেন, কী আক্কেল তোর কুসুম, এই কি পেন্নাম করবার সময়? চোখ পড়লো তোর, ডালাটা যে নষ্ট হয়ে গেল! ভক্তিতে গদগদ, কে তোর পেন্নাম চেয়েছিল শুনি। পাণ্ডাঠাকুর, নতুন সাজ নিয়ে এসো, এ ডালা আমি যজ্ঞেশ্বরকে দিতে পারবো না, আমার অপরাধ হবে। বলি, এত ভক্তি কেন লা? কাল হাতে নাতে ধরা পড়েছিলি-কি না, তাই ঘুষ দিয়ে খুশী করতে এলি, কেমন?

কুসুম অপ্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল। কহিল, বুঝতে পারিনি বড়মা, আমি মনে করেছিলুম—

পাশে রাঙাদিদি বসিয়াছিলেন, কহিলেন, কি মনে করেছিলি কুসমি? ওলো, বয়েস হয়েছে আমাদের, কিন্তু কানা হইনি। দেখতেই পেলুম, শকুনি আকাশে উঠলেও ভাগাড়ে নজর রাখে!

কুসুমের চোখে জল আসিয়াছিল, কহিল, আমি ওঁর আশীর্বাদ চাইতে এসেছিলুম, উনি যে বড়!

মাসিমা কহিলেন, মুখখানা তোর মিষ্টি, তাই এ যাত্রা বেঁচে গেলি বাছা। অনিষ্ট ত' করলি, এখন স'রে যা এখান থেকে।

কুসুম সরিয়া যাইতেছিল, রাঙাদিদি কহিলেন, এই যেন মনে থাকে। আমাদের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে ত' এলি। মন্দিরে গিয়ে পূজোয় বসবো, তখন ভুম্ করে গিয়ে যেন হাজির হোসনে।

বড়বউ কহিলেন, সঙ্গে ক'রে এনেছি, কাল থেকে হাড় জ্বালিয়ে খেলে। জাত ধর্ম নিয়ে এখন ওর সংস্রব এড়াতে পারলে বাঁচি। বলি ও কি, কোনদিকে যাস লা?

কুসুম ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, পুকুরে।

পুকুরে? ভারি তোর বুকের পাটা, না? পুকুরের জল ছুঁয়ে আসবি, আমরা সবাই খাবো কি? ধর্মের ভয় নেই তোর? পায়ের জুতো মাথায় উঠতে চায়, কেমন? ওই ত' আর একটা ডোবা আছে ওদিকে, যেতে পারিসনে? গতর নেই?

কুসুম ভয়ে-ভয়ে কহিল, ওটার জল নোংরা!

সবাই হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল,—নোংরা? কত ঢঙই দেখালি, কুসুম! যোটে মা রাঁধে না, তায় পান্তা আর তপ্ত!' পেলি এই খুব, আবার নোংরা! তুই জাতটা কি শুনি? বল দেখি সবার সামনে দাঁড়িয়ে?

কুসুম চলিয়া গেল। আমার মাথা হেঁট হইল।

পাণ্ডাঠাকুর পুনরায় আসিয়া দাঁড়াইল। আমি কহিলাম, ঠাকুর, পূজো কখন হবে?

বড়বউ কহিলেন, তোমার আর সেজন্য মাথা ব্যথা কী বলো, পূজো ত' আমাদের। তুমি পুরুষমানুষ, জল-টল খেয়ে বেড়িয়ে বেড়াওগে। খাবার সময় ডাকবে এরা।

রাঙাদিদি কহিলেন, চুলের টিকি ত' তোমার দেখবার জো নেই, এখন যে এলে খবর নিতে? মতলব কি?

বলিলাম, আমার নিজের কোনো কাজ নেই; পূজোর সময় কুসুম ওর বাপের মাদুলিটা যজ্ঞেশ্বরকে ছুঁইয়ে নেবে তাই বলছিলুম। আপনাদের পূজো কখন?

বড়বউ হাতের কাজ ফেলিয়া আমার দিকে চাহিলেন! কহিলেন, কি বলচো? কার মাদুলি কাকে ছোঁয়াবে?

বলিলাম, কুসুম ওর বাপের জন্যে মাদুলিটা—

বড়বউ হুঙ্কার দিলেন। কহিলেন, পূজোটা ত' কুসুমের বাপের মাদুলির জন্য, এক পোঁটলা টাকা নিয়ে আমি এসেছি তীর্থে, পূজো দেব আমি। যতক্ষণ আমার টাকায় পূজো ততক্ষণ আমার ঠাকুর—

পাণ্ডা কহিল, বটেই ত', মা আমার বড় উঁচু ঘরের মেয়ে!

আমার পূজোর সময় ওর মাদুলি ছোঁয়াতে দেবো?—বড়বউ চীৎকার করিতে লাগিলেন, পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা, কেমন? বলোগে যাও তোমার পেয়ারের কুসুমকে, ভণ্ডামি করলে ঠাকুরের দয়া হয় না, মনের ময়লা তুলে ফেলতে হয়। বাবা যজ্ঞেশ্বর ফাঁকি সইবে না!

রাঙাদিদি আর মাসিমা আবেগপূর্ণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, দেখলে পাণ্ডা-ঠাকুর, জাতসাপ এনেছি সঙ্গে, বড়বউ আমাদের থেঁদি পেঁচির ঘরের মেয়ে নয়, বুঝলে?

পাণ্ডা ঘাড় নাড়িয়া হাত কচলাইয়া কহিল, বটেই ত'।

আমার দিকে ফিরিয়া ফস করিয়া পঞ্চুর মা কহিল, তুমি ত' দেখছি বাছ ঘরের শত্তুর বিভীষণ! টাকা খরচ ক'রে বড়বউ তোমাকে নিয়ে এলেন, তুমি দলছাড়া হ'য়ে ছোটজাতের দলে গিয়ে ভিড়লে? এ তোমার কেমন রীতি বাবা?

আমি জানি ইহারাও তিন চারজনে বড়বউয়ের টাকায় তীর্থ করিতে আসিয়াছে, চাটুবাক্য শোনানো ছাড়া ইহাদের আর কোনো লক্ষ্য নাই—ইহ জানিয়াও আমি চুপ করিয়া রহিলাম। কী বলিব? কী বলিয়া বুঝাইব, মনুষ্যত্বকে মারিয়া তীর্থধর্ম হয় না!

কিন্তু কিছু বলিবার পূর্বেই মাসিমা পঞ্চুর মার কথার জবাব দিলেন—এই করেই ত' বাঙালী জাতটা উচ্ছন্নে গেল!

ধীরে ধীরে সেখান হইতে চলিয়া গেলাম। চালার পাশ দিয়া আসিয়া ডোবাটা পার হইয়া অদূরে কুসুমকে দেখা গেল। গোরুর গাড়ীর একখানা চাকার গোড়ায় বুড়া বাপকে লইয়া সে ছোট একটা ঘরকন্না পাতিয়াছে। কি কাছে গিয়া দেখিলাম সে কাঁপিতেছে, জ্বরে সে পুড়িয়া যাইতেছে, গলার আওয়াজে মনে হইল বুকে সর্দি বসিয়াছে। কাছে আসিতেই সে মুখ তুলিল দেখিলাম তাহার গাল বাহিয়া অশ্রু নামিয়াছে। বলিলাম, কুসুম, কাঁদো কেন কি হ'ল?

কুসুম অশ্রুজড়িত কণ্ঠে জানাইল, ডোবার জল লইয়া সে অতি কা ফিরিতেছে এমন সময় অসাবধানবশত তাহার ছায়াটা মানদাদিদির গায়ে পড়ি গিয়াছিল—মানদাদিদি অকথ্য অপমান করিয়া তাহাকে মারিতে আসিলেন বড়মার বোনপো তাহার পিঠে খানিকটা কাদা ছুড়িয়া দিয়াছে।

তাহার বুড়া বাপ শীর্ণকণ্ঠে ম্লান হাসিয়া কহিল, ঠাকুরমশাই, ওর মনে থাকে না যে, ও ছোটজাত। ছেলেমানুষ কিনা তাই অপমানটা এখনো গায়ে লাগে থাম বাবা থাম, হিসেব ক'রে চল।

আমি হাত নাড়িয়া হাসিয়া বলিলাম, আরে এ আর কতটুকু? শক্তিমা করেছে অত্যাচার দুর্বলের ওপর। অতি সাধারণ কথা। বেশ, আমাকে বামুনের ছেলে ব'লে মানো ত'? এই আমি গলবস্ত্র হয়ে তোমার কাছে—বি ও কুসুমসুন্দরী—

দুর্বল দেহে কুসুম হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল, কী করছ, অপমান হবে যে তোমা ও ঠাকুরমশাই—?

আমি কৌতুক অভিনয় করিয়া কহিলাম, হে কুসুমসুন্দরী, দেবতা সাক্ষী করিয়া আমি তোমাকে এই অভিশাপ দিই যে, পরজন্মে তুমি এক সনাতন হিন্দু-পরিবারে বড়বউরূপে জন্মগ্রহণ করিবে।

ওমা, ওকথা ভাবলেও যে আমার পাপ হবে, ঠাকুরমশাই।—বলিয়া কুসুম তাড়াতাড়ি মাটিতে মাথা নোয়াইয়া আমাকে প্রণাম করিল। কহিল, সকলের পায়ের তলায় থাকব, সবাই আমাকে মাড়িয়ে যাবে, সেই আমার অক্ষয় পুণ্য ঠাকুর।

তোমার মুণ্ডু। বলিয়া চলিয়া আসিলাম।

কুসুমের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে গিয়া আমি প্রায় একঘরে হইয়া আছি। বাস্তবিক দলছাড়া হইয়া অন্য দলে গিয়া ভিড়িলে মানুষের একটু লাগে বৈ কি। পঞ্চুর মা ঠিকই বলিয়াছে। দলাদলি করিয়াই বাঙলা দেশের যত অধঃপতন। আর যাহাই হউক, বড়বউ গাড়ী ভাড়া দিয়া আনিয়াছেন। নিজের অপরাধটা আমি মর্মে মর্মে বুঝিতেছি। কিন্তু এত করিয়াও কুসুমকে একপান্ ঔষধ খাওয়াইতে পারিলাম না। তীর্থস্থানে ঔষধ স্পর্শ করিতে নাই, দেবতার প্রতি অবিশ্বাস প্রকাশ করা হয়—এ বলিয়া সেই যে কুসুম বাঁকিয়া বসিয়াছে, কাহার সাধ্য তাহার প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গে। আমি চিকিৎসক নই, অসুখ তাহার কতদূর বাড়িয়াছে, রোগ কতদূর গভীরে নামিয়াছে তাহা বলিতে পারিব না। কিন্তু ইহা দেখিতেছি, সে যেন জ্ঞান ও অজ্ঞানের সন্ধিক্ষণে দাঁড়াইয়া কেমন হইয়া গিয়াছে, তাহার সকল কথার অর্থ বোঝা যায় না। সকলকে লুকাইয়া তাহার মাথায় একবার হাত দিয়া দেখিলাম—তাহা এত গরম যে, আমার হাতখানা কিছুক্ষণ ধরিয়া জ্বালা করিতে লাগিল। নিজে সে কিছু খাইবে না, বুড়া বাপ তাহাকে কিছু খাওয়াইতে অক্ষম। আমি বাটি ধরিয়া তাহাকে অনুরোধ করিতে পারি কিন্তু যত্ন করিয়া তাহাকে খাওয়াইবার সাধ্য আমার নাই। তাহার সেবা করিবার জন্য নিকটের গ্রামে গিয়া একটি স্ত্রীলোককে ধরিয়া আনিয়াছিলাম কিন্তু মানদাদিদি তাহাকে কি যেন বলিল, সে তাহাকে না বলিয়া পলাইয়া গেল। কুসুম আমাকে এযাত্রায় বেশ জব্দ করিল দেখিতেছি। আশ্চর্য, নিজের মাথা-ব্যথা দেখিয়া নিজেই অবাক হইয়া যাই। পরের জন্য ভাবা, পরের সেবা করিবার আগ্রহ আমার কোষ্ঠিতে লিখে নাই—কুসুম যেন আমাকে হঠাৎ নূতন ছাঁচে ঢালিয়া এক অদ্ভুত জারক রসে একটু একটু করিয়া পাকাইয়া লইয়াছে। এই নীচজাতির মেয়েটা যেন আমার উপর অকারণ উপদ্রব করিতে সুরু করিয়াছে। তাহার যতকিছু অভাব-অভিযোগ, যত কিছু তাহার ইহজগতের

দেনা-পাওনা যেন আমার উপর দিয়াই সব মিটাইতে চায়। আজ তৃতীয় দিন, কাল সকালে দেশে যাত্রা করিবার পালা, কিন্তু পুনরায় গোরুর গাড়ীর ধকল কুসুম কেমন করিয়া সহ্য করিবে? তাহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার কথা ভাবিয়া চারিদিক অন্ধকার দেখিলাম।

আমাদের কাজ আর কিছু বাকি নাই, পূজা-আর্চা, মানৎ, দান-পুণ্য সবই শেষ হইয়া গেছে। কুসুমের বুড়া বাপ মাদুলি পাইয়াছে, পাণ্ডার মোটা দক্ষিণা মিলিয়াছে—এবার রাত্রি প্রভাত হইলেই আমরা গাড়ীতে উঠিব। বিছানাপত্র বাদ দিয়া পুঁটলি-পোঁটলা বাঁধা হইতেছে।

সন্ধ্যার দিকে পাণ্ডাঠাকুর মোটা মোটা কয়েকখানা বই লইয়া হাজির হইল। যাইবার আগে 'কথা' শুনিতে হয়, তারপর 'সুফল' করিতে হইবে, তারপর ঠাকুরের প্রসাদ মিলিবে। শালগ্রাম সঙ্গেই ছিল, পাণ্ডাঠাকুর নামাবলী পাতিয়া আসর প্রস্তুত করিল। আমরা সবাই মিলিয়া তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া গেলাম।

তিন চারিটা হারিকেন-লণ্ঠন আমাদের সঙ্গে ছিল, সেগুলি জ্বালাইয়া মন্দিরের বহিঃচত্বরে সতরঞ্চি ও কম্বল পাতিয়া আসর বসিল। প্রধান শ্রোত্রী বড়বউ, তাঁহাকে ঘিরিয়া কয়েকজন গ্রহ-উপগ্রহ। একা বড়বউ 'নামের' রসাস্বাদন করিতে পারিলেই হইল, আর যদি কেহ বুঝিতে না পারে তবে সে চুপ করিয়া থাকিবে, উচ্চবাচ্য করিবে না। তিনি এমন করিয়া বসিলেন যেন এই মন্দির তাঁহার স্বামী রায়বাহাদুরের সম্পত্তি, আমরা সবাই তাঁহার অনুগত প্রজা, পাণ্ডাঠাকুর তাঁহার ক্রীতদাস। বাবা যজ্ঞেশ্বর জাগ্রত দেবতা, তিনি যদি প্রসন্ন হন তবে বড়বউয়েরই প্রতি হইবেন, পুণ্য বলিয়া যদি কোনো বস্তু থাকে তবে তাহা বড়বউই লাভ করিবেন, একথা আমরা সবাই জানি। দেবলোকের সকল রহস্য যেন বড়বউয়ের করতলগত, তাঁহার মুখের চেহারা যেন অনেকটা এমনই।

গোরুর গাড়ীর গাড়োয়ানেরা চত্বরের নীচে আসিয়া বসিয়াছে। তাহাদের একান্তে একটি হারিকেন্-লণ্ঠন মুখের কাছে রাখিয়া শ্রীমতী কুসুমসুন্দরী তাহার রোগজর্জর দেহ লইয়া মরিতে মরিতে আসিয়া বসিয়া পড়িয়াছে। বসিবার সাধ্য তাহার নাই, মাঝে মাঝে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে, তবু তাহার 'নামবন্দনা' শুনিয়া যাওয়া চাই। ছোটজাত, তাই পুণ্যের প্রতি তাহার এত লালসা, বোধ হয় ভাবিতেছে এজন্মে ফাঁকি দিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিয়া পরজন্মে সনাতন হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করিবে! পঞ্চুর মা তাহাকে দেখিয়া রাঙাদিদির গা টিপিয়া মুখে কাপড় দিয়া হাসিলেন। মাসিমা চুপি চুপি কহিল, ত্যাখ্ ভাই ত্যাখ্

মানদা, ছুঁড়ির চোখ যেন বন-বিড়ালের মতন জলছে। তবু ভালো যে ধর্মে মতি হয়েছে এতক্ষণে।

পঞ্চুর মা কহিল, ও বড়বউ, ভাগ্যি তুমি এসেছিলে মা, তোমার পয়সায় অনেক পাপী উদ্ধার হ'ল।

পাণ্ডা তখন বলিতেছিল, কবে কোন্ মুনি কি যেন অসাধ্য সাধন করিবার তপস্যায় এইখানে বসিয়াছিল, এমন সময় আকাশপথে যাইতেছিলেন ভোলা মহেশ্বর, মুনির তপস্যায় খুশী হইয়া তিনি আসিয়া দেখা দিলেন। মুনি বর প্রার্থনা করিয়া কহিল, ঠাকুর, আমি শাপ-ভ্রষ্ট দেবতা, তোমার পথ চাহিয়া ছিলাম, আমাকে উদ্ধার করো। পতিতপাবন মহেশ্বর তাহার প্রার্থনায় তুষ্ট হইয়া বর দিলেন। মুনি দিব্যদেহ ধারণ করিয়া স্বর্গের পথে চলিয়া গেল। সেই হইতে নিকটের ওই পুষ্করিণীর নাম হইয়াছে 'পতিতপাবন কুণ্ড।' ওখানে স্নান ও পূর্বপুরুষের পিণ্ডদান করিলে পাপক্ষালন হয়। এই মহাতীর্থে যে ভাগ্যবানের মৃত্যু ঘটে, সে গোলকধামে গিয়া মোক্ষলাভ করে।

বড়বউয়ের চক্ষে আনন্দাশ্রু ঝরিতেছিল, তাঁহার সঙ্গিনীরা আঁচলে চক্ষু মুছিতেছে। কুসুমের দিকে ফিরিয়া দেখিলাম, সে মাটিতে মাথা নোয়াইয়া প্রণাম করিতেছে; প্রণাম আর তাহার শেষ হয় না। দেখিয়া আমার রাগ হইল। বিকালবেলা তাহাকে মানা করিয়াছিলাম সে যেন নাড়াচড়া না করে, তবু সে কাঁথা মুড়ি দিয়া বাহিরের এই ঠাণ্ডায় দুই ঘণ্টা কাটাইতেছে। অবুঝ, অবাধ্য, অশিক্ষিত ছোটজাত, তাহাকে আস্কারা দিয়া অন্যায় করিয়াছি, আর তাহাকে আমি সাধ্য-সাধনা করিতে পারিব না। সে গোল্লায় যাক্।

সকলে 'সুফল' করিল, পাণ্ডার আশীর্বাদ লইল, প্রসাদ গ্রহণ করিল। বড়বউ অনেকগুলি টাকা পাণ্ডাকে প্রণামী দিলেন। একখানা মোটা খাতায় সকলের নাম, ঠিকানা ও বংশের তালিকা লেখা হইল। আমার কিন্তু তখন নজর ছিল কুসুমের দিকে। ইহাদের সকলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া যদি তাহাকে উঠিয়া গিয়া শুইয়া পড়িবার জন্য অনুরোধ করি তবে তাহা বিসদৃশ হইবে। তাহার প্রতি আমার দরদ বিন্দুমাত্র প্রকাশ হইয়া পড়িলে কানাকানি হাসাহাসির আর অন্ত থাকিবে না। তাহাতে আমার জ্বালা বাড়িবে, কুসুমের যন্ত্রণা বাড়িবে। মেয়েরাই মেয়েদের চরিত্রকে দূষিত বলিয়া প্রচার করিবার যত চেষ্টা করে, এমন পুরুষে করে না। ইহাদের নিজেদের ভিতর সহমর্মিতা নাই, সংসারে কোনো বড় কাজ তাই ইহারা করিতে পারে না।

চাহিয়া দেখিলাম, কুসুম কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। এখুনি হয়ত

সে টাল সামলাইতে না পারিয়া পড়িয়া যাইবে। ভাবিলাম তাড়াতাড়ি গিয়া তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলি। কিন্তু পারিলাম না, ইহাদের সকলের দিকে একবার চাহিয়া নিজেকে সংযত করিলাম। কুসুম অগ্রসর হইয়া চত্বরের উপর মাথা ঠেকাইয়া উপস্থিত সকলের উদ্দেশে প্রণাম করিল। আমাদের দেবতা যজ্ঞেশ্বর, কিন্তু কুসুমের দেবতা আমরা সকলে। আমাদের পায়ের কাছে পড়িয়া যদি তাহার এই মুহূর্তে হার্ট্-ফেল্ করে, তবে সে গোলকধামে গিয়া মোক্ষলাভ করিবে। বড়বউ এবং আর সকলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের গর্বসুখে গদগদ হইয়া হাসিমুখে কহিলেন, সুমতি হোক বাছা তোর, সুমতি হোক। ধর্মপথে থাকিস, পরের জন্মে বামুনের পায়ের ধুলো তোর জুটবে। ও আবার কি লা? টাকা বা'র করিস্ কেন?

কুসুম কম্পিতকণ্ঠে কহিল, পাণ্ডাঠাকুরের প্রণামী, বড়মা।

সকলের মুখের চেহারা তৎক্ষণাৎ কঠিন হইয়া উঠিল। রাঙাদিদি কহিল, ধন্যি মেয়ে তুই। কিছুতেই হার মানবিনে কেমন? এলি আমাদের ওপর টেক্কা দিতে, এই ত'? কিন্তু তোর টাকা পাণ্ডাঠাকুর নেবে কেন? কত আকাপনাই দেখালি কুস্মি।

বড়বউ কহিলেন, পুণ্যিতে আর কাজ নেই, ওই টাকায় বাপের ওষুধ কিনে দিস্। যা, পালা এখান থেকে।

টাকাটা মুঠার মধ্যে রাখিয়া কুসুম হারিকেন-লণ্ঠনটা হাতে লইয়া টলিতে টলিতে ফিরিয়া গেল।

শীতের ঠাণ্ডায় আর বসা চলে না, সকলে একে একে উঠিয়া যাইবার পর আমি গ্রামের দিকে হাঁটা দিলাম। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম গোরুর গাড়ীর ভিতরে কাঁথা মুড়ি দিয়ে কুসুম শুইয়া আছে। অকর্মণ্য বুড়ো বাপ তাহার কোনো সাহায্যেই লাগে নাই, কম্বল মুড়ি দিয়া গাড়ীর চাকার পাশে শুইয়া খক্ খক্ করিয়া কাশিতেছে। মাদুলি পাইয়া বুড়া বেশ চাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। আজ সকালে তাহাকে ভাত, ছানা আর বাদাম খাওয়াইয়াছি। কন্যার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া কন্যার পিতাকে ঘুষ দিয়া খুশী রাখিতেছি—বুড়া এই কথা ভাবিতেছে কিনা কে জানে! অভিজাত সমাজের লেখাপড়া জানা লোক হইলে এতক্ষণ আমার 'সাইকোলজি' ঘাঁটিয়া আমাকে কুকুর বানাইয়া ছাড়িত।

মাথার কাছে গিয়া ডাকিলাম, কুসুম?

তাহার গলার ভিতর দিয়া একরূপ অদ্ভুত শব্দ বাহির হইতেছে। সে সাড়া

দিল না। আবার ডাকিলাম, বলিলাম, কুসুমসুন্দরী, গরম দুধ এনেছি, দয়া করে খাবে কি ?

এইবার সে সাড়া দিল, কহিল, দুধ আমি খাবো না, ঠাকুরমশাই।

বিলক্ষণ ! খাবে বৈ কি, অনেক দূর থেকে এনেছি, লক্ষ্মী দিদি আমার, এটুকু খাও। তুমি কাঁদচো বুঝি ?

মেয়েটা বড় একগুঁয়ে, কথা কহিল না। আমি একবার পিছনের অন্ধকার রাত্রির দিকে তাকাইলাম ! তারপর পুনরায় কহিলাম, কুসুম, তোমার বয়স খারাপ, এখানে দাঁড়িয়ে বেশিক্ষণ সাধাসাধি করাটা ভালো দেখাবে না, উঠে খেয়ে নাও।

এইবার সে উঠিল। কহিল, আচ্ছা খাবো, তুমিও রেখে যাও। ঠাকুরমশাই, দাঁড়াও একটু, আর একটা কথা—বলিতে বলিতে অতি কষ্টে সে গাড়ী হইতে নামিল। তারপর একটা পুঁট্‌লি এলাইয়া একখানি বৃন্দাবনী সূতী শাল বাহির করিল। আমার পায়ের কাছে শালখানা রাখিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, অনেক করেছ তুমি, বড় সাধ এইখানা তোমাকে প্রণামী দেবো। আমার সঙ্গে আর কিছু নেই, থাক্‌লে—

হাসিয়া কহিলাম, আমার যে জাত নষ্ট হবে, কুসুম ?

তোমার জাত ? তুমি সব জাতের বাইরে, ঠাকুরমশাই।—বলিতে বলিতেই কিন্তু কুসুম কাঁদিয়া ফেলিল, অশ্রুপ্লাবিত চক্ষে লণ্ঠনের আলোয় মুখ তুলিয়া পুনরায় কহিল, ঠাকুরমশাই, তোমাদের হাতের অপমানেই আমি উদ্ধার হবো। নীচজাতের ঘরে জন্ম, তাই সকলের নীচে প'ড়ে আছি। কিন্তু···কিন্তু আর কোনো পাপ এজীবনে কখনো করিনি !

শালখানা মাথায় জড়াইয়া লইলাম। মনের ভিতরে একটু আবেগ জমিয়া উঠিয়াছে, পাছে তাহা এই বালিকার কাছে প্রকাশ হইয়া পড়ে এজন্য তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া চলিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু পা বাড়াতেই অন্ধকারে পাণ্ডাঠাকুর সাড়া দিয়া কহিল, বাবুমশাই, একটা কথা—

বলিলাম, কি বলো ?

ওই মেয়েটি আমাকে প্রণামী দিতে চেয়েছিল। ওদের সামনে নিতে পারিনি তখন···হেঁ···হেঁ···যতই হোক আমরা গরীব। টাকাটা কি আপনি চেয়ে দেবেন ?—দয়া ক'রে যদি—

কুসুম তৎক্ষণাৎ টলিতে টলিতে আসিয়া টাকা দিয়া তীর্থগুরুকে প্রণাম করিল। তিন দিন ধরিয়া দেখিলাম, এমন মানুষ নাই যাহার পায়ে কুসুম

মাথা লুটাইল না। সে যেন মানুষের পায়ের ধূলার চেয়েও অধম! পাণ্ডা আলগোছে তাহার হাতে একটু প্রসাদ দিল, কুসুম সেই প্রসাদ মাথায় তুলিয়া লইল।

দুইজনে ফিরিতেছি, দেখি অন্ধকারে আমার অলক্ষ্যে হাতের ঘটির জলে টাকাটা ধুইয়া লইয়া পাণ্ডা ট্যাঁকে গুঁজিয়া রাখিল। বেচারা বড় গরীব!

মাঠের উপরেই কম্বল চাপা দিয়া পড়িয়াছিলাম। সকালবেলা গাড়োয়ানদের কোলাহলে ঘুম ভাঙিল। তখন সবেমাত্র ভোর হইতেছে। অন্ধকারের সহিত শীতের কুয়াশা জড়াইয়া আছে। এই ভোরেই আমাদের যাত্রা করিতে হইবে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম।

কিন্তু গাড়োয়ানগণের কোলাহলের সহিত রাঙাদিদি, মাসিমা, মানদা ও বড়বউয়ের চীৎকারে আমি যেন উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিলাম। তাহাদের সহিত কুসুমের বুড়া বাপ তাহার বাত ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত দেহ লইয়া হাত পা ছুড়িতেছে; কানে আসিল, কুসুমকে পাওয়া যাইতেছে না। রাত্রে উঠিয়া কুসুম গা ঢাকা দিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। দুধের ঘটি তেমনই পড়িয়া আছে।

অবাক হইলাম। কুসুম কোথায় পলাইল? অত অসুখ লইয়া পলাইল কেমন করিয়া? তবে কি অসুখ তাহার মিথ্যা ছলনা? তবে কি স্ত্রীলোকের চরিত্র সৃষ্টিকর্তার অজ্ঞাত? ঘুমজড়ানো চোখে আমি যেন দিশাহারা হইয়া গেলাম।

কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যেই জানা গেল, কুসুম পলাইয়াছে বটে, তবে তাহার দেহটা খুঁজিয়া পাওয়া গিয়াছে; বেশি দূর সে আমাদের কল্পনাকে অগ্রসর হইতে দেয় নাই। সকলে গিয়া দেখিলাম, বাবা যজ্ঞেশ্বরের মূল মন্দিরের বন্ধ দরজার চৌকাঠে মাথা রাখিয়া শ্রীমতী কুসুমসুন্দরী ঘুমাইয়া আছে। ঠাকুরের চরণতলে যেন একটি শতদল ফুটিয়া রহিয়াছে। কুসুম পলাইয়াছে, সে ঘুম আর ভাঙিবে না!

মোক্ষলাভ হ'ল রে তোর, কুসমি!—একজন হঠাৎ বলিয়া উঠিল।

চমকিয়া চাহিলাম। কুসুমের দুইটি বিবর্ণ চক্ষু প্রভাতের শুকতারার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। আমিও সেইদিকে চাহিলাম, কোথায় মোক্ষ? কোথায় গোলকধাম? স্বর্গ কোন্ পথে? কোন্ পথ দিয়া কুসুম আমাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে নালিশ জানাইবার জন্য ছুটিল? কোন্ পতিতপাবন কোথা হইতে তাহাকে ডাকিল?

আমার মাথায় বৃন্দাবনী শালখানা জড়ানোই ছিল। ভাবিলাম, আমার দেওয়া দুধটুকুও সে গ্রহণ করে নাই, আমি তাহার শাল লইব কেন? তৎক্ষণাৎ সেখানা খুলিয়া কুসুমের দেহ ঢাকিয়া দিলাম। তারপর উহাদের দিকে চাহিয়া বলিলাম, আপনারা যাত্রা করুন, আমি ওর শেষের কাজ ক'রে বুড়ো বাপকে নিয়ে দেশে ফিরবো।

এতক্ষণ বড়বউ একটি কথাও বলেন নাই। নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া তাঁহার চোখ কুসুমের প্রতি নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন! নীচজাতীয়া মেয়েটা পুণ্য সঞ্চয় করিয়া বৈকুণ্ঠলোকের পথে যাত্রা করিয়াছে সন্দেহ নাই! বড়বউয়ের চোখ দুটা যেন প্রলুব্ধা হিংস্র বাঘিনীর মতো জ্বলিতেছিল; শৃগালী যেন ব্যাঘ্রীর শিকার লুণ্ঠন করিয়া পলাইয়াছে। কিন্তু আমার কথায় তাঁহার জ্ঞান ফিরিল, একটা অদ্ভুত বেদনা-ব্যাকুল আওয়াজ তাঁহার গলা দিয়া বাহির হইল। কহিলেন, যাক্, শেষ হয়ে গেছে!

মানদা কহিল, হ্যাঁ বড়বউ, ছুঁড়ি আমাদের ওপর খুব টেক্কা দিয়ে গেল!

পুতুল

গ্রামের মাঠ পেরিয়ে ট্রেনখানা দেখতে দেখতে অনেকদূর চ'লে গেল কেবল তার অস্পষ্ট আওয়াজটা চারিদিকের বিশাল মাঠের বুকে ধুক ধুক করতে লাগলো। তারপরে শুধু রইলো নিঃঝুম নিরালা গ্রামের পথ।

মলিনাদি বললেন, পূর্ণবাবু, নামলেন ত' মাঠের মাঝখানে, যাবো কোন্‌দিকে?

পূর্ণ বললে, একটু দাঁড়ান—স্টেশন মাষ্টারকে জিজ্ঞেস ক'রে নিতে হবে। আমি আসছি—।

বীণা চৌধুরী বললে, অমনি খোঁজ করবেন গোটা কয়েক ডাব যদি পাওয়া যায়।

আপনারা দাঁড়ান্, আমি আসছি এক্ষুনি।—ব'লে পূর্ণ সোৎসাহে খোঁজ-খবর নিতে গেল।

মেয়েরা এদিক ওদিক তাকিয়ে খুব বেশী উৎসাহিত বোধ করছে মনে হ'ল না। তা ছাড়া স্টেশনটা বড়ই ছোট—এবং এত যে সামান্য সেটা ওরা আগে কল্পনা করেনি। একা পূর্ণকে সম্বল ক'রে ওরা কত দূর কি ক'রে উঠতে পারবে সেটা ভাবনার কথা বৈকি।

একটু পরেই পূর্ণ ফিরে এলো। বললে, এনাৎপুরের ঘাট এখান থেকে প্রায় পাঁচ মাইল, সেখানে গিয়ে নৌকা ধরতে হবে!

মলিনাদি একটু চমকে উঠে বললেন, পাঁচ মাইল! যাবো কিসে?

পূর্ণ বললে, হাঁটাপথ আছে শুনলুম, কিন্তু দক্ষিণগাঁ দিয়ে নাকি ঘুরে যেতে হয়!

আভা বললে, আপনি বুঝি আগে এতটা জানতেন না?

পূর্ণ হেসে বললে, মেয়েরা সঙ্গে থাকলে চারিদিকেই অকূল, দেখছেন ত'?

বীণা বললে, ডাব পেলেন?

না,—ডাব কিম্বা চা কোনোটাই পাওয়া যায় না!

আভা ধমক দিয়ে বললে, অত বিবিয়ানা কেন শুনি? এক ঘটি জল গিললে তেষ্টা যায় না?

বীণা বললে, জল ? এখানকার ? যদি ম্যালেরিয়ায় ধরে ?

মলিনাদি বললেন, অত ম্যালেরিয়ার ভয় নিয়ে কংগ্রেসের কাজে নামা ঠিক হয়নি, বীণা।

আভা বললে, পূর্ণবাবু, আপনি ভোবালেন ! কোথায় এনাৎপুর, কোথায় বা কুমোরপাড়ার মেলা ! আসবার সময় বড়দা আমাকে ঠিকই বলেছিল ! যমের বাড়ির চেয়েও দুর্গম !

বীণা বললে, মাঠ ত' নয়, অগাধ জল !—এই ব'লে সে তার তৃষ্ণার্ত চোখ দুটো এদিক ওদিক প্রসারিত করতে লাগলো।

গ্রামের ফ্ল্যাগ্ স্টেশন। এখানে একটি বিশ্রামের জায়গা আজও তৈরি হয়নি—জলখাবার ইত্যাদি ত' দূরের কথা। স্টেশনের নীচে দিয়ে মানুষের আনাগোনার সামান্য একটি পথরেখা দূরে গ্রামের দিকে চ'লে গেছে। স্টেশন মাষ্টার নতুন লোক, তিনি এদেরকে নিজের বাসায় নিয়ে গিয়ে আতিথেয়তা করতে সাহস পান না, কেননা এরা কংগ্রেসের লোক। অনুগ্রহ করার মধ্যে কেবল তিনি ব'লে দিলেন, কতদূরে গেলে গোরুর গাড়ী পাওয়া যায়—এবং শ্রীমতী বীণার তৃষ্ণা নিবারণের জন্য দূরের গ্রাম থেকে আনা একঘটি টিউব-ওয়েলের জল ! তাঁর কর্তব্যবুদ্ধি ওর বেশী এগোতে সাহস করলো না। তিনি এসে মেয়েদের কাছে ক্ষমা চেয়ে গেলেন। ইংরেজ রাজত্ব এখনো রয়েছে, কি করবো বলুন !

গাড়ীতে রাত জেগে আসতে হয়েছে, সুতরাং যেমন করেই হোক এনাৎপুরে তাড়াতাড়ি গিয়ে পৌছতে হবে। স্টেশনের সীমানা পেরিয়ে এসে পূর্ণ অনেক পরিশ্রম এবং তদ্বির-তদারকের পর দু'খানা গোরু-মহিষের গাড়ী ভাড়া করতে পারলো। কুমোরপাড়ার মেলায় পৌছতে পারলে সেখানে সর্বপ্রকার সুবন্দোবস্ত আছে। মেলাটা বসেছে গ্রামে, প্রধানত মেয়েদেরই উৎসাহে। ওখান থেকে ছোট শহরে যেতে গেলে প্রায় সাত ক্রোশ নদী পেরিয়ে যেতে হয়। কিন্তু শহরে মেলা বসানো হয়নি। এই জেলার মেয়েরা,—যাদের মধ্যে দু'চারজন ওদের কলেজের সহপাঠিনী—তাদের বিশেষ আগ্রহ, দেশের প্রাণের ভিতরে গিয়ে কাজ করা। কর্মীদের কষ্ট অথবা হয়রানি এখানে বড় কথা নয় ; আসল কথা, গ্রামকে বাদ দিয়ে আজকের দিনে কল্যাণজনক কোনও কাজেই নামা চলবে না।

ফসলকাটা চৈত্রের মাঠের মাঝখান দিয়ে দু'খানা গাড়ী উঁচু নীচু পথ ধ'রে চলেছে। মাথার উপরে ছই ভাঙ্গা, গাড়ীর তোড়জোড় আল্‌গা। তাছাড়া চারটি জন্তুর সঙ্গে দুটি গাড়োয়ানের ভগ্ন ও ক্ষয়ক্ষীণ স্বাস্থ্যের এমনি সামঞ্জস্য ঘটেছে যে,

ওদের নিয়ে খুব বেশীদূর যাওয়া চলবে না। মলিনাদি তাঁর ব্যাগ থেকে কাগজ-পত্র বার ক'রে একটু আধটু দেখে নেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু অসমতল মাঠের ওলোট পালটের হাত থেকে ক্ষণে ক্ষণে আত্মরক্ষার চেষ্টাতেই তাঁর সময়টা কাটতে লাগলো। তাঁরা কলকাতার মেয়ে—গ্রাম এবং গোরুর গাড়ী কোনোটাতেই অভ্যস্ত নন। কিন্তু তবু তাঁদের যেতে হবে, কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের নির্দেশ। কুটীর-শিল্প প্রদর্শনীতে গিয়ে তাঁরা কয়েকদিন ধরে গ্রামবাসীদের কাছে বক্তৃতা করবেন। এ বিষয়ে তাঁরা গবেষণা করেছেন এবং শিক্ষাবিভাগের হাতে তাঁরা পুরস্কৃতও হয়েছেন। তাঁরা অযোগ্যা নন।

মাথার উপর চৈত্রের খররৌদ্র। কোনদিকে জলাশয়ের কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মেয়েরা সহজে ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা প্রকাশ করতে চায় না, কিন্তু গন্তব্যস্থানে গিয়ে পৌছবার অতিশয় ঔৎসুক্য লক্ষ্য ক'রে পূর্ণ সেকথা বুঝতে পারছিল। সামনের গাড়ীখানায় ছিল বীণা আর আভা, তাদের কলরব অনেক আগেই থেমে গেছে; এবং মাঝে মাঝে দু'জনের অনুশোচনার ছিটেফোঁটা ওগাড়ী থেকে ছিট্‌কে এ-গাড়ীতে মলিনা ও পূর্ণর কানে এসে বিঁধছিল।

প্রায় ক্রোশ দুই পার হবার পর একটি ছোকরাকে পাওয়া গেল। পূর্ণ গলা বাড়িয়ে প্রশ্ন করলো, ওহে—শোনো, শোনো।

বছর বারো বয়সের একটি কঙ্কালসার বালক ভীরু চক্ষু নিয়ে গোরুর গাড়ীর কাছাকাছি এসে দাঁড়াল। পূর্ণ জিজ্ঞাসা করলো, এনাৎপুর আর কতখানি পথ হে?

ছোকরা আঙুল দিয়ে দেখালো, উই যে। আমাদের বাড়ী সেখানে।

মলিনাদি প্রশ্ন করলেন, ওখানে খাবার-দাবার কিছু পাওয়া যায়?

ছোকরা বললে, আপনারা কি চান?

মুড়ি, চিঁড়ে, মুড়কি···দুধ···

না, দুধ নেই। চিঁড়ে মুড়ি পাবেন।

বাজার আছে সেখানে?

ছোকরা জানালো, শনি-মঙ্গল ওখানে হাটের লোকেরা আসে। আজ বিষ্যুদবার!

মেয়েরা মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগলো। অর্থাৎ শুকনো চিঁড়ে মুড়কি ছাড়া আজকে আর কোনো আশা নেই। আভা বললে, আচ্ছা, এনাৎপুর থেকে কুমোরপাড়া কদ্দুর ভাই?

ভাই সম্ভাষণটি শুনে ছোকরা একটু যেন জড়োসড়ো হয়েই বললে, নৌকোয় গেলে কোশ তিনেক।

কখন পৌছবে ?

আন্দাজ ক'রে ছোকরা বললে, মেলায় যাবেন বুঝি ?

সকলে সোৎসাহে বললে, হাঁ হাঁ···তুমি জানো দেখছি।

আমি যে ওখানে পুতুল নিয়ে যাই বেচতে !

কৌতূহলের অপর নাম নারী ! সুতরাং ছেলেটা নানাবিধ প্রশ্নে বিপর্যস্ত হতে লাগলো। ছোকরার নাম ফকির। ঘরে তার এক দাদাভাই আছে,—সে নাকি পুতুল গড়ে। আজকাল রং পাওয়া বড় কঠিন। দাদাভাইর শরীর অসুখ, তবু তার তৈরী পুতুল নিয়ে ওই ছেলেটা কুমোরপাড়ার মেলায় দিয়ে আসে।

ফকির চলতে লাগলো দু'খানা গাড়ীর মাঝখান ধরে। সবাই মিলে তারা যখন এনাৎপুরে এসে পৌছলো, বেলা তখন তিনটের কম নয়।

বাঁশবাগানের এক মস্ত ঝোপ। গাড়ী দু'খানা সেখানে একপাশে এসে দাঁড়ালো। কলকাতার লোক এবং জেলার মেয়েপুরুষ আজকাল ওই মেলার জন্য এই পথ দিয়ে প্রায়ই যাতায়াত করছে, সুতরাং নবাগতাদের দেখে ইতিমধ্যেই ওই ছোট্ট গ্রামটিতে সাড়া পড়েছিল। সুসজ্জিত, সুশ্রী ও স্বাস্থ্যবতী মেয়েরা এই অজ্ঞাত অন্ধকার গ্রামের পক্ষে মস্ত বড় আকর্ষণ বৈ কি। বিশেষ ক'রে বালক-বালিকারা তাদের জীবনে এই প্রথম বিস্ময় উপভোগ ক'রে নিচ্ছে।

রৌদ্রের তাপে ওদের সকলের মুখ হয়ে উঠেছিল টকটকে, এতক্ষণে বাঁশ-বাগানের ছায়াতে এসে ওরা বাঁচলো। খদ্দরের শাড়ী ইত্যাদি পরিশ্রান্ত শরীরের পক্ষে অত্যন্ত গুরুভার, কিন্তু উপায় নেই,—গ্রামের দৈন্য-দারিদ্র্যের মাঝখানে তাঁদের সৌখীন সজ্জা সত্যই বেমানান, একথা ওরা বোঝে। ওদের উন্নাসিক সংস্কার কিছু নেই,—ওরা ইতিমধ্যে শিশুর দলকে কাছে টেনে নিয়েছে। ওদের ঝুড়ির মধ্যে ছিল খেলনা, বাঁশী, টিনের গাড়ী, চকোলেট, কাপড়ের টুকরো, সেগুলো ওরা ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিলিয়ে দিল। ওরা বেশ সহজে ব'সে গেছে ছায়ার নীচে ঘাসের ওপর,—জমিয়ে গল্প ফেঁদেছে সবাইকে নিয়ে।

এমন সময় ফকিরকে নিয়ে পূর্ণ এসে দাঁড়ালো। বললে, চলুন মলিনাদি—এই তোমরাও এসো—

কোথায় ?

ফকিরদের ঘরে জায়গা পাওয়া গেছে। ছেলেটা বেশ ভালো। ওদের ওখানে হাত-পা ধুয়ে একটু বিশ্রাম নেওয়া যাক্।

ফকিরদের ঘরে এসে ওরা উঠলো বটে, কিন্তু একটি অভাবনীয় নূতন সমস্যা দেখা দিল। ওরা লক্ষ্য করেনি, ঈশান কোণে কালো মেঘ মাথা তুলে উঠেছে। বাঁশবনে ইতিমধ্যেই ঝড়ের নিঃশ্বাস লাগতে আরম্ভ করেছে।

মলিনাদি চিন্তিত হয়ে বললেন, পূর্ণবাবু, ওদিকে দেখছেন? নৌকায় উঠতে সাহস হবে?

আভা ও বীণার মুখে আর কোনো কথা ফুটলো না।

চালাঘর বলতে গেলে একখানাই। আরেকটিতে সম্ভবত গোরুবাছুরের বাস ছিল, সেটি এখন প্রায় জন্তুরও অগম্য। এদিক ওদিক পা বাড়াবার উপায় নেই, সমস্তটাই জঙ্গলে সমাকীর্ণ। পাশেই একটা ডোবা—সেই ডোবাটাও একটা বকুল গাছের ঝাপড়ায় ছায়াচ্ছন্ন। চালার আব্রু অথবা আগল কোনটাই নেই। ভিতরে এমন কোনো সামগ্রী দেখা যাচ্ছে না যাতে মনে হয়, একটা ঘরকন্না কোথাও কিছু আছে। এমন একটা শূন্য দারিদ্র্যের মাঝখানে মানুষের বাস কেমন ক'রে যে দাঁড়িয়ে থাকে, সেটা হয়ত দেশের সেবায় না নামলে আর সকলের মনে অবিশ্বাস্য ব'লেই থেকে যেতো। সুতরাং যেখানে অখণ্ড নৈরাশ্যে দম আটকে আসার কথা, সেখানে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে মলিনাদি ভারাক্রান্ত নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

দূরের গ্রাম থেকে ফকির তার কোঁচড়ে চাউল কিনে নিয়ে ফিরছিল—এতক্ষণে জানা গেল। পশ্চিম দিকের গোরুর ঘর থেকে এক বৃদ্ধ গলা বাড়িয়ে ডাকলো, দাদুরে, চাল আন্‌লি?

মেয়েরা সবাই মিলে বুড়োর ঘরে গিয়ে দাঁড়ালো। সামনে মাটির ডাল, এক হাঁড়ি জল এবং ছোট খাট দু'একটি সরঞ্জাম। বুড়ো শুয়ে রয়েছে একখানা ময়লা কাঁথার উপর। চোয়ালের হাড় এবং পাঁজরের কয়েকখানা গোণাগুণ্‌তি অস্থি ছাড়া তার শরীরের কোথাও মাংস নেই বললেই হয়। মেয়েদের দেখে লোকটা একটু উৎসাহ প্রকাশ করতে গিয়ে ভয়ানক কাশি আরম্ভ ক'রে দিল।

মলিনাদি ব্যস্তভাবে বললেন, থাক্ থাক্, তুমি উঠতে যেয়ো না কর্তামশাই, আমরা বসছি।

বুড়ো বললে, সাতমাস জ্বর ছাড়ে না, কাশির ব্যামো। গাঁয়ে ত' ওষুধ নাই, মা।

মেয়েরা সবাই চুপ। বুড়ো বললে, ডোবায় জল থাকতে জ্বর আর যাবে না গাঁ থেকে। ঢেঁকিগুলো সব বন্ধ হয়ে আছে। ঘর্-ঘর্ আমাশা।

কথা কইতে কইতে বাইরে মেঘের গুরু গুরু ধ্বনি শোনা গেল। মেয়েরা

আড়ষ্ট হয়ে উঠলো। এখানে নানাবিধ অসুবিধা—এই জঙ্গলের মাঝখানে আটকে গিয়ে ব'সে থাকলে তাদের চলবে না। মেলায় গিয়ে তাদের কাজে নামতে হবে, কাগজপত্র গোছাতে হবে—এবং কলকাতায় অবিলম্বে একটি রিপোর্ট পাঠানোও দরকার।

বুড়ো তার নিজের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে বীণার দিকে তাকিয়েছিল একাগ্র ভাবে। বীণা এক সময় হেসে বললে, কী দেখছ কর্তামশাই?

বুড়ো বললে, তোমার চুলের গোছাটা কপালের ওপর তুলে দাও ত' মা!

কেন?

জরাব্যাধিগ্রস্ত অশীতিপর বুড়ো রুগ্ন মুখে এক প্রকার হাসি হাসলো। তা'র চোখের দৃষ্টিতে ছিল কেমন যেন নিগূঢ় অভিনিবেশ, অপলক এক প্রকার নিবিড়তা। মেয়েরা ঔৎসুক্যের সঙ্গে আরো কিছু প্রশ্ন করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল, কিন্তু সেই নাটকীয় মুহূর্তে বাইরে পূর্ণর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

মলিনাদির সঙ্গে আভা এবং তার পিছনে বীণাও বেরিয়ে এলো। পূর্ণ এনে হাজির করেছে কিছু চাল-ডাল, সব্জী এবং কিছু কাঠ। ফকির সেগুলি নামালো। পূর্ণ বললে, ভাতে ভাত ফুটিয়ে খাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

আভা বললে, নৌকা ছাড়বে কখন, পূর্ণবাবু?

পূর্ণ বললে, নৌকা যাবে না. আকাশের চেহারা খারাপ। তাছাড়া এখন বেরোলেও পৌছতে রাত দুটো। আমার সাহস নেই।

ফকির বললে, আপনাদের কিছু কষ্ট হবে না, আমি জল এনে দিচ্ছি নদী থেকে।

পূর্ণ বললে, তোকে আর জ্বর নিয়ে জল আনতে হবে না। আমি যাচ্ছি।

ফকির সহাস্যে বললে, জ্বর! জ্বর ত' সেই বর্ষা থেকে! ওতে আমার কিছু হয় না কর্তা।

বালকের চোখ দুটিতে কেমন যেন নিরুপায় কারুণ্য মাখানো—বড় মায়াময়। তার দিকে একবার তাকিয়ে বীণা বললে, নদীর ঘাট আমাদের দেখিয়ে দে, আমরাই জল আনছি।

অগত্যা মেয়েরা অবস্থার সঙ্গে ব্যবস্থা মানিয়ে নেবার চেষ্টায় লেগে গেল।

বীণা এক সময় চালায় ঢুকে বললে, কি হচ্ছে কর্তামশাই। এত অসুখে উঠে বসলে যে?

এই যে মা—বুড়ো বললে, দেখো দেখি, এটি চিনতে পারো?

পুতুল গড়েছ দেখছি। বেশ সুন্দর হয়েছে! ব'লে বীণা এসে সামনে বসলো। কিন্তু পুতুলটিকে পরীক্ষা করতে গিয়েই সে সোৎসাহে বললে, একি এযে আমার মূর্তি!

বুড়োর হাত কাঁপছে বার্ধক্যে। তবু হাসিমুখে সেই পুতুলের নাকটি একটু নেড়ে বললে, হাঁ্যা, এইবার আদল আসে। ওদের গুলোও হয়ে গেছে মা।

বীণা অবাক হয়ে তাকালো। ইতিমধ্যে আভা ও মলিনাদির মূর্তিগুলিও বুড়ো শেষ ক'রে ফেলেছে। চোখের কোণ, ভ্রূরেখা, চিবুকের খোন্দল, কণ্ঠের পেলবতা, অধরে বিলীয়মান হাসির আভাস—সেটি পর্যন্ত। খোঁপার একটি পাশ,—তাও এসেছে সুন্দর হয়ে। আকাশে মেঘের ডাক শুনে আভা তার আয়ত চোখ তুলে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল—সেই অপরূপ কপালকুঞ্চনটি অবধি বুড়ো জীবন্ত ক'রে তুলেছে। এই বুকচাপা গ্রামের দুঃখ-দারিদ্র্যময় জীবনযাত্রার প্রতি মলিনাদির করুণ সমবেদনাময় দৃষ্টি বুড়োর চোখ এড়ায়নি।

বৃষ্টি এসে পড়েছিল ঘরখানায়—এরই মধ্যে চাপা অন্ধকার দেখা যাচ্ছে। এমন সময় আভা একটি মোমবাতি জেলে এনে ঢুকলো। তারপর ওরা একে একে সবাই এসে জড়ো হ'ল। বৃদ্ধ শিল্পীর প্রতিভায় ওরা সকলেই মুগ্ধ—অনাদৃত এই ভাস্করের নিখুঁৎ রচনায় সকলে বিস্ময়াবিষ্ট। বুড়ো বললে, কিছু শক্ত নয় মা, এ সবাই পারে—চেষ্টা করলেই পারে। হাতের কাজ বৈ ত' নয়।

পূর্ণ বললে, পুতুল গড়া হয়ত সহজ, কিন্তু ওর মধ্যে প্রাণ এনে দেওয়া কি যার তার কাজ?

প্রাণ!—বুড়ো পূর্ণর দিকে তাকালো। জরাচ্ছন্ন তার চোখে আশ্চর্য কৌতূহল, অসীম জিজ্ঞাসা। বললে, প্রাণ কোথায় দাদাবাবু?

কেন, এই যে তুমি গড়েছ, এ একেবারে জীবন্ত।

বৃদ্ধের বোধহয় জানা ছিল না, তার হাতের গড়া পুতুলে কোথায় থাকে প্রাণ, অথবা জীবন। তিন পুরুষ ধ'রে পুতুল গড়ে, কিন্তু এমন কথা কারুকে বলতে সে শোনেনি। এরা শহরের লোক, তাই বোধহয় দুর্বোধ্য ভাষায় কথা কয়। বুড়ো একটু অবাক হয়েই তাকায়।

বাইরে ঝমঝম ক'রে বৃষ্টি পড়ছিল। ফকির গুটি গুটি এসে একপাশে বসে। ছোকরার জ্বর, ওদের জানা ছিল। সুতরাং এক সময় আভা উঠে তাদেরই আনা বিছানাটা পাতে। তারপর বলে, ফকির এই বিছানায় এসো ভাই। কর্তামশাই, তুমি খাবে কি? তোমরা দু'জনে অসুখ বিসুখ সারিয়ে তোলো দেখি।

অত্যন্ত ঘরোয়া কথা, অত্যন্ত অযাচিত আত্মীয়তা। বুড়ো এই অভিজাত রুণ-তরুণীর মাঝখানে প'ড়ে কেমন যেন থতিয়ে যায়। ফকির ওদের হুকুম মান্য করে না। আস্তে আস্তে বিছানায় গিয়ে ওঠে। বীণা বুড়োর শিল্পকলায় তই উৎসাহিত হ'য়ে উঠেছিল যে, বৃষ্টির মধ্যে নিজে গিয়ে সে ঠাকুর্দা ও নাতির াহারের আয়োজন ক'রে আনে। বুড়ো কেবল একসময় মৃদু গলায় বললে, ঠোনে গোটা দুই তিন সাপ চ'রে বেড়ায় মা, একটু সাবধানে—

ওরা ভ্রূক্ষেপ করলো না।

একটি রাত্রির বাসস্থান। কিন্তু সভ্যতা থেকে অনেক দূরে, জগৎ-জোড়া বন-স্পন্দনের বাইরে। অরণ্য বললে ভুল বলা হবে—কেননা অরণ্যের নিবিড় পস্যার মহিমা ও সৌন্দর্য এখানে নেই। সোনার বাঙ্গলার একটি ক্ষুদ্র গ্রাম বির মতন—তাও সত্য নয়। কারণ শ্রী কোথাও নেই, কোথাও নেই শোভা, বনের সঙ্কেত কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। একটা বিবর্জিত জঙ্গল-জটলার ঝখানে যদি কয়েকজন শ্মশানচারীকে কল্পনা করা যায়—তবে এই এনাৎপুরকে তে পারা যাবে। সন্ধ্যার পর সমস্তটা মৃত্যুর মতো অসাড়,—ব্যাঙের ডাকে, াবায়, মশায়, পতঙ্গে, পোকায় এবং রুদ্ধশ্বাস অন্ধকারে এমন একটা অবস্থা ড়ালো যে, অভ্যাগতদের মনের চেহারাও নিস্তেজ হয়ে এলো।

আহারাদি এবং আনুসঙ্গিক কাজকর্ম শেষ ক'রে ওরা আবার এসে বুড়োর ছে বসলো। বুড়ো বললে, তোমরা এই পথ দিয়েই বুঝি ফিরবে, মা?

মলিনাদি বললেন, বুঝেছি আর একটা পথ আছে। তবে আমাদের ইচ্ছে, ই পথ দিয়েই ফিরি,—তোমাদের আর একবার দেখে যেতে পারবো। কেমন, ই ভালো না?

বুড়ো বিশ্বাস করতে পারে না। বলে, আমাদের গরীবের ঘর মা—তোমাদের হবে!

বীণা বলে, ওকথা বলতে নেই কর্তামশাই, দেশসুদ্ধ গরীব! মলিনাদি লে, আচ্ছা ধরো, আমরা যদি এই গ্রামে এসে কিছু কাজ করি?

বুড়ো বলে, কাজ? কি কাজ মা?

এই গাঁয়েরই কাজ। তোমরা রোগে ভুগছ, ভাত-কাপড় পাচ্ছ না, জলের াব, পথঘাট নেই, হাট-বাজার বসে না—

বুড়ো অবাক হ'য়ে তাকায়। ওদিকে ফকির চুপি চুপি বিছানার ওপর উঠে । এদের কথাবার্তায় কি যেন একটা অনুপ্রেরণা সে খুঁজে পায়। কিন্তু ক'রে সে কিছু বুঝতে পারে না।

মলিনাদি বললেন, আচ্ছা, আমি বুঝিয়ে বলছি। ধরো, তোমাদের এই গ্রামে একটা জায়গা নিয়ে আমরা কয়জন বসলুম, এখানেই কাজের লোকের দল গ'ড়ে তুলবো। সুতো কাটবে, তাঁত বসাবে,—অবিশ্যি প্রথম খরচপত্র আমরাই চালাবো!

পূর্ণ বললে, ধরো, তুমি পুতুল গড়তে পারো,—তোমার মতন লোককে দিয়ে যদি পুতুল গড়িয়ে চালান দেওয়া যায়, তাতে টাকা পয়সা পাবে! তুমি নিজে চালাবে কারখানা।

বুড়োর চোখ দুটো জ্ব'লে ওঠে। কিন্তু সে চুপ ক'রে থাকে। একটা অপ্রত্যাশিত সুযোগ এসেছে তার জীবনে,—অথচ এরা কে, এরা কারা, কেন এই অযাচিত মমত্ববোধ, কেন বা এই কুহক, এই মোহজাল—বুড়োর রুগ্ন মস্তিষ্ক এসব যেন বরদাস্ত করতে পারছে না। ফ্যাল ফ্যাল ক'রে সে তাকিয়ে থাকে। কাশি আসে তার গলার ভিতরে, হৃৎপিণ্ডটা স্থানচ্যুত হয়ে যেন উঠে আসতে চায়। এই গাঁয়ের চেহারা ফিরবে। বুড়ো কারখানার মালিক হবে, তার নাতির আর কোনো ভাবনা থাকবে না। তার এই ফুটো চালায় ছয় বছর খড় ছাওয়া হয়নি, নতুন কাপড় কিনতে পারেনি আজ তিন বছর, গোটা চারেক গোরু ফকিরের একটা বউ, রূপোর গয়না, শীতকালের বিছানা—বুড়ো তার এই ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে আনন্দে থর থর ক'রে কাঁপতে লাগলো।

তার গলায় ভয়ানক কাশি উঠে এলো এক সময়, এবং সে এমন ক'রে কাশতে লাগলো, যেন তার পাঁজরের হাড়গুলি বেশিক্ষণ সে-ধাক্কা আর সহ্য করতে পারবে না। ফকির তাড়াতাড়ি উঠে এসে বুড়োকে দুই হাতে জাপটে ধরলো।

পূর্ণর পাশে ব'সে মেয়েরা কাঠ হয়ে বুড়োর এই যন্ত্রণা দেখতে লাগলো। রোগ আর দারিদ্র্যের এই দৃশ্য নতুন নয়। ওরা কংগ্রেসের লোক। দেশের রুগ্ন উৎপীড়িত দরিদ্র মানবাত্মার সঙ্গে ওদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ,—ওরা আজ কঠিন হাতে দেশের এই অকল্যাণকে দূর করবার জন্যে দাঁড়িয়ে উঠেছে। ওরা কাজ করবে, সেবা করবে,—দেশের প্রাণের ঠাকুরের চোখের জল কত যে গড়িয়েছে সে ওরা জানে।

মলিনাদি যখন উঠে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন।

তিনি বললেন, কর্তামশাই, তুমি আশীর্বাদ করো, আমরা যেন এই তোমাদের কাজে লাগতে পারি,—জীবনের এত অপচয় যেন বন্ধ করতে পারি।

কী বলে মেয়েটি! এ কোন্ ভাষা! কোন্ দেবতার আশীর্বাদ! বুড়ো স্তব্ধ দৃষ্টিতে ওদের দিকে তাকিয়ে কাশির ধকলে হাঁপাতে থাকে। তার শরীরে আগের মতো ক্ষমতা থাকলে ছেলেমেয়েগুলিকে কোলে নিয়ে সে কাঁদতে পারতো।

মলিনাদি, আভা ও বীণা ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। পাশের ওই চালাটায় কোনমতে রাত কাটিয়ে কাল ভোরে ওদের নৌকায় উঠতে হবে, কুমোরপাড়ার মেলায় পৌঁছুতে ওদের এত দেরী হবে, ওরা আগে ভাবেনি। সেখানে ওদের অনেক কাজ। মান্যগণ্য নেতারা আসছেন, —সংবাদদাতারা ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছেন। কিন্তু সেই একজিবিশন ভাঙলে এই এনাৎপুরের পথ দিয়েই ওরা ফিরবে, অন্যপথে যাবে না। এই গ্রামে ফিরে বুড়োর একটা ব্যবস্থা করা চাই। যেমন ক'রে হোক, বুড়োর এই অসাধারণ শিল্পকৃতিত্বকে দেশের সামনে ওরা তুলে ধরবে, ছোট খাটো একটি কারখানা গ'ড়ে দেবে, এদের এই মরণোন্মুখ জীবন-যাত্রার কিছু প্রতিকার করবে। এই ওদের প্রতিশ্রুতি।

বিছানাগুলি ওরা ইতিমধ্যেই দান করেছে, ওদের তাতে কোনো কুণ্ঠা নেই। এদিককার চালায় ঢুকে কোনমতে নিজেদের জন্য একটা ব্যবস্থা করে নিয়ে ওরা একটু গড়াবে, এমন সময় দেখা গেল, ফকির গুটি গুটি এসে একপাশে দাঁড়িয়েছে। সে যেন কিছু বলবে।

পূর্ণ এগিয়ে গিয়ে বললো, কিরে ফকির?

ফকির মিনতি ক'রে জানালো, তাকে একটা জামা দিতে হবে।

আভা বললে, জামা? জামা জুতো সব পাবি, ফকির! এই নে, এইটে গায়ে দিগে যা ততক্ষণ!

আভা তার গায়ের চাদরটি এনে ফকিরের গায়ে জড়িয়ে দিয়ে সাদরে তা'র চিবুক নেড়ে দিল।

মলিনাদি বললেন, কাল সকালেই আমরা চ'লে যাবো ভাই। কিন্তু ক'দিন বাদেই আবার আসবো, এই পথ দিয়েই আসবো। এই টাকা ক'টা তুই রেখে দে, ক'দিনের খরচ চালাস, কেমন?

ফকির ভীরু কণ্ঠে বললে, আবার আসবে তোমরা?

নিশ্চয় আসবো, —পুতুল ক'টা কিনে নিয়ে যাবো। আর দেখিস, কত কাজ দেবো তোদের। ঠিক আসবো ব'লে গেলুম।

দশটা টাকা নিয়ে ফকির অন্ধকারে ওদিককার চালার দিকে চ'লে গেল। বীণা বললে, কী চমৎকার ছেলেটা! আমি ফেরবার সময় ওকে সঙ্গে নিয়ে যাবো ক'দিনের জন্য।

পূর্ণ বললে, বুড়োর যে অবস্থা, বাঁচলে হয়।

এঘরে এসে ফকির বুড়োর গা ঘেঁসে ব'সে পড়লো। বুড়ো বললে, কিরে দাদু?

আমাকে জামা দেবে বলেছে। তোমার পুতুল কিনবে। এই নাও টাকা!

বুড়ো বললে, এত দিলে?

ফকির বললে, ওরা আবার আসবে,—এই পথ দিয়েই যাবে!

সত্যি বলছিস, আসবে?

হ্যাঁ, আবার আসবে। একি, তোমার জ্বর বেড়েছে যে? এত জ্বর!

হবে না? বুড়ো শুয়ে বসেই যেন উদ্দাম চঞ্চল হয়ে উঠলো। বললে, বাড়বে না জ্বর? কি একটা হয়ে গেল বল্ দিকি? আমি—আমি বলতে পাচ্ছিনে···কি যেন·· কি যেন হয়ে গেল একটা।

আনন্দের প্রবল উত্তেজনাটা বুড়ো ওইভাবেই প্রকাশ করতে গেল। কিন্তু শরীরে শক্তি কম,—উত্তেজনা সইতে না পেরে বুড়ো আবার শুয়ে পড়লো। ভয়ানক জ্বরে সে হাঁসফাঁস করছিল।

ফকির শুয়ে পড়েছিল, কিন্তু ঘণ্টা দুই বাদে তার চমকটা ভাঙতেই সে চোখ চেয়ে দেখলো, দাদাভাই সেই চারটি পুতুলকে একাগ্র মনোযোগের সঙ্গে নিখুঁত ক'রে তুলছে। রুগ্ন শরীর ভেঙে পড়েছে, ঘাড় উঁচু থাকছে না, শ্রান্ত আঙুল চলতে চাইছে না, কোমরে এতটুকু জোর নেই,—কিন্তু তবু সেই জরাব্যাধিগ্রস্ত উপবাসী বৃদ্ধ স্থবির তার সেই কারুসৃষ্টির লোভ ছাড়তে পারেনি। অতি যত্নে অতি সূক্ষ্ম কাজটুকু আজ রাত্রেই তার শেষ করা চাই!

ফকিরের তন্দ্রাতুর চোখ আবার ধীরে ধীরে বুজে এলো। ওদিকে মোম বাতিটুকুও এতক্ষণে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

এনাৎপুরের সবাই জেনেছে, এ গ্রামে কাজ আরম্ভ হবে। কত কাজ, কত ব্যবস্থা, কত প্রতিষ্ঠান। ফকির সব জায়গায় ব'লে বেড়িয়েছে। ওই বাঁশ বাগানের ধারে বসবে কারখানা, গাজনতলায় তাঁতের ঘর, শিবমন্দিরের ধারে ওষুধের দোকান। নৌকায় মাল আসবে শহর থেকে, কত কাপড় আর থান, টিনের খেল্‌না। হাটতলার রাস্তাটা পাকা হবে, মোটর গাড়ী চলবে। তাদের টিনের ঘর উঠবে, গোরুর দুধ হবে, তার গায়ে জামা, পায়ে জুতো, তাদের আর কোনো ভাবনা থাকবে না।

ফকির নিজের হাতে তাদের জঙ্গল কেটেছে, ডোবা থেকে পানা তুলেছে, ঘরদোর সে গুছিয়ে রেখেছে—ওরা আসবে। তার দাদাভাই আর উঠতে পারেনি, প'ড়ে রয়েছে বেহুঁস হয়ে,—জ্বর বেড়েছে ক'দিন। ফকির কি একটা গোলমাল শুনে ঘাটের দিকে ছুটে যায়। ওরা এবার আসবে, এই ওদের পথ। কুমোরপাড়ার মেলা কয়েকদিন আগে ভেঙ্গে গেছে,—লোকেরা ফিরে যাচ্ছে এই পথ দিয়ে। কত সামগ্রী কিনেছে কত লোক, কত লোক পয়সা কামিয়েছে, কত লোকের অবস্থা ফিরে গেছে।

না, আজকেও ওরা এলো না। বেলা শেষ হয়ে গেল, নদীর দূরের পথ ধূসর গোধূলিতে ভ'রে গেল,—ওদের নৌকা দেখা গেল না। সাত দিনের মধ্যে ওরা ফিরবে ব'লে গেছে, কিন্তু একমাসের বেশী হয়ে গেছে। হয়ত দরিদ্র ফকিরের কথা ওদের মনে নেই। ফকিরের কান্না পায়।

আরেকদিন একখানা মহাজনী নৌকা দেখা যায়। ওই মস্ত নৌকায় ওরা আসছে কি? হ্যাঁ, ওই নৌকাই। অত ঐশ্বর্য আসবে বলেই এত দিন দেরী। ধনধান্যে ভরা, ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ, সম্পদের ভারে টলোমলো—তাই অত বড় নৌকা! ওরা আসবে, হঠাৎ আসবে, অপার্থিব বিস্ময়ের মতো এসে পৌছবে ওরা—ভাগ্যলক্ষ্মীর আকস্মিক আশীর্বাদের মতো আবির্ভূত হবে ওরা,—তাই ত' এত দেরী, এমন অধীর অসহ্য প্রতীক্ষা!

কিন্তু মহাজনী নৌকা গান গেয়ে চ'লে যায়। আসে বৃষ্টি আকাশ ভেঙ্গে। ফকির ঘাটের মহুয়া গাছের তলায় ব'সে থাকে। আজো তার জ্বর বেড়েছে। শীতে সে কাঁপতে থাকে।

বীণাদি ব'লে গেছে, ফকির, তুই পরের সেবা করবি, গাঁয়ের কাজ করবি, সকলের মুখে অন্ন দিবি। বীণাদির সেই আদেশ সে বর্ণে বর্ণে পালন করেছে। বিছানাটা দিয়ে এসেছে সে গরীব হাঁহু মিঞার বউকে; চাদরখানা বিলিয়ে দিয়ে এসেছে গাজনতলায়। ঘরের চাল-ডালগুলি নিয়ে সে ভিক্ষা দিয়েছে; নগদ টাকাগুলি দিয়েছে খাজনা শোধে। তারা এখন রিক্ত, সম্পূর্ণ নিঃস্ব। কিন্তু ওরা এসে দাঁড়ালে ফকিরদের ঘর কানায় কানায় ছাপিয়ে উঠবে বলেই আজ এমন নিঃস্ব হবার দরকার হয়েছে। সর্বস্বান্ত হতে পেরেছে পরের জন্য, তাই ফকিরের আজ এত আনন্দ!

বেহুঁস জ্বর নিয়ে ফকির বৃষ্টিতে ভিজে ফিরে আসে।

জ্যৈষ্ঠের শেষে বর্ষা নামলো। ফুটো চালা দিয়ে জল নেমে দাদাভাইয়ের কাঁথা ভিজে যায়, কিন্তু দাদাভাইয়ের সাড়া নেই। বুড়োর শিথিল দেহটা বেঁকেচুরে

ছড়িয়ে থাকে—মাঝে মাঝে একটু নড়ে, এই মাত্র। এই দু-মাস ধ'রে বুড়ো মাঝে মাঝে ফকিরকে ডেকে উদ্‌গ্রীব প্রশ্ন করেছে,—ফকির জানিয়েছে, ওরা আসবে, এই পথেই আসবে। বুড়ো অপেক্ষা করেছে অধীর আগ্রহে। ওরা আসবে, বুড়ো বিশ্বাস করে, ফকির পথের দিকে চেয়ে থাকে। পুতুলগুলি ওরা নিয়ে যায়নি। সেই চারটি পুতুল। মলিনাদি, বীণা, আভা, আর পূর্ণ। নিখুঁত সুন্দর সুহাস চারিটি নিষ্পাপ পুণ্যময় মূর্তি। ওদের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা আছে, ওরা দরিদ্রের বন্ধু, নিরুপায়ের সেবক, ওরা পরদুঃখকাতর মহাপ্রাণ! ওরা আসবে, আসবে,—ওদের ফিরে আসতেই হবে। গ্রাম নৈলে ওদের চলবে না, গ্রাম ছাড়া ওদের আর কোনো কাজ নেই,—এই ভাঙ্গা খড়ের চালা, এই বাঁশবন, এই গাজনতলা, আর এই মৃত্যুমুখী শ্মশানে ওদের আসতেই হবে। ওরা আসবে, ফিরে আসবেই একদিন!

ফকির অধীর, অস্থির, অসহনীয় পুলকে সেই ভগ্নকুটীরের আশেপাশে চ'রে বেড়ায়। আবার এক সময় ছুটে আসে, দাদাভাইয়ের পাশে ব'সে তার পঞ্জরাস্থির উপরে হাত বুলোয়। মৃদুকরুণ সান্ত্বনা দিয়ে বলে, তুমি অত ভাবছ কেন? ঠিক আসবে ওরা!

বুড়ো সাড়া দেয় না, নড়ে না। এমন সান্ত্বনা সে পেয়ে এসেছে দিনের পর দিন, যুগের পর যুগ, কাল কালান্তর। শুধু চোখ দুটো সে খোলবার চেষ্টা করে —কিছু দেখতে পায় না, চোখ তার ঝাপসা হয়ে এসেছে। একপ্রকার ঘোলাটে রং ধরেছে।

ফকির সান্ত্বনা দিতে গিয়ে এক সময় মিথ্যা কথা বলে, ওরা আসবে দাদা-ভাই, খবর পাঠিয়েছে।

বুড়ো আবার তাকাবার চেষ্টা করে। ফকির তার চেহারা দেখে ভীত হয়ে ওঠে। বুড়ো যেন তার ভগ্ন মৃত্যুময় দেহের বাঁধন খুলে এখনই লাফিয়ে উঠতে চায়। ফকির ব্যস্ত হয়ে বলে, না, না—উঠতে হবে না, ওরা চিঠি দিয়েছে, শিগগিরই আসবে।

বুড়ো যেন কোন্ দিকে তাকায়, ফকির আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। এই দু'মাসের মধ্যে তার দাদাভাইয়ের দৃষ্টিশক্তি কখন যে নষ্ট হয়ে গেছে, সেকথা ফকির একবারও জানতে পারেনি। বুড়ো অন্ধের মতো হাত বাড়িয়ে ফকিরকে স্পর্শ করবার চেষ্টা করে। সে যেন বলতে চায়, ফকির, দাদু, আমাকে বাঁচিয়ে রাখ, যে ক'টা দিন আমার মেয়েরা ফিরে না আসে। তোকে তাদের হাতে তুলে দিয়ে যাবো।

কুমোরপাড়ায় মেলা লোকে ভুলে গেছে। এক আধজন যারা এই পথ দিয়ে যেতো, তাদের মুখেও আর কিছু শোনা যায় না। পূর্ণ আর মলিনাদির দলটিকে আর কারো মনে পড়ে না। ফকিরের কাছে আছে তাদের দেওয়া একটুকরো মোমবাতি। এটুকু সে রেখেছে পরম যত্নে। ওরা যেদিন আসবে এই মোমবাতির অবশেষটুকু জ্বালিয়ে ফকির ওদের আলো দেখাবে। অন্ধকারে ওরা পথ চিনবে।

কিন্তু আসবে কি ওরা? ওরা চ'লে গেছে নগরের জনারণ্যে—বহু জনতার মাঝখানে। ওরা মানী লোক, ওদের অনেক কাজ। ওরা গরীবের দুঃখ ঘোচায়, আর্তের সেবা করে, ওরা দান করে, দয়া করে। সমগ্র দেশের মহাজনতার আহ্বানে ওরা ছুটে গেছে বৃহত্তর সমাজের মাঝখানে,—সেখানে কত সহস্র ফকিরের দুঃখ দুর্দশা আর কত লক্ষ দাদাভাইয়ের রোগ ভোগ ওদের ঘোচাতে হয়। এনাৎপুরের কথা ওদের হয়ত মনেই নেই। তারা অনেক বড়, কেননা তারা পায়ের ধুলো দিয়ে গেছে ফকিরদের চালাঘরে,—ফকিররা অনেক ভাগ্যবান, কেননা ওদের দেখা পেয়েছিল!

কোনো অভিমান নেই ফকিরের। আভাদি তা'র মনে পিপাসা জাগিয়ে গেছে। ক্ষুধা জাগিয়ে গেছে বীণাদি। ফকিরকে বড় হতে হবে, গ্রামকে তুলে ধরতে হবে। জীবনকে সে গ'ড়ে তুলবে,—একদিন সে মস্ত বড় হবে। মলিনাদি তাকে আশীর্বাদ ক'রে গেছে। মানুষের মতো মানুষ হয়ে ফকির একদিন তাদেরই খুঁজে বার করবে।

আকাশ ভ'রে আষাঢ় নেমে আসে। বৃষ্টি ও ঝড়ের ঝাপটায় ভগ্ন জীর্ণ চালা ঘরখানা দোলে। পাশের বাঁশবনে যেন দানবেরই দৌরাত্ম্য লেগেছে। ঝড়ের দাপটে চালার বাকি খড়গুলি ছিন্নভিন্ন হয়ে উড়ে চ'লে যায়।

বুড়ো যেন অগাধ সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে,—হাত বাড়িয়ে তাই সে আকুল হয়ে ধরতে চাইছে খড়ের কুটি। বুড়ো খায়নি অনেক দিন,—তার বেঁচে থাকাটাই এক বিস্ময়। বুড়ো কাঁদেনা,—অন্তিম বিছানায় শুয়ে সে যেন উন্মত্ত হয়ে উঠতে চায়। সে শিল্পী, সে স্রষ্টা, সে পুতুলের মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে, প্রতিমা বানিয়ে তোলে।

কোনমতে ফকির সেই অবশিষ্ট মোমবাতিটুকু আজ রাত্রে জ্বালতে বাধ্য হয়। বুড়োকে দেখে সে আজ ভয় পাচ্ছে, বুড়োর মুখের বিচিত্র আর্তস্বর শুনে বুকের মধ্যে তার ধকধক করছে,—বুড়োর ভ্রূকুটিকরাল চক্ষু যেন ময়-দানবের মতো ভয়ঙ্কর! সহসা ফকির চেঁচিয়ে ওঠে, দাদাভাই, ও দাদাভাই···

ভাঙাস্বরে বুড়ো বিজবিজ ক'রে কি যেন বলে প্রলাপের মতো।

ফকির চেঁচিয়ে বলে, কোথা যাবে তুমি দাদাভাই?

বুড়োর মুখের গহ্বর থেকে আর্তনাদ বেরিয়ে আসে অস্পষ্ট ভাষায়। বুড়ো তাদের ফিরিয়ে আনবে!

বুড়ো বোধহয় সমস্ত বাধা আর বার্ধক্য দুইহাতে ঠেলে এক সময় ওঠবার চেষ্টা করেছিল, হঠাৎ মুখ থুবড়ে বিছানায় প'ড়ে গেল। তারপর একেবারে নিঃসাড়!

ফকির আর্তনাদ ক'রে ওঠে, দাদাভাই···

সাড়া নেই। আকুল কণ্ঠে ফকির আবার ডাকে। বুড়ো একটু ন'ড়ে ওঠে এবার। এখনো মৃত্যু হয়নি, এখনো ওরা এলে দেখা হতে পারতো···মোমবাতির শেষ অবশেষটুকু এখনো ফুরোয়নি।

সহসা ঝড়ের ঝাপটা ভিতরে এসে ঢোকে। বৃষ্টির তাড়না ছুটে আসে। উপরের চালার একটা অংশ মড়মড় ক'রে কাৎ হয়ে পড়লো।

ফকির চিৎকার করে, দাদাভাই···ওই যে এসেছে ওরা!

বুড়ো চিৎ হয়ে পড়ে। ফকির কেঁদে ওঠে, ওই যে, ওই যে ওরা এসেছে, দেখতে পাচ্ছ না?

মৃত্যুর আগে বুড়ো ব্যাকুল হয়ে কি যেন খোঁজে। ফকির হাউ হাউ ক'রে বললে, দেখতে পাচ্ছ না? এই যে তোমার সামনে। তোমার সামনে ওরা দাঁড়িয়ে, দাদাভাই!

বুড়ো বিশ্বাস করে না। ফকির তাড়াতাড়ি আর কিছু না পেয়ে সেই চারটি প্রাণময় পুতুলের পিঁড়ি দুই হাতে তুলে আনে, তারপর বুড়োর ঘোলাটে অন্ধ চোখের সামনে ধ'রে বলে, এই যে···এই যে এসেছে ওরা···চেয়ে দেখো দাদাভাই!

পুতুলগুলির দিকে চোখ তুলে বোধহয় বুড়ো ক্ষীণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বুঝতে পারে, হ্যাঁ, ওরা এসেছে! অন্ধকারে যেমন জ্যোতির্লেখা দেখা যায়, যেমন ভ্রান্তিদর্শন ঘটে, মৃত্যুর আগে যেমন অবাস্তব দেবতার আকস্মিক দিব্যজ্যোতি দেখা যায়,—বুড়ো তেমনি যেন দেখতে পায়, ওরা এসেছে তার চোখের সামনে। ওরা এসে পৌঁচেছে,—ওরা মিথ্যা স্তোকবাক্যে তাকে ভুলিয়ে যায়নি। ওরা হাসিমুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

পুতুলগুলি ফকির ধ'রে থাকে বুড়োর চোখের সামনে। মৃত্যু-পথযাত্রীর মুখে-চোখে শান্তি ও আনন্দের আভাস নেমে আসে। কোনো বেদনাময়

নৈরাশ্য, জীবনের প্রতি কোনো অশ্রদ্ধা, অথবা মানুষের প্রতি কোনো অবিশ্বাস —কিছুই সে রেখে গেল না, এইটুকু সান্ত্বনা!

তারপর? তারপর সেই দুর্যোগের অন্ধকারে ফকির একলা ব'সে ব'সে কাঁদে। মনে হয়, সমগ্র এনাৎপুরটাই যেন তার কণ্ঠনালীর মধ্যে ব'সে ভাঙা-গলায় কাঁদে!

ঘর ওই মাত্র তিনটি। রান্না-ভাঁড়ার অবশ্য আলাদা,—আর দক্ষিণে একফালি বারান্দা,—কিন্তু কলকাতা শহরে এই ফ্ল্যাটটির মাসিক প্রণামী চল্লিশ টাকা।

তিন-চারটি প্রাণীর হাত পা ছড়িয়ে থাকার পক্ষে এমন একটি ফ্ল্যাট সামান্য কথা নয়! অবশ্য অতিথি-অভ্যাগত এসে পড়বার সম্ভাবনা হলে একটু সমস্যা দেখা দেয় বৈকি।

তা হোক—বসবার ঘরের দেয়ালে পেরেক ঠুকতে ঠুকতে প্রতিমা বলে, দেবী দিদি একলা আসছেন, কোনো ঝঞ্ঝাট তাঁর নেই। বসবার ঘরে থাকলেই বা?

প্রিয়কুমার বললে, সিঁড়ি দিয়ে লোক যাতায়াত করবে না? তেতলার লোক যাওয়া-আসার সময় তোমার দেবী-দিদির দিকে কেউ যদি উঁকি-ঝুঁকি মারে?

প্রতিমা মুখ ফিরিয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকায়। বড়-বড় টানা চোখ, কপালে রেখা নেই, মুখে সংশয়ের চিহ্ন নেই। বলে, সে কি, তাই কেউ করে বুঝি?

করে না?—প্রিয়কুমার বলে, ফ্ল্যাটওলা বাড়িতে থাকার কৌতুক তোমার চোখে এখনও পড়েনি। সাধে কি আর বলি, গেঁয়ো ভূতের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে!

আচ্ছা—আচ্ছা, আমি না-হয় গেঁয়ো ভূত, আর তুমি কলকাতার ছেলে, হয়েছে ত'? এখন তা হলে কি করবে তাই বলো!—প্রতিমা আবার ছবি টাঙানোর পেরেক ঠুকতে থাকে। অতিথি এসে পৌছবার আগে ঘরখানা সাজিয়ে তুলতে না পারলে আর চলছে না।

প্রিয়কুমার বলে, ভীষণ সমস্যা! কি করা যায় বলো দেখি এখন?—এই ব'লে সে মুখ টিপে হাসে।

স্বামীর মুখ-চাওয়া-স্ত্রী নিজের কল্পনায় কোনো প্রতিবিধান করতে না পেরে শেষকালে বলে, বলো না, কি করব?

ওরে বোকা, এই ছাখো—ব'লে প্রিয়কুমার স্ত্রীর কাছে স'রে গিয়ে বলে, এই যে সিঁড়ির ধারের জানলাটা, এটায় পর্দা একটা ঝুলিয়ে দিয়ো, আর এই দরজাতেও একটা—বুঝলে? সেই যে আমি ফুলকাটা রঙীন থান এনেছিলুম—?

এক মুখ হেসে প্রতিমা এইবার স্বামীর দিকে তাকায়। এত সহজে সমস্যার যে সমাধান হয় আগে কে জানতো! বলে, ঠিক বলেছ, আমার মনেই ছিল না। কিন্তু আমি যে সেলাই জানি নে? কে করবে? কী চমৎকার ফুল-কাটা পর্দা করেছে ও-বাড়ির হরর মা! আমাকে যদি কেউ শিখিয়ে দিত!

প্রিয়কুমার বলে, তুমি একটি আস্ত শিমূল ফুল! কত লোকের বউ কত রকম জানে! তুমি কী জানো? জানো কেবল—

মুখের কথাটা প্রিয়কুমারের মুখেই থেকে যায়। দুজনেই হাসিমুখে তাকায় দুজনের দিকে। চারটি চোখের মধ্যে দুইটিতে চতুর বুদ্ধির দীপ্তি, আর দুইটি চাহনিতে নদীয়া জেলার কোন্ এক অখ্যাত গ্রামের একটি প্রাচীন সরোবরের স্নিগ্ধ ছায়া। প্রতিমা হাসিমুখ ফিরিয়ে আস্তে আস্তে পিঠের দিককার আঁচলটা কাঁধের উপর টেনে নেয়।

—আরে, সরো সরো, পেরেক পুঁতে পুঁতে ঘরখানাকে ভরিয়ে তুললে। কী হবে অত ছবি টাঙিয়ে? দেওয়ালে আর মশা-মাছি বসবার জায়গা নেই! তোমার দেবীদিদি এমন কী মহারানী ভিক্টোরিয়া আসছেন যার জন্যে এত সাজসজ্জা?

তুমি চুপ করো—প্রতিমা গ্রীবা দুলিয়ে বলে, ওরা কত লেখাপড়া জানা মেয়ে, কত ইংরিজি বই পড়ে! ঘরের চেহারা দেখলে কি মনে করবে বলো ত'?

প্রিয়কুমার বলে, ঃঃ অমন ঢের-ঢের গ্রাজুয়েট মেয়ে কুলকাতায় গড়াগড়ি যায়! তোমার মতন লক্ষ্মীর ঘরে তাঁর মতন থুবড়ি মেয়ে জায়গা পাবেন, এটা তাঁর ভাগ্যি।

তা বৈকি। এসে দেখবে ঘর-দোর আগোছালো; বলবে, অশিক্ষিত মেয়ে আমি! কী মনে করবে বলো ত'?

ইঃ—কি মনে করবেন, শুনি? লেখাপড়াতে তুমিই কোন্ কম? তুমিও ত' ছোটবেলায় পড়েছিলে শিশুশিক্ষা?

স্বামীর গম্ভীর রসিকতা প্রতিমা বুঝতে পারে না। মুখ ফিরিয়ে বলে, কিন্তু তুমি যে বলো শিশুশিক্ষা পড়লেও মানুষ মুখ্যু থাকে? দেবীদিদি যে ইংরিজিও জানেন।

প্রিয়কুমার বলে, ছোঃ, ইংরিজি! ইংরিজির শিশুশিক্ষাই লোকে পড়ে, তা

জানো ? তোমার দেবীদিদি যদি বিদ্বান হন তবে তুমি আর তিনি একই—নাও, হয়েছে, টুল থেকে এবার নামো। ওই ত', বেশ ছবি মানিয়েছে! তোমার দেবীদিদি এমন ঘরে ঢুকলে আর বেরোতেই চাইবেন না দেখো।

স্বামীর কথায় প্রতিমার মন খুশি হয়ে যায়। বলে, থাকলে ত' ভালোই, কতদিন দেখিনি। ও-বছরে একবারটি এসেছিল. সেই যে তুমি গাড়িতে তুলে দিয়ে এলে ? সেই যে গো ফটো তুললাম আমরা, মনে নেই ? বড্ড ভুলে যাও তুমি, বাপু! সেই যে তোমাকে তিনি একটা পশমের গেঞ্জি বুনে দিয়ে গেলেন ?

প্রিয়কুমার বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটু একটু মনে পড়ছে। তোমার দেবীদিদি দেখতে ঠিক কেমন, বলো ত' ? মানে, ঠিক মনে পড়ছে না আমার। আমাদের বনমালীর মতন গায়ের রংটা হবে বোধ হয়, না ?

ওমা!—প্রতিমা চোখ কপালে তুলে শিউরে ওঠে,—তোমার তাহলে একটুও মনে নেই! একবারে ধবধবে রং, নাক-চোখ কি সুন্দর, কেমন গড়ন-পেটন, কেমন চুল—

প্রিয়কুমার একমনে গভীরভাবে চিন্তা ক'রে বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ,—তাই ত'। তা বয়স হ'ল বৈকি, যতদূর মনে পড়ে বোধহয় বছর পঞ্চাশের কাছাকাছি,—না কি বলো ?

অ্যাঁ!

অন্ততঃ পঁয়তাল্লিশ ?

সহসা একবার হেসে উঠে প্রতিমা তাড়াতাড়ি মুখে আঁচল চাপা দেয়, এবং তেমনিভাবে হাসতে হাসতে স্বামীর গায়ের উপর গড়িয়ে প'ড়ে বলে, পঁয়তাল্লিশ! তাঁর যে এখনো পঁচিশ হয়নি গো ?

ও একই।—প্রিয়কুমার বলে, দাঁড়াও, দরজাটা ভেজিয়ে দিই, তারপর দুজনেই হাসবো খুব ক'রে।

চট ক'রে প্রতিমা সোজা হয়ে দাঁড়ায়। রুদ্ধকণ্ঠে বলে, না, থাক্ দরজা খোলা, তোমার চালাকি আমি জ । এই সকাল বেলায় তোমার—ছিঃ কী হচ্ছে ?

বাইরে খুড়িমার গলার আওয়াজ পেয়ে দুজনেই সতর্ক হয়ে স'রে দাঁড়ায়। তারপর দরজার কাছে এসে প্রিয়কুমার নিজেই বলে, পিসতুতো বোনের ননদ, তার জন্যে আবার এত! আমি বাপু তোমাদের অতিথি-সৎকারের মধ্যে নেই, আমার অনেক কাজ। বসবার ঘরটা না হয় ছেড়েই দিলুম, কিন্তু বন্ধুবান্ধব এলে বসাবো কোথায় ?

মাথায় ঘোমটা টেনে চাপা গলায় প্রতিমা বলে, একটু কষ্ট করো, লক্ষ্মীটি—

ক'দিন তিনি থাকবেন শুনি?

তিনদিন গো—

আমাকে দিয়ে যেন ফাই-ফরমাস খাটিয়ো না। মেয়েছেলের ফরমাস খাটাও ঝকমারি।

খুড়িমা বারান্দার ধার থেকে এগিয়ে এসে বলেন, তা আসছে, ভালোই ত'? কবে আসবে গা, বৌমা?

প্রতিমা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে খুড়িমার পাশে দাঁড়িয়ে মৃদুকণ্ঠে বলে, আজই বিকেলে।

আয়োজনের আর কোনো ত্রুটি রইলো না। অতিথির কাছে স্বামীর পরিচয় আর ঐশ্বর্যকে উজ্জ্বল ক'রে তুলে ধরার জন্য সারাদিন প্রতিমার পরিশ্রমের আর অন্ত নেই। বনমালীর সাহায্যে সমস্ত ফ্ল্যাটটা জল দিয়ে ধুয়ে-মুছে সে তকৃতকে ক'রে তুললো। শোবার ঘর তিনখানার আসবাব-সজ্জাগুলি ঝেড়ে-মুছে চেহারা ফিরিয়ে দিল। দর্জির বাড়ি থেকে দরজা ও জানলার পর্দা তৈরি হয়ে এলো। এদিকে ধবধবে চাদর উঠলো বিছানায়, ঝালর-দেওয়া বালিশ, নেট-এর মশারি,—টেব্‌লে চীনামাটির ফুলদানি, প্রিয়কুমারের প্রিয় কয়েকখানি বই, টিপাইয়ের উপরে ঘষা-কাঁচের ডুম-বসানো টেব্‌ল্‌-ল্যাম্প,—ওদিকে একটি শেল্‌ফে সুগন্ধি তেল, ভালো সাবান, দাঁতের মাজন, মাথার নতুন ফিতা ও কাঁটা, দেয়ালে ঝোলানো বড় একখানা সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো আয়না, তার পাশে শাড়ি ঝুলিয়ে রাখার একটি আলনা। মহিলা অতিথির অভ্যর্থনা ও স্বাচ্ছন্দ্যের কোথাও বিন্দুমাত্র কার্পণ্য নেই। স্বামীর রুচি আর সৎশিক্ষার সুখ্যাতি হবে এই আনন্দ-গৌরবে সারাদিন প্রতিমার বুকের ভিতরটা টলমল করতে লাগলো। তার মতন স্বামী-ভাগ্য ক'জনের?

ভালো শাড়ি আর জামা প'রে বেলা চারটে নাগাদ সবেমাত্র সে পায়ে আলতা প'রে উঠে দাঁড়িয়েছে। এমন সময় নীচের দরজায় মোটরের হর্ন শোনা গেল।

প্রিয়কুমারের বহু আপত্তি থাকলেও স্ত্রীর অনুরোধে তাকে যেতে হয়েছিল স্টেশনে। মোটরের আওয়াজ শুনে প্রতিমা বারান্দায় হাসিমুখে এসে দাঁড়ালো। খুড়িমা বেরিয়ে এলেন। বনমালী জিনিসপত্র ব'য়ে আনার জন্য নীচে নেমে গেল।

অতিথির মতো অতিথিই বটে। মুখে অপরিসীম গাম্ভীর্য, কিন্তু তবু

হাসিমুখ। পরনে দামী শাড়ি, কিন্তু তার চাকচিক্য নেই, যেমন-তেমন ক'রে জড়ানো। হাতে কয়েকটি ফিনফিনে চুড়ির সঙ্গে একটি ছোট সোনার হাতঘড়ি, গলায় চিকচিকে হার, পায়ে বাদামী রঙের ফিতা বাঁধা একজোড়া স্লিপার। দীর্ঘ উন্নত দেহ, শঙ্খের মতো সে দেহ মসৃণ, সুন্দর।

প্রতিমার চিবুক নেড়ে আদর ক'রে দেবীরানী খুড়িমার পায়ের ধুলো নিলো। প্রতিমা বললে, এবারে কিন্তু তিন দিনের বেশি থাকতে হবে তোমাকে, দেবীদিদি।

বক্‌শিস্ ?—ব'লে দেবীরানী হাসিমুখে ফিরে চাইলেন।—বক্‌শিস্ না পেলে অতিথির চলবে কেন ?

প্রতিমার হয়ে প্রিয়কুমার উত্তর দিল, তা বক্‌শিস্ দেবো বৈকি। আমাদের অকুণ্ঠ সেবা, হৃদয়ের ঐকান্তিক—মানে যাকে বলে—

আপনি কে, মশাই ? চিনিনে ত' ?

খুড়িমা হাসছেন। প্রতিমা মুখে আঁচল চাপা দিল। প্রিয়কুমার বললে, বেশ লোক যা হোক, স্টেশন থেকে আনলুম মাথায় ক'রে, তার জন্যে একটু কৃতজ্ঞতাও নেই। উল্টে বাড়ি ব'য়ে এসে বাড়িওয়ালাকে বলেন, আপনি কে মশাই ! ঘোর কলিযুগ !

দেবীরানীর হাত ধ'রে প্রতিমা তাকে ঘরে নিয়ে এলো। প্রিয়কুমার ভিতরে এসে বললে, বিশিষ্ট অতিথির জন্য আমরা স্বামী-স্ত্রী মিলে সারাদিন ঘর সাজিয়েছি। দয়া ক'রে সেদিকে একটু প্রসন্ন দৃষ্টি দেওয়া হোক।

প্রতিমা বললে, ওমা, তুমি আবার কখন কি করলে ?

করিনি ? ফের আবার স্বামীর অবাধ্য হওয়া ?

কখন আমি আবার অবাধ্য হলাম গো তোমার ?

হওনি ?—কৃত্রিম রোষ প্রকাশ ক'রে প্রিয়কুমার বললে, অতিথির সামনে আমাকে অপমান ?

প্রতিমা অবাক হয়ে বললে, আচ্ছা দেবীদিদি, এতে অপমান হ'ল কোথায় ?

দেবীরানী তাকে কাছে টেনে নিয়ে বললে, মানী লোক কিনা ওরা, তাই ওরা পদে পদে মান খোয়ায় ! তুমি ভাই রাগ ক'রো না।

প্রিয়কুমার বললে, আপনার এ কথার মানে ?

মানে এই যে, সারাদিন আমি ট্রেনে এসেছি, এখন বিবাদ বাধালে আপনাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হবে।

প্রতিমা হেসে লুটিয়ে পড়লো।

দেবীরানী পুনরায় বললে, যান, চা আনুন, ব'সে ব'সে কোঁদল করবেন না।

—না, না, তুমি থাকো ভাই, ওঁকে একটু খাটিয়ে নিই। ফাই-ফরমাস করলে উনি বিশেষ দুঃখিত হবেন না।

নিতান্ত অতিথি বলেই এ রকম তাচ্ছিল্য স'য়ে রইলুম।—ব'লে প্রিয়কুমার হাসিমুখে বাইরে চ'লে গেল। খুড়িমা এসে অবশ্য তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন, বনমালীর হাতে তিনি চা ও জলখাবার পাঠালেন। মিনিট দুই পরেই প্রিয়কুমার আবার ফিরে এসে বসলো।

দেবীরানী হাসিমুখে বললে, স্ত্রীকে একটু ভালো-টালো বাসেন ? না, কেবল কথার চাতুরীতে গ্রামের মেয়েকে ভুলিয়ে রাখেন ?

প্রশ্নটিতে একটু অস্বস্তি আছে বৈকি। প্রতিমা উঠে পালাবার চেষ্টা করলো প্রিয়কুমার বললে, পাপ মুখে বলতে নেই। আমাদের ভালোবাসা কি আর অন্য লোকে বুঝবে ?

এসেই যে-শাসন দেখলুম তাতে বিশ্বাস করা একটু কঠিন।—ব'লে দেবীরানী বক্রদৃষ্টি ফিরিয়ে হাসলো।

প্রিয়কুমার বললে, মেয়েমানুষের দৃষ্টি বেশিদূর পৌছয় না।

দেবীরানী বললে, তাই নাকি ? কথাটা শুনলেও মন ঠাণ্ডা হয়। কই, আমার দিকে মুখ তুলে কথা বলুন ত' ?

প্রিয়কুমার কিন্তু মাথা তুললো না। মুখ নামিয়েই তামাসা করে বললে, স্ত্রী ছাড়া আর কোনো মেয়ের দিকে আমি মুখ ফেরাইনে। এইটি আমার তপস্যা।

দেবীরানী খুশিমুখে বললে, ওরে বাবা, এত ? খুব যে তোষামোদ করতে শিখেছেন ? গত বছরের চেয়ে একটু উন্নতি হয়েছে দেখছি। চক্ষু সার্থক হ'ল।

বেশ ত', থাকুন না কিছুদিন, আরো দেখতে পাবেন।

রক্ষে করুন, আমার বাজার-হাট করা হয়ে গেলেই এখান থেকে পালাবো।

কোথা পালাবেন ?—প্রিয়কুমার মুখ তুললো।

কেন, লক্ষ্ণৌতে। যেখানে চাকরি করি।

প্রতিমা বললে, চাকরি করেই তুমি চিরদিন কাটাবে, দেবীদিদি ?

কি আর করি ভাই, বলো ?

বিয়ে করবে না বুঝি ?

দেবীরানী শিউরে উঠে বললে, সর্বনাশ, বিয়ে ? একটা পুরুষ মানুষ চিরকাল জালাবে, আর তাই সহ্য করব ?

ঘরসুদ্ধ সবাই হেসে উঠলো।

প্রতিমা বললে, তুমি বড়লোকের মেয়ে, চাকরি ক'রে তোমার কী হবে?

বিয়ে করেই বা কি স্বর্গলাভ?

প্রিয়কুমার সেখান থেকে হঠাৎ উঠে বেরিয়ে গেল। প্রতিমা সরল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো দেবীরানীর প্রতি। স্ত্রীলোকের বিবাহের দিকে মন নেই! বিয়ে না হলে তাদের স্বর্গলাভ হয় না, তারা স্বামী ছাড়া আর কোনো পরিচয়ে নাকি সংসারে বেঁচে থাকতে পারে, এসব কথা তার কল্পনায় নেই! সুতরাং সর্বপ্রথম যে-কথাটা তার মনে এলো সেইটিই সে প্রকাশ করলো।—আসলে, কিন্তু স্বামী ছাড়া মেয়েমানুষকে দেখবে কে, দেবীদিদি?

এতদিন কে দেখলো রে?—ব'লে দেবীরানী একঝলক মলিন হাসি হাসলো।

প্রতিমা বললে, কিন্তু যখন বয়স হবে? বুড়ো হবে?

বেশ ত', তোরাই ত' আছিস। ব'লে দেবীরানী খুব হেসে উঠলো। কথাটা ওঘর থেকে প্রিয়কুমার কান পেতে শুনলো। তার মনের একূল থেকে ওকূল অবধি একটা তরঙ্গ আলোড়িত হয়ে উঠলো।

দেবীরানীর কেমন একটা চাঞ্চল্য দেখা যায়—সেটা অনেকটা যেন অস্বাভাবিক। তিনখানা ঘর জুড়ে যখন-তখন তার অহেতুক পদচারণা লক্ষ্য ক'রে প্রতিমা তাকে কি যেন একটা প্রশ্ন ক'রে বসেছিল, কিন্তু একটুখানি হাসি ছাড়া আর কোনো বিশেষ সদুত্তর পায় নি। ভাঁড়ার ঘরখানায় ঢুকে প্রত্যেকটি সামগ্রী লক্ষ্য করা, অনাবশ্যকভাবে রান্নাঘরের ভিতরটা পর্যবেক্ষণ ক'রে একটা অকারণ মন্তব্য করা, গৃহসজ্জার খুঁটিনাটি আলোচনা ক'রে নিজের মতামতটা জানানো, হঠাৎ বাথরুমটায় ঢুকে নিঃশব্দে কতক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকা—এই রকম বিভিন্ন প্রকার খেয়াল লক্ষ্য ক'রে প্রতিমা অনেক সময়ে হেসেই অস্থির। এক সময়ে আড়ালে গিয়ে স্বামীকে সে প্রশ্ন করে, হ্যাগো, দেবীদিদির মনটা এমন উড়ু-উড়ু কেন, বলো ত'?

প্রিয়কুমার বলে, তোমার দেবীদিদিকে জিজ্ঞেস করলেই পারো!

কিন্তু জিজ্ঞাসা করা প্রতিমার আর হয়ে ওঠে না। লেখাপড়া জানা মেয়ে ওরা, ওদের মনের ভাব জানতে গিয়ে কি সে শেষকালে নির্বুদ্ধির পরিচয় দেবে?

খুড়িমা এক সময়ে দেবীদিদিকে ধরলেন। বললেন, হ্যাঁ গা, রাণু! তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করছিলুম, মা।

দেবীরানী খুশি হয়ে বললে, কি বলুন ?

তোমাকে বাজার হাট করতে কলকাতায় আসতে হ'ল ? লক্ষ্ণৌ শহরে কিছু পাওয়া যায় না বুঝি ?

দেবীরানী বললে, সবাই কি সেখানে সব পায়, খুড়িমা ? তাই ত' এতদূরে ছুটে এলুম।

কথাটা যুক্তিসঙ্গত বৈকি—খুড়িমা চুপ ক'রে গেলেন। কিন্তু তাঁর সন্দিগ্ধ প্রশ্ন আর অব্যক্ত মনোভাবটি লক্ষ্য ক'রে দেবীরানী যেন একটু আড়ষ্ট হয়ে উঠলো। একটু পরে খুড়িমা আবার কথা পাড়লেন। বললেন, বিয়ের পরে আমরা জানলুম, তোমাদের সঙ্গে বৌমাদের আত্মীয়তা আছে! কিন্তু তুমি নাকি আগে কলেজে পড়তে প্রিয়কুমারের সঙ্গে ?

দেবীরানী একটু চমকে উঠলো। কিন্তু ভাবগোপন ক'রে বললে, সেটা আমার ঠিক মনে পড়ে না। তবে বছর মিলিয়ে দেখতে পাওয়া যায়, প্রিয়-কুমারবাবু পড়তেন সেই সময়টায়।

তোমার মনে নেই ?

একটু-আধটু অস্পষ্ট মনে পড়ে। অনেক ছাত্র-ছাত্রী ছিল কিনা—

খুড়িমা তাঁর মন্তব্য জানালেন। বললেন, আমি ঠিক ভালো বুঝিনে মা—ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে পড়া, অনেক রকম কথা ওঠে কিনা—

দেবীরানী বললে, তা ঠিক বলেছেন আপনি। অনেকের জীবন ভেঙেচুরেও তচনচ হয়ে যায় শুনেছি!—এই ব'লে সেখান থেকে সে স'রে গেল। প্রতিমা তার পথের দিকে তাকিয়ে রইলো। সরল, নির্বোধ ও গ্রাম্য তার দুটি চোখ।

সমস্ত ফ্ল্যাটটার মধ্যে মানুষের মনোবিকলনের একটা সূক্ষ্ম নাটকীয় ঘাত-প্রতিঘাত চলছে, উপরে সেটা প্রত্যক্ষ নয়। ঘটনায় তার কোনো প্রকাশ নেই, আত্মীয়তায় সেটা আন্দোলিত হয়—কিন্তু চলাফেরায়, চাহনিতে, ভ্রূকুঞ্চনে, ঈষৎ হাস্যে—সেটা প্রকট। প্রতিমার সাধ্য নেই সেটাকে স্পর্শ করে, খুড়িমার সাধ্য নেই সেটাকে আবিষ্কার করেন। এ নাটক সকলের জন্য নয়।

দেবীরানী এসে দাঁড়ালো এ ঘরে। প্রিয়কুমার তখন একখানা বই মুখে দিয়ে ব'সে রয়েছে। মুখ না তুলেই সে বললে, তোমার দেবীদিদির কোনো অযত্ন হয় না যেন, দেখো।

তুমি নয়, আপনি! দেবীরানী পিছন থেকে হেসে উঠলো।

সলজ্জ বিস্ময়ে প্রিয়কুমার বললে, বুঝতে পারিনি আপনি এসে দাঁড়িয়েছেন।

দেবীরানী বললে, কিন্তু যত্ন করলেও যদি আমি খুশি না হই ?

তাহলে বলুন কিসে আপনি খুশি হবেন ?

যদি বলি, হে বলিরাজা, তুমি স্বর্গ আর মর্ত্যের অধীশ্বর—মস্ত বড় দাতা তুমি। কিন্তু স্বর্গ আর মর্ত্যলোক আমাকে দান করুন—পারবেন ?

প্রিয়কুমার বললে, আপনি অন্তর্যামী নারায়ণ হলে পাতালে যেতে পারতুম বৈকি।

দেবীরানী বললে, না, পারতেন না। কোনো যুগেই পুরুষ মেয়েদের জন্যে সর্বস্বান্ত হয়নি। মেয়েদের প্রাণ নিয়ে তারা জীবন-মরণ খেলায় মেতেছে। হেরেছে, কিংবা জিতেছে, এইমাত্র।—শেষের কথাটায় তার গলা একটু ধ'রে এলো।

প্রিয়কুমার নতমুখে চুপ ক'রে রইলো, আর কোনো জবাব দিল না।

দেবীরানী বললে, আপনার খুড়িমার প্রশ্নবাণে আমি জর্জরিত। তিনি বলেন, লক্ষ্ণৌ থেকে এতদূরে এসে বাজার-হাট করা ? সেখানে কি কিছুই পাওয়া যায় না ?

প্রিয়কুমার বললে, আপনি কি জবাব দিলেন ?

ঈষৎ উষ্ণকণ্ঠে দেবীরানী বললে, সেকথা শোনবার কি কোনো দরকার আছে আপনার ? আপনি কি মনে করেন, আপনার খুড়িমার কাছে কথার চাতুরী খেলতেই আপনার এখানে এসেছি ?

এই ব'লে সে স'রে গেল। জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। প্রিয়কুমার রুদ্ধ নিঃশ্বাসে আড়ষ্ট হয়ে ব'সে রইলো। ঘরের বাতাসটা যেন থমথম করছে। কে যেন একটা মস্ত কান্নার গলা টিপে ধরেছে!

এমন সময় প্রতিমা এসে দাঁড়ালো দেবীরানীর কাছে। মুখ ফিরিয়ে দেবীরানী বললে, এসেছিস ? অতিথিকে কোথাও যেন একলা ফেলে রাখিসনে, তাকে ভূতে পায় জানিস ত' ?

প্রতিমা খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো। দেবীরানী সস্নেহে তার গলা ধ'রে বললে, হ্যাঁ রে ভাই, সত্যি! আচ্ছা প্রতিমা, একটা কথা ঠিক ক'রে বলতে পারিস ?

কি বলো ত' ?

মরুভূমির ওপর যদি বুকের রক্ত গড়িয়ে পড়ে, তবে কি সে মরুভূমি উর্বর হয় ?

কথাটা যাকে উদ্দেশ ক'রে বলা, সে তখনো বইখানা সামনে ধ'রে স্তব্ধ হয়ে ব'সে রয়েছে। প্রতিমা জবাব দিল, আমি ত' ভাই বলতে পারি নে!

দেবীরানী বললে, পারিসনে, কেমন ? বেশ। আচ্ছা, বলতে পারিস, ত্রেতাযুগে কোনো ছলনাময়ী রাজা রামচন্দ্রের মন ভোলাতে চেষ্টা করেছিল ? বোধহয় করেনি, কি বলিস ?

সরলভাবে প্রতিমা বললে, আমি ভাই ছোটদের রামায়ণ পড়েছিলুম, তাতে এসব ছিল না।

দেবীরানী সহসা অন্য জানলাটার কাছে স'রে গেল। তারপর বললে, তোদের এদিকটা বড্ড ফাঁকা। এত ফাঁকায় তোরা থাকিস, মন হু হু করে না ? কোথাও গাছপালা নেই, কেবল প্রকাণ্ড একটা শূন্য !—তার গলাটা যেন শান্ত হয়ে এলো।

প্রিয়কুমার আস্তে আস্তে উঠে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। সেইদিকে একবার লক্ষ্য ক'রে দেবীরানী বললে, আমার এক একবার কি মনে হয় জানিস, প্রতিমা ! মানুষের জীবন হ'ল ঈশ্বরের মস্ত একটা জিজ্ঞাসা,—আমরা কেবল তার উত্তর হাতড়ে-হাতড়ে বেড়াই। সে উত্তর খুঁজে পাবোনা কোনোদিন।

সমস্ত শুনে প্রতিমা বললে, তুমি এবার চান করবে চলো, দেবীদিদি।

প্রস্তাবটা শুনে সহসা অহেতুক ব্যস্ততা সহকারে দেবীদিদি ব'লে উঠলো, তাই চল্। খেয়ে-দেয়েই আমাকে একবার বেরুতে হবে। কি জানিস ভাই, ঘরের মধ্যে আমার মন কিছুতেই টিঁকতে চায় না।

অনুযোগের সঙ্গে প্রতিমা বললে, কি ক'রে টিঁকবে ? ঘরকন্নার স্বাদ যে তুমি পাওনি !

পিছন ফিরে হাসিমুখে দেবীদিদি প্রতিমার গাল দুটি নেড়ে দিয়ে বললে, বোকা মেয়ে ! ঘরকন্নার আবার স্বাদ কি রে ? প্রাণটাই যদি খুঁজে না পাই, দেহটির দাম কতটুকু ?—এই ব'লে সে স্নান করতে চ'লে গেল।

সেদিন কোনোমতে দুটি আহারাদি সেরে দেবীরানী বেরিয়ে পড়লো। যখন সে ফিরলো তখনও সন্ধ্যা হয়নি। তার পিছনে পিছনে একটি ছোকরা এসে জিনিসপত্র সমেত একটা চাঙারি রেখে চ'লে গেল। দেবীরানী গিয়েছিল মার্কেটে। চাঙারিতে এক গোছা রজনীগন্ধার সঙ্গে দুটি অন্যান্য ফুলের তোড়া। একগুলি মরশুমী সুস্বাদু ফল, একখানি অপরাজিতা রংয়ের শাড়ি, এবং নানাবিধ প্রসাধন সামগ্রী। দেবীরানী নিজের হাতেই সেগুলি ঘরে তুলে নিয়ে এলো।

চাঙারিটি দেখেই প্রতিমা গিয়ে ঘরে লুকিয়েছিল। দেবীরানী হাসিমুখে ঢুকে প্রতিমার হাত ধ'রে টেনে আনলো। প্রতিমা রাগ ক'রে বললে,

বছর-বছর এসে তুমি এমনি করে বেহিসেবী খরচ ক'রে যাবে, এবার আমি শুনবোনা, দেবীদিদি!

দেবীরানী বললে, তোকে না সাজালেই আমার চলবে না রে।

কেন, শুনি?

আচ্ছা শোনাবো একদিন। এই ব'লে দেবীরানী তাকে প্রিয়কুমারের পড়ার ঘরে টেনে নিয়ে এলো। পুনরায় বললে, যদি বলি অষ্টাদশ পর্ব মহাভারত তোকে শোনাবো,—তোর ঘুম পাবে না?

প্রতিমা কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। তারপর বললে, দেবীদিদি?

কেন রে?

তোমার কথা কোনোদিন আমি বুঝতে পারিনি।

তাহলে নিশ্চয় আমি একটা পাগল!…ব'লে দেবীরানী হেসে উঠলো। কিন্তু সে-হাসিতে এবার প্রতিমা যোগ দিতে পারলো না।

দেবীরানী প্রতিমার সুন্দর ও সুকুমার দেহখানিতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জামা ও কাপড় পরিয়ে দিল। চোখের পাতায় কাজলের মোহ এঁকে দিল, তার খোঁপায় দিল ফুল, পায়ে দিল আলতা। তারপর বললে, পারবিনে ভোলাতে?

প্রতিমা হেসে বললে, কাকে?

দেবীরানী বললে, স্বামীকে নয়, পুরুষকে?

ওমা, সে কি?

হ্যাঁ রে। স্বামী ত' ভুলতে বাধ্য—কিন্তু স্বামীর মধ্যে যে পুরুষের বাসা তাকে ভোলানো বড় কঠিন, প্রতিমা। কিছু দিয়েই তাকে ভোলানো যায় না—মেয়েমানুষের সমস্ত জীবনের তপস্যাটাও তাদের কাছে কিছু নয়! তারা নির্দয়, হৃদয়হীন,—তারা হিমালয়! যদি ভোলাতে পারিস, বুঝবো আমার এই সাজানো সার্থক। এই ব'লে সে গলাটা একবার ঝেড়ে নিল।

প্রতিমা বললে, একথা কেন বলছ, দেবীদিদি? উনি ত' তেমন মানুষ নন যে, আমাকে অনাদর করবেন? অনেক পুণ্যের জোরে আমি ওঁকে পেয়েছি!

দেবীরানী পিছন দিকে দাঁড়িয়ে প্রতিমার আলগা খোঁপাটা ঠিক ক'রে দিচ্ছিল। কিন্তু প্রতিমার কথায় ক্ষুধার্ত শ্বাপদের মতো তার চোখ দুটো পলকের জন্য জ্বলে উঠলো, সেটা আর দেখা গেল না। কেবল শান্ত কণ্ঠে বললে, নিশ্চয়, সে একশো বার। তোর মতন পুণ্যবতী ক'জন আছে ভাই?

প্রতিমা স্বস্তিবোধ ক'রে নীরব হয়ে গেল। কিন্তু তারপর, সাজসজ্জার শেষে, দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার ঠিক পথেই প্রিয়কুমার এসে হাজির।

স্ত্রীর দিকে চেয়ে সে বললে, একি ? ইন্দ্রসভায় আজ নাচের ফরমাস আছে নাকি ?

প্রতিমা হাত ছাড়িয়ে ছুটে পালিয়ে গেল ভাঁড়ারের দিকে। দেবীরানী পাশ কাটিয়ে দাঁড়ালো প্রায় প্রিয়কুমারের মুখোমুখি। কৈফিয়ৎ স্বরূপ প্রিয়-কুমার বললে, কলেজ থেকে বেরিয়ে আজ যেতে হয়েছিল এক চায়ের পার্টিতে। জানি, অতিথির আজ কিছু অনাদর ঘ'টে গেছে।

পাথরের পুতুলের মতো দেবীরানী দরজাটার গায়ের উপর নতমুখে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মৃদুকণ্ঠে ব'লে বসলো, কেবল আজ ত' নয়—চিরদিন!

কথাটার সঙ্গে একটা চাবুকের আঘাত ছিল, কিন্তু প্রিয়কুমার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলো না। একরাশ বই টেব্‌লের ওপর রেখে মুখ ফিরিয়ে সে শুধু বললে, আপনার কি কালই যাওয়া স্থির ?

না।

আর কতদিন থাকবেন ?

যতদিন খুশি।

প্রিয়কুমারের গলার কাছে আতঙ্কের মতো কি যেন একটা ঠেলে উঠলো। কিন্তু সেটাকে চেপে হাসিমুখে সে বললে, কিন্তু বাসনার চিহ্ন প্রতিমার সর্বাঙ্গে এঁকে-এঁকেই কি এখানে দিন কাটাবেন!

দেবীরানী চুপ ক'রে রইলো।

প্রিয়কুমার পুনরায় বললে, পুরুষকে যন্ত্রণা দেবার নির্ভুল পথ এটা নয়!

দেবীরানী মুখ তুললো। সন্ধ্যার অন্ধকারে দেখা গেল না, তার তীব্র চোখ দুটো বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে এসেছিল কি না। সে কেবল অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে বললে, তবে নির্ভুল পথ কোন্‌টা ? কেমন ক'রে যন্ত্রণা দিলে তোমার বুক ভেঙে দেওয়া যায়—ব'লে দিতে পারো ?—এই ব'লে সে ছুটে সেখান থেকে চ'লে গেল। ঝরঝরিয়ে তার চোখে জল এসেছিল।

নিজের ঘরে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে প্রিয়কুমার পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। সেদিন সে মাথার কাছে টেব্‌ল-ল্যাম্পটা রেখে বিছানায় শুয়ে একখানা মোটা ইংরেজি বই মুখের কাছে নিয়ে নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিল। রাত তখন অনেক। ওঘরে প্রতিমা আর দেবীরানী নিদ্রিত। তার পাশের ঘরে খুড়িমা। এ ঘরে আলোটা জ্বলছে, দরজাটা খোলাই রয়েছে।

পড়তে পড়তে কখন যে তার দুই চোখে ঘুম এসেছে, কখন ঘড়ির কাঁটা-গুলি ঘুরে ঘুরে শেষ রাত্রির দিকে এসে পৌঁচেছে, প্রিয়কুমারের কিছুমাত্র চেতনা

ছিল না। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার পেরিয়ে জ্যোৎস্না দেখা দিয়েছে, রাতজাগা পাখী কোথায় হায়রান হয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে, কখন নিঃসাড় অন্ধকার জগৎ তার চক্রপথের প্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে প্রভাতের অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল, তাও এই ক্ষুদ্র পরিবারটির অজ্ঞাত ছিল।

সহসা আচমকা এক সময়ে প্রিয়কুমারের ঘুম ভেঙে গেল। কখন সে ঘুমিয়েছিল, কেন তার ঘুম ভাঙলো, ঠিক বুঝতে পারা গেল না। কিন্তু উৎকর্ণ অধ্যাপকের বিশ্লেষণী বুদ্ধি একথা অনুভব করলো, তার আচমকা ঘুম ভাঙার একটা সঙ্গত কারণ আছে বৈকি। ঘরের খোলা দরজা, উজ্জ্বল আলো, ব্র্যাকেটের ওপর টিকটিকে ঘড়ি, দেয়ালের ছবি, কাপড়ের আলনা—সবগুলো যেন চক্রান্ত ক'রে মুখ বুজে গোপন কথাটা চেপে রয়েছে। মনে হচ্ছে একটা অস্পষ্ট সংবাদ তার অচেতন ঘুমের মধ্যে নিঃশব্দসঞ্চারে এসে দাঁড়িয়েছিল, সেটার অশরীরী আত্মাটা এখনো তার এই পড়ার ঘরে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য, ঘড়িতে রাত সাড়ে চারটা বাজে। এতক্ষণ ধ'রে সে ঘুমিয়েছে? এত তার ঘুম?

সহসা বাইরে খুড়িমার গলার আওয়াজ পাওয়া গেল,—ওখানে কে গো দাঁড়িয়ে? বৌমা নাকি?

পলকের জন্য মৃত্যুর মতো একটা তুহিন স্তব্ধতা। তারপর শোনা গেল, না খুড়িমা, আমি।

কে, রাণু?

আজ্ঞে হ্যাঁ—

খুড়িমা বললেন, এত রাত থাকতে উঠেছ কেন, রাণু?

তাঁর কণ্ঠে কেমন একটা সংশয়ের আভাস পেয়ে দেবীরানী একটু থতিয়ে জবাব দিল, ঘুমটা ভেঙে গেল রাত থাকতেই। আজ ভোরের গাড়িতে যাবার তাড়া আছে কিনা—

এটা একটা আকস্মিক কৈফিয়ৎ, প্রিয়কুমারের কানে বাজতে লাগলো। দেবীরানী চ'লে যাওয়া স্থির ক'রে ফেললো একটি নিমেষের মধ্যেই। সে এত অস্থির, এতই অতৃপ্ত!

খুড়িমা বললেন, ওমা, প্রিয়কুমারের ঘরে আলো জ্বলছে কেন? ও কি এখনো ঘুমোয়নি? বৌমা, শুনছ? ও বৌমা—?

প্রতিমা ধড়মড় ক'রে জেগে উঠলো। উঠে সাড়া দিল, কেন খুড়িমা?

তোমার এত ঘুম কেন, বৌমা? সমস্ত রাত ধরে প্রিয়র ঘরে আলো

জ্বলছে, দরজাটা খোলা—তুমি একটিবার খবর নিতে পারোনি কেন? এত রাতে রাণু চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে বারান্দায়, তারও একটা খোঁজখবর রাখা তোমার উচিত ছিল, বৌমা?—খুড়িমা বিরক্ত, উত্তপ্ত ও সংশয়াচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিলেন।

প্রতিমা বাইরে এসে বললে, দেবীদিদি, এখানে দাঁড়িয়ে যে?

দেবীরানী অসাড় ও চেতনাহীন হয়ে জ্যোৎস্নালোকের দিকে নিমেষনিহত চক্ষে দাঁড়িয়ে ছিল। প্রতিমার প্রশ্নে সে স্বপ্নাতুর দৃষ্টি ফিরিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললে, তোমার বাড়িতে এক জায়গায় চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকা, কিংবা রাত জাগার স্বাধীনতা নেই - একথা জানতুম না, প্রতিমা।

তার গলার আওয়াজে প্রতিমা একটু লজ্জিত হয়ে স'রে দাঁড়ালো। বললে, না দিদি, তুমি ঘুমোওনি কিনা তাই বলছি।—আসছি ভাই ওঘর থেকে।

প্রতিমা এলো স্বামীর ঘরে। বিছানার কাছে এসে সে প্রিয়কুমারের পা ঠেলে ডাকলো, কিন্তু একবার ঘুমোলে প্রিয়কুমারের নাকি আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। সে একেবারে বেহুঁস, তার নাক ডাকছে। পাছে শেষরাতে জাগালে প্রিয়কুমার বিরক্ত হয়, সেজন্য প্রতিমা আর তাকে ডাকলো না। কিন্তু নিজের হাতখানা সরিয়ে নিয়ে প্রতিমা দেখলো, তার হাতে জলের দাগ। নদীয়ার কোন্ এক ক্ষুদ্র গ্রামের সরল মেয়ে সে, সে নির্বোধ—জলের দাগের কারণটাকে সে তলিয়ে বুঝলো না। আলোটা নিবিয়ে, দরজাটা ভেজিয়ে সে বেরিয়ে এলো। তার মনে কোনো সন্দেহের ছোঁয়া লাগেনি।

খুড়িমা বললেন, তুমি আর ঘুমিয়োনা, বৌমা। রাণু যাবে ভোরের গাড়িতে—তার জিনিসপত্র গোছগাছ ক'রে দাও। বনমালীকে ডেকে উনুনে আগুন দিতে বলো।

শরৎকালের রাত্রি প্রভাত হয়ে এলো। প্রিয়কুমার ঘুম থেকে উঠলো। শুনলো দেবীরানী এখনই চ'লে যাবে। সে মুখ হাত ধুয়ে প্রস্তুত হ'ল। বনমালী গাড়ি ডেকে আনলো।

দেবীরানী গাড়িতে উঠবার আগে প্রতিমাকে আদর করলো, তারপর প্রিয়কুমারের দিকে ফিরে বললে, শুনেছি মরবার পরে মানুষ কোথায় গিয়ে যেন নিজের একটা কৈফিয়ৎ দেয়। আমিও কৈফিয়ৎ দিয়ে বলতে পারবো, সমস্ত জীবন ধ'রে জ্ব'লে-পুড়ে খাক্ হয়েছি বটে, কিন্তু নিরপরাধকে কখনো প্রতারণা করিনি!

প্রিয়কুমার হাসিমুখে বললে, কিন্তু নিরপরাধকে অনিচ্ছায় যারা চিরদিন ধ'রে ঠকাবে, তাদের কি উদ্ধার নেই ?

প্রভাতের আলোর মতন দেবীরানী হেসে উঠলো। বললে, বেশ ত', আপনি আর আমি একসঙ্গে গিয়ে যদি মহাকালের বিচার সভায় দাঁড়াতে পারি, তখন এর মীমাংসা হবে।

অদূরে দাঁড়িয়ে খুড়িমা বললেন, তোমার গাড়ির সময় হ'ল রাণু। এসো মা, এসো — সুমতি হোক — দুর্গা — দুর্গা —

দেবীরানী গাড়িতে উঠে বসলো। গাড়ি ছেড়ে দিল। সেইদিকে একাগ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রিয়কুমার মনে মনে বললে, সেখানেও এর মীমাংসা হবে না, রাণু!

চওড়া পথের একটা অংশ চ'লে গেছে ট্রাম রাস্তার দিকে, অন্য অংশটা চ'লে এসেছে উত্তরে। কিছু দূর এলেই বাঁ হাতি সরু গলি, কিন্তু গলিতে ঢুকে খানিকটা এগিয়ে এলেই বুঝতে পারা যায়, বেরোবার আর পথ নেই—ওটা চোখবন্ধ গলিপথ।

বাড়ির নম্বরটা মিলিয়ে দেখে দীপ্তি একটু থমকে দাঁড়ায়। ঘিঞ্জি ঠাসাঠাসি বাড়ির জটলা,—নিরেট জমাট ইমারতের ভিড়ে এই সঙ্কীর্ণ অন্ধ গলিপথ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এসেছে। দীপ্তি এদিক-ওদিক তাকায়,—শীতের অপরাহ্নের ধোঁয়ায় কোনো বাড়ির নম্বর ঠাহর করার উপায় নেই। এপাশ-ওপাশের স্তূপীকৃত পুরনো আবর্জনার বীভৎস দুর্গন্ধে দাঁড়িয়ে থাকাও কঠিন। দীপ্তি উদ্‌ভ্রান্তভাবে কিয়ৎক্ষণ ঘোরাফেরা ক'রে একটু বিব্রতভাবেই বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে, এমন সময় একটি ভদ্রলোক প্রশ্ন করেন, কত নম্বর চান?

দীপ্তি সপ্রতিভভাবে জবাব দেয়, নম্বরটা ঠিক জানিনে, তবে যুগলবাবুর বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন?

যুগলবাবু?

আজ্ঞে হ্যাঁ,—এই গলিতেই হবে আমার বিশ্বাস। অনেক কাল পরে কি না—গলিটার চেহারা বদলে গেছে।

ভদ্রলোকটির হাতে ছিল গোটা দুই ফুলকপি,—অর্থাৎ সদাগরী অফিসের ভব্যতাযুক্ত কেরাণী, সুতরাং তাঁর দাঁড়াবার সময় ছিল না। তিনি বললেন, দেখুন, যুগলবাবু বললে এখানে কেউ চিনবে না। বাড়ির নম্বরটা চাই,—এখানে কেউ কারো নাম জানে না।

দীপ্তি বললে, এ পাড়ায় তাঁর কিন্তু বেশ নাম ডাক ছিল!

ভদ্রলোক হেসে বললেন, হয়ত ছিল, এখন ডুবে গেছে। দেখুন, যদি পান। এই ব'লে তিনি অগ্রসর হলেন।

আর দুটি লোক পাশ দিয়ে চ'লে যাচ্ছিল, চেহারায় আকৃষ্ট হয়ে বললে, কাকে চান? কত নম্বর?

পাশের বাড়ি থেকে একটি ছোকরা বেরিয়ে এসেছিল এবং উপরের এক বারান্দায় দু'তিনজন কৌতূহলী স্ত্রী-পুরুষ দাঁড়িয়ে গেছে। অর্থাৎ যাকে বলে একটি ছোটখাট জনতা। অসংখ্য প্রশ্নের মাঝখানে কেবল একটি প্রৌঢ় লোক প্রশ্ন করলেন, যুগল চৌধুরী কি?

সোৎসাহে দীপ্তি বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ—

ওই যাঁর এক মেয়ে পাগল হয়ে গেছে?

দীপ্তি বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ—সেই যুগল চৌধুরী!

এসো মা আমার সঙ্গে। তবে যুগল চৌধুরী ত' বেঁচে নেই?

বেঁচে নেই!—দীপ্তি যেন থমকে থতিয়ে গেল।

না মা,—তিনি ত' আট-ন'বছর আগেই মারা গেছেন। যুদ্ধের অনেক আগে। এসো মা আমি সেই বাড়িতেই ভাড়া থাকি।

ভদ্রলোক অগ্রসর হলেন। দীপ্তি চললো তাঁর পিছনে পিছনে। ওই চোখবন্ধ গলিপথটাই আঁকাবাঁকা। কর্পোরেশনের একটা আলো জলছে অনেক দূরে—কিন্তু তার আভা এতদূরে পৌছয় না। দেখতে পাওয়া যায়, এই গলি এখন অনেকগুলি বাড়ির পিছন দিকে প'ড়ে গেছে, সুতরাং বিচিত্র জঞ্জাল আর আবর্জনায় আনাগোনার পথ অনেকটা অবরুদ্ধ। ওদের নাকে দুর্গন্ধ লাগে না, স্তূপাকার আবর্জনায় ওদের অসুবিধা নেই, ওরা এতে অভ্যস্ত, এতে সুপরিচিত।

ভদ্রলোক বললেন, বোধ হয় তুমি নতুন এসেছো, তাই চিনতে দেরী হচ্ছে। আগের সেই কলকাতা এখন আর নেই। চেনা মানুষকেও চিনতে পারা কঠিন।

নাকের উপর থেকে রুমাল সরিয়ে দীপ্তি বললে, তেরো চোদ্দ বছর পরে এলুম। দেখতে পাচ্ছি সমস্তটাই ওলোট পালট।

হাসিমুখে ভদ্রলোক বললেন, এ গলিতে দিন দুপুরে লোক যেতো না, এত নির্জন। এখন লোক ধরে না। যে বাড়িতে পাঁচজন থাকতো, এখন সেখানে পনেরো জন। এই ত' শৈলেনদের কী কষ্ট—এতটুকু জায়গা নেই, তার ওপর অসুখ বিসুখ—

দীপ্তি বললে, শৈলেন! কোন্ শৈলেন?

কেন, যুগলবাবুর ভাইপো শৈলেন?

ওঃ—হ্যাঁ—দীপ্তি চুপ ক'রে গেল!

তারপর কয়েক পা এসে ভদ্রলোক বললেন, এই যে—পাশের দরজা,—তুমি ভেতরে যাও মা, ওরা আছে সবাই—

ভদ্রলোককে নমস্কার জানিয়ে দীপ্তি ভিতরে ঢুকলো। এবার সে যেন অনেকটা চিনতে পারলো। তবে একদা আলো-হাওয়া আর পরিচ্ছন্নতা ছিল এই প্রবেশ পথটায়, কিন্তু এখন অগণ্য ইমারতের চাপে আলো বায়ুহীন হয়ে ঘুটঘুট্টি হয়ে উঠেছে। যে উৎসাহ নিয়ে দীপ্তি এসেছিল, এখন আর সে উৎসাহ তার নেই। এখানে আসবার এমন কিছু দরকার ছিল না তার—হঠাৎ এসে পড়েছে এই মাত্র। এখনো ফিরে গেলে কেউ কিছু বলতো না!

পা চলছে না তার, —খোলা উঠোন যেটা ছিল, সেখানে এখন ছোট ছোট ঘর। অসংখ্য অপরিচিত নরনারী এক একটি খোপে আশ্রয় ক'রে রয়েছে। অর্ধনগ্ন বুভুক্ষু শিশুরা, রুগ্না মেয়েরা, বাসাড়ে পুরুষের দল—তাদেরই মাঝে মাঝে এক একটি ছোট ছোট উনুন জলছে। থলে টাঙানো, কাঁথা শুকানো, ছেঁড়া কাপড় ঝোলানো—তার নীচে কোথাও ভাত তরকারী ঢালা, কোথাও পচা মাছের গন্ধ, কোথাও নোংরা জ'মে উঠেছে অনেকদিনের। বাতাসটা বীভৎস!

দীপ্তি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলো, শৈলেনবাবুরা কোন্ ঘরে থাকেন?

এক বৃদ্ধা জবাব দিল, ওইদিকে যাও বাছা!

কে গা?

জানিনে। বাড়িঅলার কেউ হবে!

ঘর ভাড়া চায় নাকি?

শূয়োরের খোঁয়াড়ে আর জায়গা কোথায়?—কলতলার ধার থেকে একটি লোক গলা বাড়িয়ে মন্তব্য করে।

একজন বলে, বড় ঘরের মেয়ে। শাড়ির কী বাহার!

একটি মেয়ে বড় বড় চোখ ক'রে বলে, ওর গায়ে আতরের গন্ধ, মা! কী সুন্দর দেখতে!

দীপ্তি ততক্ষণে ভিতর দিকে চ'লে গেছে।

অবশেষে ঠিক জায়গাটিতে এসে দীপ্তি দাঁড়ালো। তাকে দেখে একটি রোগা বউ এগিয়ে প্রশ্ন করলো, কোত্থেকে এসেছেন?

সিল্কের রুমাল দিয়ে কপাল মুছে দীপ্তি হাসিমুখে বললে, বললে কি চিনবেন? আমি অনেক দূরের মানুষ!

কা'কে চান্ বলুন না?

শৈলেনবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

বউটি তাকালো দীপ্তির দিকে। তারপর বললে, তিনি একটু আগে আপিস থেকে ফিরেছেন।

আপনি তাঁর স্ত্রী বুঝি ?

হ্যাঁ।

দীপ্তি হেঁট হয়ে বউটির পায়ের ধূলো নিল। বউটি বললে, চিনতে পারলুম না ত' ? আসুন—তিনি শুয়ে পড়েছেন,—ডেকে দিই।

বউটি চ'লে গেল। পাশের কোন্ ঘর থেকে কাশির শব্দ আসছে। অত্যন্ত কঠিন যন্ত্রণাদায়ক একঘেয়ে কাশির আওয়াজ। কোথায় যেন মেয়ে পুরুষে ঝগড়া বেধেছে,—মাঝে মাঝে অশ্লীল কুশ্রী কটূক্তি ছুটে এসে কানে বিঁধছিল। এখানে দাঁড়ানো যায় না, বউটি ওকে বসতে বলেনি, অভ্যর্থনা জানায়নি। সমস্তটা মিলিয়ে দারিদ্র্যের কেমন একটা নিষ্ঠুর বৈরাগ্য নিস্পৃহভাবে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

একটু পরেই শৈলেনবাবু এসে উপস্থিত হলেন। বউটি হাতে একটি লণ্ঠন নিয়ে এসে দাঁড়ালো। শৈলেনবাবু একটু বিব্রতভাবেই যেন বললেন, ঠিক চিনতে পারছিনে ত' ?

দীপ্তি সহাস্যে বললে, চিনতে না পারলে এখনই চ'লে যাবো !

স্ত্রীর দিকে শৈলেনবাবু একবার তাকালেন। পড়ে বললেন, বাড়িতে এসেছেন,—আসুন, বসবেন। কিন্তু কই আপনাকে ত' আগে দেখিনি !

একটি ছোট বুকচাপা ঘরে এসে দীপ্তি বসলো। অসংখ্য ভাঙা জিনিসপত্রের ভিড়ে ঘরখানার দম যেন বন্ধ। একপাশে একটি আঁতুড়ে শিশু, এধারে ছেঁড়া লেপ আর ময়লা তোষকের কটু গন্ধে নিশ্বাস নেওয়া দুঃসাধ্য। নীচের তলা থেকে ধোঁয়া উঠে এসে ঘরের ভিতরটা যেন কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে।

বউটি অবাক হয়ে এই নবাগতা সুসজ্জিতা সুন্দরীর দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়েছিল। শৈলেনবাবু বললেন, আপিস থেকে ফিরে একটু শুয়ে না পড়লে পারিনে! প্রায় রোজই জ্বর হয়! কিন্তু আপনি কে ?

দীপ্তি অন্যমনস্কভাবে বললে, বাড়িটার চেহারা অনেক বদলে গেছে। নীচে ওরা কারা ? অত নোংরায় থাকে কেন ?

ওরা সবাই ভাড়াটে। তবে ভাড়ার টাকা আমরা ত' আর পাইনে,—বাড়ি আমাদের বিক্রি হয়ে গেছে অনেককাল !

আবার সেই কাশির শব্দ। এবার যেন আরো কাছাকাছি। ভাঙা গলায় কেমন একটা আর্ত স্বর, যেন বহুদিনের উপবাসী। দীপ্তি বললে, ও কে ?

শৈলেনবাবু বললেন, ও আমার এক মামাতো ভাই—

অসুখ বুঝি ?

ওর অসুখ তেমন কিছু নয়, তবে আমার মেজ ভাইটি বড্ড ভুগছে।

কিয়ৎক্ষণ চুপচাপ। তারপর দীপ্তি বললে, এবার আমাকে চিনতে পাচ্ছেন? ভালো ক'রে চেয়ে দেখুন ত'?

সহাস্যে শৈলেনবাবু বললেন, ক্ষমা করবেন, আপনাকে কখনো দেখেছি ব'লে মনে পড়ছে না। আপনি কি ঠিক আমাকেই খুঁজতে এসেছিলেন?

দীপ্তি হাসিমুখে বললে, যদি চিনতে না পেরে থাকেন তাহলে চ'লে যাবো, কেননা আমার পরিচয় দিলেও আপনি চিনবেন না!

শৈলেনবাবু বললেন, আপনি কি আগে আমাকে চিনতেন? কত বছর আগে বলুন ত'?

দীপ্তি বললে, তা প্রায় চোদ্দ বছর হ'ল বৈ কি। অবিশ্যি আপনি আমাকে দেখছেন আঠারো বছর পরে।

বউটি এবার ভিতরে এসে দাঁড়ালো। বললে, কোন কাজে এসেছেন কি?

দীপ্তি জবাব দিল, না, কাজ কিছু নয়। তবে অনেক বছর পরে দেশে ফিরলুম কিনা,—এখন আর কিছু চেনবার যো নেই।

শৈলেনবাবু বললেন, যুদ্ধের সময় কোথায় ছিলেন?

দীপ্তি বললে, সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়াতে ছিলুম। যুদ্ধ আমরা টের পাইনি।

মানে?

প্রায় চোদ্দ বছর আগে আমার কাকা সেখানে এক ছোট্ট সামন্ত রাজ্যে চাকরি নিয়ে চ'লে যান—আমরা ছিলুম পাহাড়ের কোলে এক গ্রামে, ছোট্ট নদীর ধারে—

সেখানে যুদ্ধের খবর যেতো না?

কাকা খবর পেতেন একটু আধটু,—আমরা কিছুই পেতুম না।

খবরের কাগজে?

দীপ্তি বললে, রাজবাড়ীতে নাকি কাগজ আসতো, আমরা জানতুম না। খুব আনন্দে আমাদের দিন কাটতো।

বাইরে ছেলেমেয়েরা চেঁচামেচি করছিল। বউটি বোধ করি তাদের থামাবার জন্য তাড়াতাড়ি চ'লে গেল। শৈলেনবাবু বললেন, আপনি এমন একটা দেশের খবর দিচ্ছেন, যেটা আমাদের কাছে স্বর্গ।

দীপ্তি বললে, স্বর্গ কেন বলুন ত'?

শৈলেনবাবু বললেন, এখানকার নরকে আপনাদের কিলবিল করতে হয়নি, এই আপনাদের সৌভাগ্য।

দীপ্তি বললে, আপনি বিয়ে করেছেন ক'দ্দিন ?

তা প্রায় বছর বারো হ'ল।

ছেলেপুলে ?

শৈলেনবাবু বললেন, গত মাস পর্যন্ত ছয়টি ছিল, এমাসে পাঁচটি।

দীপ্তি তাঁর মুখের দিকে তাকালো। শৈলেনবাবু বললেন, খুব দুঃখিত হইনি। কোলের মেয়েটি আধ সের ক'রে দুধ খেতো, সেই খরচটা এখন আমার বাঁচে।

আপনার বয়স কত এখন ?

শৈলেনবাবু বললেন, আমার ধারণা ছত্রিশ, কিন্তু বন্ধুরা বলে, আমি নাকি বয়স লুকিয়ে বেড়াই। তারা বলে, আমার বয়স ছাপ্পান্ন !

মৃদুকণ্ঠে দীপ্তি বললে, আমিও তাই বলি !

এমন সময় বছর দশেকের একটি মেয়ে এসে দাঁড়ালো। বললে, বাবা !

মুখ বিকৃত ক'রে শৈলেনবাবু বললেন, কি ?

তুমি ডাক্তারের ওখানে যাবে না ?

না, ডাক্তার গুলে খাওয়ালেও ওর কিছু হবে না, – যা তুই।

মেয়েটি চ'লে যাবার পর দীপ্তি বললে, কার অসুখ ?

শৈলেনবাবু বললেন, আমার স্ত্রী ব'লে যিনি পরিচিত – তাঁর ! ওই যাঁকে দেখলেন এতক্ষণ।

কি হয়েছে ?

প্রত্যেক গরীব কেরানির বৌ'রা যেসব অসুখে ভোগে,···সেই সব। তবে আশ্চর্য কি জানেন ? বাঁচবে ঠিক।

কেমন ক'রে জানলেন ?—দীপ্তির করুণ চাহনি উৎসুক হয়ে উঠলো।

শৈলেনবাবু বললেন, ঠিকই বাঁচবে। ওরা যে বাঙ্গালীর মেয়ে—ইস্পাতে গড়া। দারিদ্র্যে গ'লে যাবে, কিন্তু হঠাৎ ভাঙ্গবে না। কঠিন প্রাণ ওদের।

দীপ্তি চুপ ক'রে রইল। হঠাৎ আবার ওঘর থেকে সেই হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে ভয়ানক কাশির আওয়াজ। সে রুমাল দিয়ে মুখখানা আর একবার মুছে নিল। এই গলিতে ঢুকে পর্যন্ত বুক ভ'রে একবারও সে নিশ্বাস নেয়নি, কোথায় যেন সেটা বেধে গেছে। এক সময়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে সে বলে, এত লোক আপনারা এক বাড়িতে থাকেন ?

শৈলেনবাবু বলেন, লোক অবিশ্যি বেড়ে গেছে। আগে এত বড় বাড়িতে থাকতো জন কুড়ি, – এখন ভাড়াটেদের সব মিলিয়ে প্রায় সত্তর জন। দু'বছর

আগে ম্যালেরিয়ায় মরেছে ন'জন, — গেল বছর কলেরায় দু'জন — । এ বছর জেনে রেখেছি কে কে যাবে।

দীপ্তি তাঁর দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইলো। শৈলেনবাবু বললেন, আমার মেজভায়া কাজ পেয়েছিল এক কারখানায়, এখন আর কাজটা নেই। কিন্তু কাজ না থাকলেও কাশির ব্যামো থাকবে না কেন? ওটা যে কোন্ জাতের কাশি তাও জানি! সন্ধ্যের পর নিরানব্বই ডিগ্রি জ্বর ওঠে।

উনি চুপ ক'রে আছেন?

শৈলেনবাবু বললেন, তা, না থাকবে কেন? পয়সা ধার ক'রে সোজা বাজারের দিকে যায়। লুকিয়ে মাখন আর ডিম কিনে খায়। হঠাৎ খেতে আরম্ভ করে দামি জিনিস! কিন্তু এমন দিনও আসে, লিভার যখন আর ভালো জিনিস নিতে চায় না!

দীপ্তি প্রশ্ন করলো, আপনার মেজ ভাইয়ের স্ত্রী কোথায়?

ঈশ্বর তাঁকে অনুগ্রহ করেছেন।

মানে?

শৈলেন বললেন, গত বছর একটি শিশু প্রসব করে সেই দেড় টাকা দামের হাসপাতালের বিছানাতেই মারা যায়। আর সেই শিশু ছেলেকে আমরা এক জায়গায় বিলিয়ে দিয়ে আসি।

দীপ্তি কিয়ৎক্ষণ চুপ ক'রে থাকে। তারপর এক সময়ে বলে, মনে করেছিলুম আপনারা খুব আনন্দেই আছেন। অনেককাল পরে তাই কলকাতায় এসে আপনাদের দেখতে ইচ্ছে হ'ল। কিন্তু এখানে এসে—

বাইরে পায়ের শব্দ হ'ল। শৈলেনবাবুর স্ত্রী এসে আবার দরজার কাছে দাঁড়ালেন। দীপ্তি এতক্ষণ পরে ভালো ক'রে তাকালো তার দিকে। মুখখানা ফোলা-ফোলা, — ওটা রক্তহীনতার চিহ্ন। চেহারা কঙ্কালের মতো, সুদীর্ঘকাল অখাদ্য ভোজন আর অতিপ্রসবের ফলে যেমন চেহারা দাঁড়ায় — ঠিক তেমনি। বউটি যেন হাঁড়ির ভিতর থেকে আওয়াজ করলো, আপনাকে একটু চা দেবো?

দীপ্তি বললে, না বৌদি, চা আমি খাইনে।

বৌদি বললেন, এবার আপনাদের চেনাচিনি হয়েছে?

শৈলেনবাবু বললেন, না, অনেক চেষ্টা করেও ওঁকে মনে পড়ছে না।

মনেই পড়লো না, অথচ দুঘণ্টা ধ'রে আলাপ চললো? এটা ত' ভারি মজার ব্যাপার দেখছি? — বৌদি বিস্মিতভাবে উভয়ের দিকে তাকালেন!

দীপ্তি বললে, আমার কাকার নাম সুধীর রায়। মনে পড়ছে?

শৈলেন বললেন, না। এ নাম শুনিওনি কখনো।

আচ্ছা দাঁড়ান, —আপনার ছোট পিসিমা কোথায় বলুন ত' ?

ছোট পিসিমা ?—শৈলেন বললেন, আমার এক পিসিমা এখানে ছিলেন বটে তবে তাঁকে এখান থেকে সরিয়ে দিতে হয়েছে।

দীপ্তি মুখ তুলে তাকালো।

বউটি বললে, কেন তুমি এত বাজে কথা আলোচনা করছ ?

শৈলেন হেসে বললেন, যে কলঙ্কটা আজকাল অনেক ঘরে সত্যি, সেটা প্রকাশ করাই উচিত। পিসিমা মাঝ রাত্তিরে উঠে কয়লা চুরি করতেন ওঘর-সেঘর থেকে,—একদিন ধরা প'ড়ে যান—

কয়লা চুরি!—দীপ্তি অবাক হয়ে তাকালো।

কয়লা চুরি, ভাত চুরি, ওষুধ চুরি! নীচেকার ভাড়াটেরা আবার এঘর-ওঘর থেকে রাঁধা তরকারিও চুরি ক'রে খায়।

দীপ্তি এবার আর হাসি চাপতে পারলো না। কিন্তু তার সেই সুন্দর হাসি দেখেও শৈলেনবাবু বললেন, সেদিন পাশের বাড়ির একটি মেয়ে ওপাশের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে ধরা প'ড়ে গেল।

কেন ?

ধুতি চুরি ক'রে আনতো মেয়েটা, সেই ধুতি পাঠাতো দোকানে। তারা ছাপা রঙীন শাড়ি বানিয়ে দিত। এখানে চুরি বড় নয়, ধরা পড়া বড় নয়—ভদ্রঘরের মেয়ের পক্ষে লজ্জা নিবারণের চেষ্টাটাই বড়। কত নীচে নামিয়েছে আজ, কত যে ছোট ক'রে দিয়েছে!

শৈলেনের স্ত্রী এই অপমানজনক গল্পের সামনে আর দাঁড়াতে পারলেন না, —মুখ ফিরিয়ে নিজের কাজে চ'লে গেলেন।

বুঝতে পারা যায়, এই মেয়েটি আসার জন্য আশেপাশে কতখানি কৌতূহল-কানাকানি চলছে। কেউ উঁকি দিচ্ছে, কেউবা জানলার পাশে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছে। কারো পরনে গামছা, কেউ পরেছে লুঙ্গি, কেউ বা ছেঁড়া বিছানার চাদর জড়িয়ে এসে দাঁড়িয়ে গেছে। যে দু'তিনটে ছেলেমেয়ে নিতান্তই উলঙ্গ, তারা ধমকের ভয়ে সামনে আসতে সাহস করছে না।

নতমুখে দীপ্তি কিয়ৎক্ষণ ব'সে রইলো। পরে মুখ তুলে বললে, এমন ক'রে কতদিন চলবে আপনাদের ?

শৈলেন হেসে বললেন, সামনের চৈত্রমাস পর্যন্ত।

তারপর ?

আশা ক'রে আছি কলেরা আর বসন্ত এবার সবাইকে একসঙ্গে ঝেঁটিয়ে নিয়ে যাবে। মুশকিল হবে, যদি কেউ বেঁচে থাকে।

উত্তেজিত হয়ে দীপ্তি বললে, এর কি কোন প্রতিকার করতে পারেন না?

শৈলেন ভ্রুকুঞ্চন ক'রে বলেন, প্রতিকার মানে?

মুখ বুজে সমস্ত সহ্য করবেন? প্রতিবাদ করবেন না? মাথা তুলে দাঁড়াবেন না?

শৈলেন বললেন, ক্ষমা করবেন, আপনার উচ্ছ্বাসের কোন দাম নেই। এক যুগ সহ্য করে, পরের যুগ উঠে দাঁড়িয়ে মারে। প্রতিকার কি শুনি? রাস্তায় দাঁড়িয়ে চেঁচামেচি করবো?

বিপ্লব বাধিয়ে তুলুন। আগুন জ্বালান। ভেঙ্গে চুরে দিন।

অত্যন্ত চটকদার কথা!—শৈলেন বললেন, আপনি মেয়ে-গোয়েন্দা কিনা, এখনও বুঝতে পাচ্ছিনে। আপনি আমার অপরিচিত। এখানে কেউ আপনাকে চেনে না, আপনার পরিচয় জানে না। এতটা ঘরের খবর সংগ্রহ ক'রে কী লাভ আপনার তাও বুঝতে পাচ্ছিনে। আপনি আমার ঘরের মধ্যে এসে বসেছেন, আত্মীয়তা করবার চেষ্টা করছেন,—আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে সম্ভ্রান্ত ঘরেরই মহিলা। অথচ আপনার মতলব যে ঠিক কি, এখনও বুঝতে পাচ্ছিনে। এখন আবার বিপ্লব আর রাজনীতির কথা তুলছেন। তবে শুনুন বলি। খবরের কাগজের দাম দু'আনা—মাসে তিন টাকা বারো আনা—সুতরাং কাগজ পড়া আমার সাধ্য নয়। আর বিপ্লব! ওটা এখন ইস্কুলের ছেলেদের মুখের বুলি। আমার স্ত্রীর সূতিকা, আমার সর্দিজ্বর লেগেই আছে, ছেলেমেয়েগুলো খেতে পায় না, বন্ধুবান্ধবের কাছে ধারে মাথা বিকিয়ে আছে,—তা ছাড়া রেশনের কাঁকরমণি চাল তেঁতুলবিচির গুড়ো মেশানো আটা, সরষের গন্ধ মেশানো রেপ অয়েল, ভেজিটেবল ঘি স্বপ্নেও খাইনে, দুধ মানে শাদা রং ধরানো জল,—এ সবের পর বিপ্লব! আপনি কি আমার মনে মিথ্যে উত্তেজনা এনে পুলিশে ধরিয়ে দিতে চান? তার চেয়ে কলেরা বসন্তের মড়কে যদি যেতে পারি, সেই ভালো। সে বরং ম'রে বাঁচবো।

এমন সময় শৈলেনের স্ত্রী একটি কলাইয়ের থালা আর এক গ্লাস জল নিয়ে এসে দাঁড়ালেন। শৈলেন বললেন, কী ওটা?

স্ত্রী বললেন, নতুন মানুষ এসেছেন বাড়িতে, আমাদের ভাগ্য। সামান্য একটু মিষ্টিমুখ ক'রে যান।

শৈলেন বললেন, রাখো ওইখানে। এবার বুঝি খাবারের দোকানে ধা[illegible]
করতে আরম্ভ করেছ ?

তোমার অত কথায় দরকার নেই।—স্ত্রী রাগ ক'রে বললেন, ওঁকে বকিয়েছ
অনেকক্ষণ।—আসুন, একটু মিষ্টিমুখ করুন।

দীপ্তি বললে, আবার এত কষ্ট ক'রে আনালেন বৌদি ?

তা হোক। একটু মুখে দিন।

শৈলেন বললেন, নীচে অত হট্টগোল কিসের ?

স্ত্রী জবাব দিলেন, সুষমার দেওর আপিস থেকে ফিরে রক্তবমি
করছে।

রক্তবমি।—দীপ্তি যেন শিউরে উঠলো।

শৈলেন বললেন, আনন্দের কথা। তাহলে শরীরে ওর এখনো রক্ত আছে।
বেচারীর চাকরিটা যাবে এই দুঃখ !

এ মাসের মাইনেটা পাবে না, তাই ওর বউ কান্না নিয়েছে।—ব'লে
শৈলেনের স্ত্রী বেরিয়ে চ'লে গেল।

শৈলেন বললেন, এর পর খেতে ইচ্ছে করবে আপনার ?

দীপ্তি বললে, বৌদিদির অনুরোধ অমান্য করতে পারবো না।—এই ব'লে
সে মিষ্টান্নের থালার দিকে অগ্রসর হয়ে এলো।

শৈলেনবাবু একবার এদিক ওদিক তাকালেন। তারপর সহসা অগ্রসর হ[illegible]
এসে জলখাবারের থালাটি দীপ্তির মুখের সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে বললেন,
আমার ছেলেমেয়েরা ছ'মাসের মধ্যে দোকানের ভাল খাবার খেতে পায়নি। [illegible]
খাবার তারাই খাবে। আপনারা সুখী, ভোগী—দু'আনার মিষ্টি আপনার [illegible]
খেলেও চলবে।

দীপ্তি হাসিমুখে তাকালো। বললে, এইটিই কি একমাত্র কারণ ?

আর একটা কারণ আছে। এই নরককুণ্ডের কোন খাদ্য আপনার মু[illegible]
না ওঠে। এখানকার ছোঁয়াচ আপনাকে লাগতে আমি দেবো না। এখানকা[illegible]
হাওয়ায় মৃত্যুর বীজাণু ভেসে বেড়ায় দিনরাত।

দীপ্তি আড়ষ্টভাবে একবার ঘরের বাইরে তাকালো। তারপর বললে, আচ্ছ[illegible]
এবার আমি উঠি। রাত্তির হয়েছে। আমাকে অনেক দূর যেতে হবে। দ[illegible]
ক'রে আমাকে গলির পথটা দেখিয়ে দিন।

হ্যাঁ—চলুন। ব'লে শৈলেনবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

ঘরের বাইরে এসে দীপ্তি বললে, বৌদিকে ব'লে যাওয়া হ'ল না।

শৈলেন স্পষ্টকণ্ঠে বললেন, আপনি আমাদের কাছে এতই অপরিচিত যে, লৌকিকতার কথাই ওঠে না। তা ছাড়া—

তা ছাড়া কি বলুন ত'? দীপ্তি হেসে তাকালো।

আমার স্ত্রী যে আপনার আলাপে আর আচরণে খুব খুশী হয়েছেন, এ না-ও হ'তে পারে। গরীবের আঁস্তাকুড়ে কোন বড়ঘরের মেয়ের পক্ষে এসে দাঁড়ানোও গরীবের পক্ষে অপমান।—আসুন, একটু সাবধানে নামবেন।

আশপাশে উদগ্র সবাই ব্যাকুলতায় ঝুঁকে পড়ছে। রুগ্ন, অথর্ব, জরাগ্রস্ত ক্ষুধাতুর—সকলে এসে দাঁড়িয়েছে ওই সঙ্কীর্ণ পথের দুধারে। ওরা চোখ ভ'রে দেখে নিচ্ছে একটি স্বাস্থ্যবতী সুশ্রী মেয়েকে, মন ভ'রে লেহন ক'রে নিচ্ছে একটি সৌন্দর্যস্বরূপিণীকে—ওদের বাসনা, ওদের কামনার আর অন্ত নেই। নোংরায় আবর্জনায় দুর্গন্ধে দারিদ্র্যে অপমানে ওরা সবাই ছোট ছোট খোপের মধ্যে কিলবিল করছে। ক্ষণকালের জন্য ওদের চোখের সামনে দিয়ে একটি আলো স'রে যাচ্ছে,—তারপরে একে একে ওরা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হ'তে লাগলো।

দরজার কাছে এসে দীপ্তি বললে, গলিটা বড় অন্ধকার।

শৈলেন তখনই জবাব দিলেন, কণ্ট্রোলের কেরোসিন,—আলো দেখাবার মতো সংস্থান আমাদের নেই। বরং দেওয়াল ধ'রে ধ'রে হাঁটুন।

চোখ-বন্ধ গলিপথের বাইরে এসে দীপ্তি হাঁপ ছাড়লো। এতক্ষণ যেন একটা গুহাগহ্বরের মধ্যে সে প্রবেশ করেছিল। এবার সহজ কণ্ঠে সে বললে, আমি বোধহয় অচেনাই র'য়ে গেলুম?

সম্পূর্ণ!

দীপ্তি হাসলো। হেসে বললে, তবে এসেছিলুম কেন?

শৈলেন বিদ্রূপ ক'রে বললেন, গরীবদের জীবনযাত্রায় অনেক মজা আছে, সেটা উপভোগ করতে অনেকের ভালোই লাগে। অনেক লোক সখ ক'রে হাসপাতাল দেখতে যায় বৈ কি!

দীপ্তি বললে, বৌদি আমার কথাবার্তায় খুশী হননি—একথা কি সত্যি?

মেয়েমানুষের মনের কথা মেয়েমানুষই বোঝে!

কিন্তু আমাকে দেখে আপনি কি একটুও খুশী হন নি।

বিন্দুমাত্র না।—শৈলেন জবাব দিলেন।

দীপ্তি বললে, আঠারো বছর পরে আমি যে আপনাকে খুঁজে বার করেছি, তার জন্যে ছোট্ট একটু ধন্যবাদ?

শৈলেন একটু থেমে বললেন, খুঁজে আমাকে পাওয়া গেল, এজন্যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত!

কথা কইতে কইতে ওরা এসে পড়েছে পার্কের ধারে। সেখানকার রেলিংয়ের পাশে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে দীপ্তি বললে, কেন?

শৈলেন বললে, আমার অপমানিত চেহারাটা তুমি নাই দেখতে?

দীপ্তি বললে, আমি জানতুম না, এত যে বদলেছে সব—কিছুই জানতুম না। একদিন তোমার বয়স ছিল কুড়ি-একুশ, আর আমার সতেরো-আঠারো,—সেদিনকার সেই আগুন-ঝরা দিন, আর জ্যোৎস্নায় কাঁদানো রাত!

শৈলেন বললে, তুমি বিয়ে করোনি কেন?

দীপ্তি বললে, সময় পেলুম কোথায়? ডাক্তারী পাস ক'রে চাকরী নিলুম, সেই থেকে বিদেশে-বিদেশেই ঘুরছি।

কিন্তু বিয়ে করতে লাগে মাত্র একটা দিন।

দীপ্তি হেসে বললে, তা জানি। তবে বিয়ে করবো কিনা একথা ভাবতে একটা জীবনও কেটে যায়।

শৈলেন হেসে বললে, হঠাৎ এই গরীব বেচারীকে মনে পড়লো কেন?

দীপ্তি বললে, খেয়াল হঠাৎই হয়। কলকাতায় আসতে হ'ল সরকারী কমিশনে। ভাবলুম তোমাকে খুঁজে বার করা যাক্। এমনি—যাকে বলে কৌতূহল। মন্দ কি, দেখা হয়ে গেল। কালকেই আমাকে চ'লে যেতে হবে।

পথের দিকে তাকিয়ে শৈলেন বললে, তোমার রাত হয়ে গেল দীপ্তি।

হ্যাঁ, এই যাই—ওই যে ট্রাম আসছে—আচ্ছা, ঘরে ব'সে আমাকে তুমি চিনতে চাইলে না কেন বলো ত'?—দীপ্তি বাঁকা চোখে তাকালো।

শৈলেন বললে, আগে বলো আমাকে তুমি খুঁজে বার করতে পেরেছ কি না?

দীপ্তি বললে, না, সম্পূর্ণ পারিনি। ফু দিলে তোমার মধ্যে এখনও আগুন পাওয়া যায়, কিন্তু ছাইগুলো আমারই মুখে লাগে।

শৈলেন বললে, যাবার আগে একটা অনুরোধ জানাবো।

কি?—দীপ্তির কণ্ঠে ঔৎসুক্য ঘনিয়ে উঠে।

আর কখনো আমাকে খুঁজো না। খুঁজলেও পাওয়া যাবে না।

দীপ্তি বললে, সে আমি জানি। কবরের মাটি খুঁড়ে যাকে পেলুম সে বেঁচে নেই।

শৈলেন যোগ ক'রে দিল, আঠারো বছর আগে সেই অভিমানী ছোকরা

যেন চেয়েছিল, কিন্তু পায়নি। বছর বারো আগে বিয়ের ফাঁস গলায় দিয়ে সে আত্মহত্যা করেছে।

জবাব একটা কিছু দীপ্তির অধরের কিনারায়, কিন্তু ট্রাম এসে পড়েছিল, —তাড়াতাড়ি সে গিয়ে গাড়িতে উঠে পড়লো।

শৈলেন সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলো একদৃষ্টে পথের দিকে চেয়ে। এক সময় পকেট থেকে একটা বিড়ি বার ক'রে মুখে দিয়ে সে টানতে লাগলো। ছয়টি সন্তানের পিতা সে, একটি বর্ষীয়সী নারীর স্বামী সে,—এবং চল্লিশ বছরের প্রৌঢ়ত্বে এসে পৌচেছে। প্রাচীনকালের একটা ছেলেমানুষী নিয়ে লোফালুফি করা তার পক্ষে এখন বেমানান।

দূরের পথের দিকে একাগ্রচক্ষে তাকিয়ে বার বার বিড়িটানার পর তা'র হুঁস হ'ল, বিড়িটা সে এখনো ধরায়নি। হঠাৎ বিরক্তি আর অস্বস্তিতে তার মুখখানা বিকৃত হয়ে আসে—তারপর বিড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে হন্ হন্ ক'রে বাড়ির দিকে চলতে থাকে।

আলো

মহানগরের উপকণ্ঠে কোন এক অখ্যাত পল্লীর প্রান্তে এই বৃহৎ বাড়িটির ভগ্নাবশেষকে এককালে অট্টালিকা বললে হয়ত ভুল হ'তো না। বাড়িটি ছিল তিন মহলা, এখনও আন্দাজ করা কঠিন নয়। কিন্তু ইমারতের আরম্ভ এবং শেষ কোথায় তা আজও ঠাহর করা শক্ত। চারিপাশে মস্ত বাগান আর গাছপালা, এখানে ওখানে ভগ্নস্তূপের জটলা, সদর-অন্দরের মাঝখানে নানা অলি-গলি, অন্ধি-সন্ধি। কোথাও বোল্‌তা আর মৌমাছির চাক, কোথাও চামচিকা আর বাদুড়ের বাসা, আবার কোথাও বা গোলা পায়রা আর কয়েকটা ঘুঘু স্বচ্ছন্দে তাদের আবাস নির্মাণ ক'রে নিয়েছে। এই অঞ্চলের লোক প্রায় সকলেই জানে, বিষধর সাপের বাসা আর শৃগালের কোটরের জন্য এই বিশাল বাড়িটি কুখ্যাত। কেউ কেউ বলে, একশো বছরের মধ্যে এ বাড়িতে কোনো মানুষ বাস করেনি। বিস্তৃত বাগানের প্রান্তে ভাঙ্গা সীমানা-প্রাচীরের ভিতর দিয়ে যারা সহজ পথ বানিয়ে বাড়িটির ধার দিয়ে আনাগোনা করে, তারা অনেকেই বলে একশো বছর না হোক, পঞ্চাশ বছর ত' বটেই।

কথাটা কিন্তু সত্য নয়। এ বাড়ির সর্বশেষ মালিক বিমলাক্ষ এই সেদিনও তার অন্তিম শয্যা পেতে এই ভগ্নস্তূপের মাঝখানে কোন্ একটা কক্ষে তার শেষ নিঃশ্বাস ফেলে গিয়েছে। সে-ই ছিল এখানকার শেষ প্রদীপ। সে আজ মাত্র বছর দশেকের কথা। আজ সন্ধ্যায় তারই মৃত্যুবার্ষিকী পালন করার জন্য একটি ছোটখাটো সভার আয়োজন করা হয়েছিল।

এ পল্লীর কোন লোক বিমলাক্ষর আসল পরিচয় বিশেষ কিছু জানতো না। মৃত্যুতিথি পালনের জন্য যারা এসে জড়ো হয়েছে তারা প্রায় সবাই বাইরের লোক এবং এককালে তারাই ছিল বিমলাক্ষর অন্তরঙ্গ। বিমলাক্ষ বিবাহ করেনি এবং পুরুষের পক্ষে যা আরও বিচিত্র, জীবনে উপার্জনও কখনো করেনি। তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হ'লো গোটা দুই ভাঙ্গা আলমারী জোগাড় ক'রে কয়েকখানা বই সংগ্রহ করে রাখা এবং তারই শয়নকক্ষের এক প্রান্তে একখানা ছেঁড়া মাদুর পেতে পাড়ার চার পাঁচটি নাবালককে লেখাপড়া শেখানো। কোন্

বিদ্যা কাকে সে শিখিয়েছিল কে জানে, কিন্তু সেই নাবালকদের থেকে একটি ছেলেই নাকি আজকের এই সভার আয়োজন ক'রে বিমলাক্ষর কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে খবর দেয়।

ব্যাপারটা হাস্যকর সন্দেহ নেই। দেশের বড় বড় রথী-মহারথীর জন্মতিথি আর মৃত্যুবার্ষিকীতে আজকাল লোক জড়ো হতে চায় না। এযুগে বীরত্ব খ্যাতি কীর্তি কতদিকে কত মিথ্যা হয়ে চলেছে, প্রচলিত বিশ্বাস আর নীতিবোধ ভেঙ্গে যাচ্ছে মানুষের মনে, সংশয়ের থেকে জন্ম হচ্ছে অবিশ্বাসের,—সুতরাং অখ্যাত নগণ্য বিমলাক্ষর মৃত্যুতিথি পালনের এই ছেলেমানুষী মতিভ্রমের অর্থ কি হতে পারে, এ নিয়ে অনেকের মনেই প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু যারা আজকের এই ক্ষুদ্র সভার আয়োজন করেছিল, তাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা অনুরাগ এবং অধ্যবসায়ের প্রবাহে এ প্রশ্ন ভেসে গিয়েছিল।

চারিদিকের গাছপালা আর ঝোপজঙ্গলের চক্রাকার এই প্রাচীন ভিটাকে বছরের প্রায় সমস্ত সময়টাই একরূপ লোকচক্ষের অন্তরালে রেখে দেয়। আজকে হঠাৎ তার এক প্রান্তের একটি কক্ষে কেমন ক'রে ইলেকট্রিকের আলো জ্ব'লে ওঠে, কেমন ক'রে জনসমাগমের গুঞ্জন শোনা যায়, কেমন ক'রে শবদেহের মধ্যে প্রাণের স্পন্দন ধুক ধুক করে,—এ বিস্ময় অনেকের পক্ষেই সামান্য নয়। সুতরাং অভ্যাগত এবং নিমন্ত্রিত কয়েকজন লোক ছাড়াও আশপাশের অনেকগুলি লোক অসীম কৌতূহল নিয়ে এই বিপজ্জনক জঙ্গল-জটলার এখানে ওখানে ভীড় করে দাঁড়িয়ে গেছে। স্থানীয় লোকেরা মনেও রাখেনি বিমলাক্ষকে, কিন্তু বাইরের লোকের মনে তার মৃত্যু আজও ঘটেনি। কেন ঘটেনি, কেমন প্রকৃতির লোক ছিল বিমলাক্ষ, কোন্ অমৃতের আস্বাদ সে রেখে গেছে বন্ধুসমাজে, কোন্ অবিনশ্বর কীর্তির অধিকারী সে, কি জন্য সে মহৎ, কেন তার জন্য মন কাঁদে,—এই সব প্রশ্নের উত্তর আজকের সভায় হয়ত পাওয়া যাবে!

বাগানের পশ্চিম দিকের চওড়া রাস্তাটা সোজা চ'লে গেছে কলকাতার মাঝখানে। হাল আমলের নতুন ফ্যাশনের বড় বড় বাড়িগুলি সবেমাত্র দুধারে তৈরী হয়েছে। ওই পথেরই কোন এক বাগানবাড়ির মালিক বিমলাক্ষদের এই বাগানবাড়িটি আত্মসাৎ করার চেষ্টায় ছিলেন। সুতরাং তাঁরই সাহায্যে বিমলাক্ষর উৎসাহী ছাত্রটি অনেকদূর থেকে ইলেকট্রিকের তার টেনে এনে আজকের সভাটিকে আলোকিত করেছে। যদিও ব্যাপারটা বে-আইনি, তবুও উৎসাহের অভাব ঘটেনি। ছোকরার কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে সন্দেহ নেই।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ, বোধহয় সেটি শুক্লপক্ষের সন্ধ্যা। দূরের থেকে সভায় আয়োজনটি দেখলে মনে হতে পারে, বিশালকায় প্রেতের একটি চক্ষু যেন আজ হঠাৎ জ্বল জ্বল ক'রে উঠেছে। আশ্চর্য, এরই মধ্যে তিন চারখানা চক্‌চকে মোটর এসে দাঁড়িয়েছে ওর পাশে। এসেছেন কয়েকজন অভিজাত সমাজের মহিলা, এসেছেন জনকয়েক সাহেবী ধরনের ব্যক্তি। আসরের এক প্রান্তে স্বর্গত বিমলাক্ষর একখানা ছবি,—সে ছবিটি শান্ত, মুখচ্ছবি স্নিগ্ধ। বিমলাক্ষর শুচিশুদ্ধ জীবনে যেমন কোনো মালিকের স্পর্শ লাগেনি, ছবিখানিও ঠিক তেমনি।

কয়েকটি ধূপ জ্বলছে ছবিটির দুই পাশে, কাছেই একটি পাত্রে একরাশি যুঁই ফুল, তারই পাশে একগোছা রজনীগন্ধার ডাঁটা, কয়েকখানি বই। সভায় নরনারীর শান্ত নীরবতা লক্ষ্য করবার বিষয়। দশ পনেরো বছর আগে যারা ছিল বিমলাক্ষর অন্তরঙ্গ,—আজ তাদের অনেকেই উপস্থিত, অনেকেই সন্তান-সন্ততির জনক, অনেকে মস্ত সংসারের প্রতিপালক। কারো চুল পেকেছে, কারো ললাটে ফুটেছে বলিরেখা, কারো কালি লেগেছে চোখের কোলে। মেয়েদের অনেকেই বয়সের আড়ালে আত্মগোপন করেছেন। কারো মুখে রং, কারো পাউডার, কারো পরিচ্ছদের চাকচিক্য, কারো বা মুখে সেই পনেরো বছর আগেকার অম্লান পরিচ্ছন্নতা। কিন্তু একটা যুগ মাঝখানে পেরিয়ে গেছে। কত যুদ্ধ-বিগ্রহ, রাষ্ট্রবিপ্লব, মড়ক মহামারী, কত আশ্চর্য পরিবর্তন কত সমাজে, —কিন্তু তবু সেই খ্যাতিহীন, কীর্তিহীন বিমলাক্ষর প্রতি ওদের শ্রদ্ধানুরাগ কমেনি। কেন কমেনি? কী ছিল বিমলাক্ষর চরিত্রে? কোন্ মন্ত্র সে দিয়ে গেছে? তার জন্য কতকগুলি নরনারীর কেন এই আকুলতা? কেন আজ হৃদয়ের ভিতর থেকে কান্না ওঠে তার বিরহে?

বিমলাক্ষ নাকি সত্যনিষ্ঠ ছিল, লোভ এবং আসক্তিকে সে নাকি কখনো আমল দেয়নি। সামান্য কাজ করতো সে বিনা পারিশ্রমিকে, কিন্তু কোনোদিন খ্যাতির পিছনে সে ছোটেনি! সে নাকি স্বপাক অন্ন গ্রহণ করতো এবং তার ব্রত ছিল নাকি সন্ন্যাস!

সন্ন্যাস! হঠাৎ কোনো বন্ধুর চোখ পড়লো আসরের পিছনের দিকে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রমীলা। বিমলাক্ষর সন্ন্যাসের সঙ্গে প্রমীলার যোগ কতটুকু, বিমলাক্ষ কেন সংসার রচনা করেনি, নগরের কোলাহল থেকে দূরে এসে কেন সে নিঃসঙ্গ নিভৃত অন্তিমকাল অতিক্রম ক'রে গেছে, এর সঠিক জবাব আজ কি প্রমীলার কাছ থেকে পাওয়া যেতো? শোনা যায়, বিমলাক্ষর

স্বভাবের শুচিতা, সত্যনিষ্ঠা এবং চরিত্রবত্তার জন্য প্রমীলা নাকি অনেকখানি দায়ী; শোনা যায়, প্রমীলা নাকি বিমলাক্ষকে তার আশ্চর্য ব্রতচারণে নিত্য অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। এও শোনা যায়, বিমলাক্ষর অন্তিমকালে প্রমীলা নাকি একআধবার এসে লোকচক্ষের আড়ালে তাকে দেখে গিয়েছিল। কিন্তু সেও দশ বছরের কথা। কে মনে রেখেছে এতকাল পরে সেই কাহিনী? বিমলাক্ষর জীবনরহস্যের মূলে এই নারীর কোন্ দুর্লভ প্রতিভা নিহিত ছিল, কেই বা তার খবর রাখে?

সভায় একটি গান হয়ে গেল। গানের সেই করুণ মূর্চ্ছনা যেন মৃত্যুর থেকে অমৃতলোকের দিকে। গানের পর কে যেন করুণ কাতর ভাষণে দুই একটি কথা বিমলাক্ষর সম্বন্ধে বলতে লাগলেন। বিমলাক্ষ ছিল সৎ ও আনন্দময়, ছিল মহৎ, ছিল সত্যবাদী। এ যুগে কি পাওয়া যায় তেমন লোক? সত্যিকার কি কাঁদে কারো মন পরের জন্য? কেউ কি মনেপ্রাণে নিষ্পাপ আছে একালে? কেউ জয় করেছে লোভ? কেউ ত্যাগ করেছে আসক্তি? এ যুগের মলিন্য-জর্জর জীবনের থেকে কি কেউ নিত্য চিত্তগ্লানিকে সরিয়ে রাখতে পারছি? ভয়, সংশয়, অশ্রদ্ধা, ঘৃণা — এদের গ্রাস থেকে আজ মুক্তি নেওয়া কি সম্ভব হচ্ছে?

কী গভীর শ্রদ্ধা সকলের প্রমীলার প্রতি। এই নারী আজ সকলের প্রণামের যোগ্য। এর মধ্যে কেউ কেউ জানে, যদি কোনোদিন বিমলাক্ষ বিবাহ করতো, তবে প্রমীলাই হতেন বিমলাক্ষর সহধর্মিণী। চিরকৌমার্য ব্রতধারিণী এই মহিলা সেই সন্ন্যাসী বিমলাক্ষর জীবনে কিছু আলোকসম্পাৎ করতে পারেন, এই দৃঢ় বিশ্বাস সভায় অনেকেরই আছে। সুতরাং এই অন্তরঙ্গ আসরে শ্রীযুক্তা প্রমীলাকে দুই একটি কথা বলার জন্য অনুরোধ জানানো হ'ল।

হঠাৎ একটি ঘটনা ঘটলো। বাইরে ঝড় বৃষ্টির একটা আয়োজন চলছিল, এতক্ষণ জানা যায়নি। এক ঝলক বাতাস আসতেই সহসা ইলেকট্রিকের আলোটা দপ ক'রে নিবে গেল। এই ভগ্ন প্রাচীন পুরীর একাংশের এই আসরটি যদি বা একটু আলোকিত হয়েছিল, একটু সাহস পাওয়া গিয়েছিল, — কিন্তু এই আকস্মিক দুর্বিপাকের ফলে আবার যেন সেই প্রেতলোকের ঘন নিরেট অন্ধকার সমস্তটাকে একাকার ক'রে দিল। যাঁদের সঙ্গে মোটর ছিল, তাঁদের দুর্ভাবনার কারণ নেই, কিন্তু যাঁরা বহুদূর থেকে এই সভায় এসেছেন, তাঁরাও শান্ত ও আত্মসমাহিতভাবে ব'সে রইলেন। কক্ষের মধ্যে বিরাজ করছে যেন করুণ মধুর শান্তি।

কেরোসিনের আলো অপেক্ষা মোমবাতি ভালো এই কথা অনেকে বললেন। আলোটা সহসা নিবে যেতে পারে একথা উদ্যোক্তাদের মনে ছিল না, সুতরাং হাতের কাছে মোমবাতিও তারা রাখেনি। এতক্ষণ পরে সজাগ হয়ে তারা অনেকেই মোমবাতির জন্য চেষ্টা করতে গেল। দোকানদানি এখান থেকে অনেক দূরে, বাজার তার চেয়েও দূরে। কিন্তু তা হোক দুটি ছেলে বাগান পেরিয়ে ছুটতে ছুটতে চ'লে গেল। কেউ কেউ ইলেকট্রিকের আলোটা ঠিক ক'রে দেবার চেষ্টা করলো, কিন্তু লাইনটায় কোথায় যে গোলমাল ঘটেছে ধরা গেল না।

অন্ধকারে সকলেই নিঃশব্দে বসেছিলেন। এপাশে বসেছেন মোহিত সেন, দেবেন রায়, মন্মথ লাহিড়ী এবং তাঁর স্ত্রী লীলা। তাঁদের পাশে বিমলাক্ষর দুই একজন আত্মীয়। ও-পাশে ব'সে রয়েছে বিমলাক্ষর আর একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু অজিনেন্দ্র রায়। অজিনেন্দ্র গত যুদ্ধে গিয়েছিল ইরাণদেশে। সেখান থেকে নাকি সুদূর প্রাচ্যে। কত দেশে সে দেখে এসেছে মৃত্যুর দাপাদাপি, সর্বনাশা ধ্বংসের চেহারা, প্রভুত্বলাভের অবিরাম সংগ্রাম। সে অজিনেন্দ্র আর নেই, যে ছিল বিমলাক্ষর অন্তরঙ্গ বন্ধু। অজিনেন্দ্র এখন মোটা চাকরি করে, অনেক টাকা উপার্জন করে, অনেক প্রকার জীবনের অভিজ্ঞতা তার। সেই দরিদ্র অজিনেন্দ্র এখন মোটর হাঁকায়, টেলিফোনে কথা কয়, পরনে তার বুশ-শার্ট, হাতে ব্ল্যাক-এণ্ড-হোয়াইটের টিন, দেহরক্ষী তার সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু তবু আজকের এই স্মৃতিসভায় বিমলাক্ষর প্রতি অসীম শ্রদ্ধা নিয়ে সে এসেছে, একথা জেনে এসেছে তার জীবনের সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধেয়া নারী প্রমীলার পদার্পণ এই সভায় ঘটবেই। আজ পরম সত্যাশ্রয়ী বিমলাক্ষর মৃত্যুতিথিতে পরম নিষ্ঠাবতী প্রমীলার দর্শন মিলবেই।

প্রায় আধঘণ্টা পরে কয়েকটি মোমবাতি নিয়ে সেই ছেলে দুটি ফিরে এলো। আলোটা হঠাৎ নিবে গিয়ে যে সুরভঙ্গ হয়েছিল, মোমবাতি জ্বালবার পরও মিনিট দুই গেল নতুন ক'রে সেই আবহ সৃষ্টি করতে। পাঁচটি মোমবাতি একত্র জ্বালানো হ'লো। কিন্তু তার আলো অতি মৃদু, অতি ক্ষীণ মনে হয়। আবছায়াময় কক্ষ, কেমন যেন ছায়াচ্ছন্নতা প্রাচীন দেওয়ালগুলিতে, কেমন যেন ভগ্নস্তূপের অদ্ভুত গন্ধ চারিদিকে। যেন এখানে প্রেতলোক আর নরলোকের সন্ধিস্থল, অর্ধসত্য আর মিথ্যায় যেন রহস্যময়, এখানে যেন একটা ক্ষীণ দৃষ্টি সংশয়াচ্ছন্ন যুগসন্ধির সংযোগ ঘটেছে। অত্যুগ্র আলোয় যে সকল নরনারীকে সত্য ও বাস্তব ব'লে জানা ছিল, এই প্রাচীন পটভূমির স্বল্পালোকিত কক্ষে তাদের

প্রত্যেকে যেন অস্পষ্ট ছায়াময়, অসত্য ও অসম্পূর্ণ হয়ে দেখা দিল। আর যেন তাদেরকে নির্ভুলভাবে চেনা যাচ্ছে না। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের চেহারা লক্ষ্য ক'রে একপ্রকার অস্বস্তিবোধ করতে লাগলো। অন্ততঃ আর কিছু না হোক, এ সভার কাজ তাড়াতাড়ি শেষ হলেই তারা খুশী হয়। বাইরে বনচ্ছায়ার অন্ধকার, মেঘমলিন আকাশে বৃষ্টির আভাস, ভিতরে মৃদুকম্পিত ভীরু প্রদীপের মলিন আভা—এর থেকে বেরিয়ে নগরের আলোকিত কোলাহলের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াতে পারলে ভালোই লাগবে সন্দেহ নেই।

শ্রীযুক্তা প্রমীলা দেবী এবার বিমলাক্ষর সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলবেন এজন্য সকলেই উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন। সত্য বলতে কি, সর্বপ্রধান আকর্ষণ হ'লো ওইটি। প্রমীলা জীবন-তপস্বিনী, প্রমীলা তেজস্বিনী,—সত্যের ঝলক একথা প্রমীলার কণ্ঠে ঠিক ঝলসে উঠতো। সাধারণ মেয়ে তিনি নন, সাধারণ বুদ্ধি নিয়ে তিনি চলেন না। বিমলাক্ষর মৃত্যুর পর কাকে যেন তিনি একখানা চিঠি লিখে জানিয়ে যান, আর কোনোদিন আমার খোঁজ নিয়ো না। আমি যেখানেই থাকি তোমাদের অবশ্যই মনে রাখবো, কিন্তু তোমরা আর কোনোদিন আমাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা কোরো না।

এর পর যুদ্ধ বেঁধে উঠলো ইউরোপে। উঠে দাঁড়ালো শয়তান,—অসুরের তাণ্ডব চললো দিকে দিকে। কত নৃশংসতা, অন্যায়, দুষ্ট চক্রান্ত, কত মনুষ্যত্বের বিকৃতি, কত মিথ্যা আর ভণ্ডামীর অভিযান—এই দশ বছরে ঘ'টে গেল। কিন্তু আর কোনোদিন প্রমীলার দেখা পাওয়া যায়নি।

কী অধঃপতন সভ্যতার, স্বভাবের কী নোংরামি, কত নীচে নেমে গেল বিমলাক্ষ আর প্রমীলার দেশের লোকরা। দুর্গতির মধ্যে ডুবে গেল, তলিয়ে গেল প্রলোভনের তলায়, নোংরামিতে পাঁকের মধ্যে কিলবিল করতে লাগলো। ওই ত' ওরা—মোহিত সেন, দেবেন রায়, মন্মথ লাহিড়ী। ওই ত' আবছায়া ঘেরা রিনি চৌধুরী, এনা গুপ্তা, ইরা সেন। ওই রয়েছেন লিপ্-ষ্টিক্ আর রুজমাখা কমলা রায়—যাঁর নাম র'টে গিয়েছিল দেশের ঘরে ঘরে। ওই ত' এসেছে রঞ্জিত তার সর্বশেষ প্রণয়িনীটিকে সঙ্গে নিয়ে। আজ কিন্তু সবাই চুপ—কেননা আজ প্রমীলার দর্শন পাওয়া গেছে। প্রমীলার দুর্লভ ব্যক্তিত্বের কাছে সবাই যেন আজ ছোট হয়ে যাচ্ছে।

অজিনেন্দ্র উদ্‌গ্রীব হয়ে বললেন, এবারে প্রমীলা দেবী দু'একটি কথা বলবা পর আমাদের সভার কাজ শেষ হতে পারে।

কিন্তু প্রমীলা তখন কোথা? অজিনেন্দ্র উঠে দাঁড়ালো। প্রমীলা যেখানে

বসেছিলেন সেখানে তিনি নেই। পাশের মহিলাটি বললেন, হ্যাঁ, আমারই পাশে তিনি মাথা হেঁট ক'রে চুপচাপ বসেছিলেন। তারপর হঠাৎ আলোটা নিভে যেতেই তিনি বললেন, আমি আলো এনে দিচ্ছি।—এই বলেই তিনি উঠে গেছেন। কই, আর ত' ফেরেননি?

কতক্ষণ গেছেন?

আধঘণ্টারও বেশী।

অজিনেন্দ্র একটু হতচকিত হয়ে বললেন, কই, আমরা ত' কেউ তাঁকে যেতে দেখিনি। কোথায় গেছেন বলতে পারেন?

মহিলাটি বললেন, আমি কেমন ক'রে বলবো বলুন!

কিন্তু······মানে, কোন্ পথ দিয়ে গেলেন তিনি?

মহিলাটি আর কোনো জবাব দিতে চাইলেন না। অজিনেন্দ্র বললেন, বন্ধুগণ, প্রমীলা দেবী আলো আনতে গেছেন কিন্তু এখনও ফিরলেন না কেন বুঝিনে। তা ছাড়া এ অঞ্চলে তাঁর জানাশোনা কোথাও কিছু নেই। তিনি কোথা থেকে আলো আনতে গেলেন, সেটা একটু আশ্চর্য বৈ কি। অথচ গেছেন তিনি, আধ ঘণ্টারও বেশী। বনবাগান পেরিয়ে তাঁর পক্ষে কতদূর যাওয়া সম্ভব বলতে পারিনে।

অজিনেন্দ্রর কথায় সভায় একটু চাঞ্চল্য দেখা গেল। প্রমীলা গেছেন অনেকক্ষণ,—এখনও দেখা নেই। এ অঞ্চল তাঁর অপরিচিত; হঠাৎ এই অন্ধকার বাগানের ভিতর দিয়ে তিনিই বা আলো আনতে গেলেন কেন, এটা বিস্ময়ের কথা বৈকি। সভার উদ্যোক্তারাও তাঁকে বেরিয়ে যেতে দেখেনি। শুধু তাই নয়, তিনি প্রথম থেকেই সকলের পিছনে আত্মগোপন ক'রে এমনভাবে বসেছিলেন যে, অনেকেই তাঁকে লক্ষ্য করেনি। নিতান্ত যে কয়জন প্রমীলাকে অন্তরঙ্গভাবে দশ বছর আগে দেখেছেন, তাঁরা ছাড়া প্রমীলা অপর কারো কাছেই পরিচিত নন। ব্যাপারটা এবার যেন একটু অস্বস্তিকর রহস্যে ভ'রে উঠলো।

সভার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু হতচকিত অজিনেন্দ্রর সবিস্ময় কৌতূহলের আর শেষ নেই। প্রমীলা এখানে এসেছিলেন বহুদূর থেকে। এসেছেন একা, যেতেও হবে তাঁকে একা। সঙ্গে কোনো যানবাহন নেই, সঙ্গী-সাথী নেই। সভার শেষে একে একে সকলেই বিদায় নিল। কিন্তু অজিনেন্দ্রর পক্ষে অত সহজে বিদায় নেওয়া সম্ভব ছিল না। সকলের পরে একটি মোমবাতি হাতে নিয়ে বিমলাক্ষর একটি ছাত্রকে সে বললে, এসো ত' ভাই একবার আমার সঙ্গে?

কোথায় যাবো, বলুন ?

এই বাড়িটা একবার ঘুরে দেখতে হবে।

কী বলছেন আপনি! ভেতরটা একেবারে দুর্গম, সাপখোপে ভরা। কেউ যায় না ভেতরে।

অজিন বললে, কিন্তু আলো আনতে তিনি গেলেন কোথা? একা মেয়েছেলে, এত রাত্রে! আমি ত' আর চুপ ক'রে চ'লে যেতে পারিনে, ভাই। তিনি কি বড় রাস্তার দিকে গেছেন ?

ছেলে দু'টি বললে, আমরা ত' বরাবরই এখানে আছি, কারোকেই বেরোতে দেখিনি। আমরা রাস্তা দেখিয়ে না দিলে এখান থেকে বেরোনো কারো পক্ষেই সম্ভব নয়, অজিনবাবু।

অজিন কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। তারপর মোমবাতির আলোয় মুখ তুলে বললে, তাহ'লে দুটো জিনিস আমাকে বিশ্বাস করতে হয়। হয় তিনি আজ একেবারেই আসেননি, নয়ত তাঁর ডানা গজিয়েছিল, ডানা মেলে তিনি উড়ে গেছেন, কিন্তু দুটোই সত্যি নয়, কেননা আমার মতো আরও তিন চারজন স্বচক্ষে তাঁকে ব'সে থাকতে দেখেছেন। আচ্ছা, এটা কি সম্ভব, তিনি ঘর থেকে বেরোতেই তাঁকে বাঘে ধ'রে নিয়ে গেছে ?

একটি ছেলে বললে, তিনি সশরীরে অন্তর্ধান করেছেন বরং বিশ্বাস করবো, কিন্তু বাঘে ধরেনি। বাঘ এদিকে নেই।

অজিনেন্দ্র উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে চারিদিকে তাকাতে লাগলো। আকাশ ততক্ষণে কিছু পরিষ্কার হয়েছে, জ্যোৎস্না দেখা দিয়েছে। সভাকক্ষের ভাঙ্গা দরজাটা সেদিনকার মতো বন্ধ ক'রে একটি ছেলে এবার এগিয়ে এসে বললে, আপনার গাড়ি ছিল, আপনি ত' সহজেই প্রমীলা দেবীকে পৌছে দিতে পারতেন ?

অজিন শান্ত কণ্ঠে বললে, সে ভাগ্য আমার নয়, ভাই।

কিন্তু এখানে আর দাঁড়িয়ে লাভ কি? তার কোনো চিহ্নই ত' দেখা যাচ্ছে না! তা ছাড়া তিনি যদি ফিরতেন, তাঁর হাতে আলোই ত' থাকতো!

তাঁর খোঁজ না করেই চ'লে যাবো ?

অজিন ব্যাকুলতা প্রকাশ করলো।

কোথায় খুঁজবেন? তিনি ত' ছেলেমানুষ নন্! এমনও নয় যে, তিনি কোথাও লুকিয়ে আছেন!

অজিন ধীরে ধীরে এসে তার গাড়িতে উঠে বসলো। ছেলে দু'টি আর

যেন থাকতে চাইছিল না। অজিন বললে, আচ্ছা ভাই তোমরা যাও, তোমাদের রাত হয়ে যাচ্ছে!

আপনি?

আমার ত' গাড়িই আছে, চ'লে যেতে পারবো!

ছেলে দু'টি নিশ্চিন্ত হয়ে এবার চ'লে গেল। তাদের ধারণা প্রমীলা চ'লে গেছেন অনেক আগেই। প্রমীলার পক্ষে এইপ্রকার অসামাজিকভাবে চ'লে যাওয়া সম্ভব কি না, একথা তারা ভেবে দেখলো না।

অন্ধকারে গাড়ির মধ্যে দীর্ঘক্ষণ অজিন ব'সে রইলো। আলো আনতে গেছেন প্রমীলা, আলোটা তাঁর হাতে থাকবে, এই বিশ্বাস নিয়েই অজিন ব'সে থাকলো। সিগারেট ধরালো একবার, সেই আলোয় ঘড়িতে দেখলো রাত নয়টা বেজে গেছে। ভগ্ন প্রাচীন প্রাসাদের ভিতর থেকে নানা অদ্ভুত কীটপতঙ্গের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। জনহীন পুরী, কিন্তু ভিতরে বিচিত্র অগণ্য প্রাণীদের সংসার। ইঁট কাঠের ফাটলে, সুড়ঙ্গে, মাটির নীচে, কোটরে জঠরে অসংখ্য জীবনের জটলা। অজিনও সেই দিকে তাকিয়ে নিশ্চল হ'য়ে ব'সে রইলো।

আলোটা এসে পৌঁছবে, এ আশ্বাস কম নয়। সেই আলোয় দশ বারো বছর আগেকার প্রমীলাকে সে চিনে নেবে। জীবনে মিথ্যা বলেনি, পাপ করেনি, লোভ আর আসক্তিকে আমল দেয়নি,—শুচিস্বভাবকে লালন ক'রে এসেছে প্রমীলা এযুগের সমস্ত মালিন্যের থেকে দূরে গিয়ে,—তাকে এতকাল পরে একবার দেখে নেওয়া দরকার বৈ কি। তা ছাড়া, সত্যি বলতে কি, স্মৃতি-সভায় বিমলাক্ষর স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তার অনেকখানিই সত্যি নয়। বিমলাক্ষর নানাবিধ অভ্যাস ছিল, নানাপ্রকার কুক্রিয়ায় সে অনেক সময় লিপ্ত থাকতো। এমন মাঝে মাঝে মনে হয়েছে তাকে হয়ত আর ভালো পথে ফিরিয়ে আনা যাবে না। কিন্তু ওই প্রমীলা, তাদের কলেজের সেদিনের সহপাঠিনী,—প্রমীলা চিনতে পেরেছিল বিমলাক্ষর মধ্যে খাঁটি ধাতু। কী যেন মন্ত্র সেদিন প্রমীলা উচ্চারণ করেছিল,—বিমলাক্ষ দেখতে দেখতে নতুন পথে বাঁক নিল। আশ্চর্য বিমলাক্ষর সেই পরিবর্তন, সেই বিচিত্র রূপান্তর। সে বন্ধুদের ছাড়লো, ছাড়লো তার সেই সমাজ, ছাড়লো তার পক্ষে নিন্দনীয় যা কিছু। সোজা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে চ'লে এলো এই প্রাচীন ভগ্নস্তূপের জটলার মধ্যে।

শৃগালের ডাকে অজিনের চমক ভাঙ্গলো। এখানে এমন ক'রে থাকার আর

কোনো হেতু নেই। বারো-তেরো বছর ধরে যে-প্রমীলার কোনো খবর সে পায়নি, যেমন সে একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল, আজও তেমনি পলকের জন্য দেখা দিয়ে সে আবার গা ঢাকা দিল। তার জীবনে এবারও একটা অদ্ভুত বিস্ময় জমা রেখে সে চ'লে গেল।

হাতঘড়িতে অজিন দেখলো রাত দশটা বেজে গেছে। অন্ধকারে গাড়ি নিয়ে ব'সে থাকা বাতুলতা। অজিন এবারে মোটরে ষ্টার্ট দিল। তারপর আস্তে আস্তে খানিকটা পিছনে হটিয়ে সে গাড়ি ঘুরিয়ে স্পীড দিল। তার নিজের পরিচয়টাও কি খুব গৌরবের? ওই যে মোহিত সেন আর দেবেন রায়রা আজ এসেছিল, ওরা কি আজ নিজেদের কাছেই যথেষ্ট সম্মান পাচ্ছে? ওদের হাত কি পরিচ্ছন্ন? ওরা কি নোংরা ঘাঁটে নি? সে নিজে উঠলো কেমন ক'রে? কাদের সে মাড়িয়ে এসেছে দুই পা দিয়ে? কাদের রক্ত মেখে এসেছে সে দুই হাতে? মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু, হৃদয়বৃত্তির অপমান—লোভের আর দুষ্প্রবৃত্তির অলজ্জ আস্ফালন। এই যে সংশয় আর নৈরাশ্য এসেছে তার মনে, এর থেকে মুক্তির সন্ধান কি দিতে পারতো প্রমীলা? দিতে পারতো কি জীবনের কোনো নতুন আস্বাদ?

গাড়ি ছুটিয়ে অজিন চললো শহরের দিকে। শহর অনেক দূরে। যত দূরেই হোক, যেখানেই হোক, প্রমীলার কোনো একটা খবর তাকে নিয়ে যেতেই হবে। আজ বিমলাক্ষর স্ম লর বড় আকর্ষণ বিমলাক্ষর তর্পণ নয় —প্রমীলার দর্শন পাওয়া। প্রমীলা তার কাছে একটা আইডিয়া, তার পথের একটা সঙ্কেত, তার অন্তঃস্থলের একটা ইচ্ছামাত্র।

অজিন গাড়ি ছোটালো। যত জোর আছে তার মনে, যত শক্তি আছে মোটরের—অজিন সমস্তটা একত্র করে গাড়ীর গতিবেগ বাড়িয়ে দিল। আশেপাশে পিছনে কোথাও তার তাকাবার প্রয়োজন নেই, সামনে কোনো বাধা আছে কিনা, তাই দেখেই সে চললো। কিন্তু কোনো বাধা নেই, সামনের সুদীর্ঘ পথ অবারিত। গাড়িখানা ছুটলো তীরবেগে।

অবশেষে সে কোনো এক বড় রাস্তার ধারে একটি বাড়ীর সামনে এসে গাড়ী থামিয়ে হর্ন বাজালো। সেই হর্ন শুনে উপরের বারান্দায় এক ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন। অজিন গাড়ি থেকে নেমে মুখ তুলে বললে, কে সুধীর নাকি?

জবাব এলো, হ্যাঁ, তুমি এত রাত্রে?

অজিন বললে, আমাদের বিমলাক্ষর স্মৃতিসভা ছিল, তুমি ত' জানো। আচ্ছা প্রমীলা রায় কি তোমার এখানে আজ এসেছিলেন?

সুধীর বললে, হ্যাঁ, আজ সকাল থেকেই প্রমীলা ছিল আমাদের এখানে। তোমাদের সভা থেকে ফিরে সে এই ঘণ্টা দুই আগে চ'লে গেছে।

কোথায় ?

খুব সম্ভব তার দিদির ওখানে। তুমি ত' জানো তার দিদির বাড়ি।

আচ্ছা ভাই, ধন্যবাদ।—ব'লে অজিন তাড়াতাড়ি এসে আবার গাড়িতে উঠলো।

গাড়ি ছুটিয়ে সে চললো দক্ষিণ দিকে—যে পথ দিয়ে সে এসেছিল। আর কিছু নয়, শুধু এই কথাটা তার জানা দরকার—হঠাৎ সভা ছেড়ে সে চ'লে এলো কেন ? জানা দরকার, ইদানীং তার মনের গতি কোন দিকে। যে-কথাটা সুধীরের কাছে জানা হ'ল না, সেই কথাটাই তাকে শুনতে হবে—প্রমীলার গত বারো বছরের অজ্ঞাতবাসের হেতু কি !

মলিনা রায়ের বাড়ির কাছে এসে সে গাড়ি থামালো। নেমে এসে দরজার কড়া নাড়লো। ভিতর থেকে একটি চাকর বেরিয়ে এসে দাঁড়াতেই অজিন বললেন, গোপেনবাবুকে একবার ডাকো ত' ?

লোকটা বললে, তাঁরা ত' কেউ নেই ?

নেই ?

আজ্ঞে না, তাঁরা বিদেশে আছেন প্রায় চার মাস !

অজিন কিছুক্ষণ হতচকিত হয়ে রইলো। তারপর প্রশ্ন করলো, একজন মেয়েছেলে একটু আগে এখানে এসেছিলেন ?

চাকরটা জবাব দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ—

কোথায় তিনি ?

তিনি ঘরে এতক্ষণ বসেছিলেন, একটু আগে বেরিয়ে গেলেন। কেউ নেই কিনা বাড়িতে !

কোন দিকে গেলেন ?

তা জানিনে বাবু ওই যে, ওই পথ দিয়ে গেলেন।

আচ্ছা—ব'লে অজিন তাড়াতাড়ি আবার গিয়ে গাড়িতে উঠলো।

গাড়িখানা সে ঘোরালো। ছুটিয়ে দিল সেই বিশেষ পথটায়। এত রাত্রে স্ত্রীলোকের চিহ্নও নেই কোনো পথে। ষ্টিয়ারিং ধ'রে এপাশে-ওপাশে দেখতে দেখতে অজিন চললো। এ যেন তার প্রতিজ্ঞা—এই অন্ধকার রাত্রেই প্রমীলার দেখা পাওয়া চাই। বেশী দূরে নয়, হয়তো আছে পাশেই, হয়তো খুব কাছেই—তাকে শুধু খুঁজে বার করা মাত্র। গাড়িখানা ঘুরতে লাগলো এপথে, ওপথে,

সে-পথে। শুধু ঘুরছে, যতক্ষণ ওর ঘোরবার শক্তি থাকে। নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই, উদ্দেশ্যটাও অস্পষ্ট—শুধু উদ্‌ভ্রান্ত গাড়িখানা অন্ধকার থেকে অন্ধকারে কিছু একটা খুঁজে বেড়াচ্ছে। দিনের বেলায় ঘটনা ঘটলে লোকে বলতো পাগলামি, হিসাবী ব্যক্তিরা বলতো মাতলামি, কিন্তু নিস্তব্ধ জনবিরল রাত্রির এই ছায়াচ্ছন্ন অস্পষ্ট অন্ধকারে এই খোঁজাখুঁজির মধ্যে একটি মানুষের অন্তরের সত্যের হয়তো কিছু আভাস পাওয়া যায়। অজিনের কোনো ক্লান্তি নেই, তার উদ্বেগাকুল সেই চক্ষে কেমন একটা অদ্ভুত ক্ষুধা বিচ্ছুরিত হচ্ছিল—তার অর্থ তার নিজের কাছেও স্পষ্ট জানা নেই।

অবশেষে গাড়িখানা হাঁসফাঁস করে কোন একটা পথের মাঝখানে এসে থামলো। গাড়ি আর চলবে না, পেট্রল ফুরিয়ে গেছে।

অজিন পরিশ্রান্ত, হায়রান! আর কোথায় সে খুঁজবে? হঠাৎ মনে হ'ল কেনই-বা সে এতক্ষণ একটি নারীকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল! খুঁজলে কি প্রমীলাকে পাওয়া যায়? বারো বছর ধরে খুঁজেও কি তাকে পাওয়া গিয়েছিল?

থাক্ আর নয়। এই গাড়িখানার মধ্যে বসেই তাকে আজ রাত কাটাতে হবে, আর কোনো উপায় নেই। এতক্ষণ যেন একটা মস্ত ছেলেমানুষী তাকে পেয়ে বসেছিল, এ যেন ঠিক ঝড়ের পিছনে ছোটা, স্বপ্নের দিকে হাত বাড়ানো।

প্রমীলা নিজেই এসেছিল, আবার একদিন নিজেই সে আসবে। এবার আসবে আলো হাতে নিয়ে, পথ দেখাবে, সন্দেহ ঘোচাবে। অজিনকে সেই দিন পর্যন্তই তপস্বীর মতো অপেক্ষা করতে হবে। জীবনটা অর্ধসত্য আর অস্পষ্টতায় যেন মোহগ্রস্ত—নির্ভুলভাবে কিছু জানা যাচ্ছে না। এই গোধূলির কালে সেই আলোটা যদি উদ্ভাসিত হয়, সেইটিই ত' একমাত্র কাম্য।

দেবতার গ্রাস

তীর্থযাত্রা পথে সাধুসঙ্গ লাভ করবো এই আশায় সেবার নেপালের পথ ধরেছিলুম। আমাদের লক্ষ্য ছিল শিবরাত্রির দিনে বাবা পশুপতিনাথ দর্শন।

রক্সৌল, আমলেকগঞ্জ, ভীমপেডী—এক একটা ঘাঁটি পার হয়ে গেছি। শারীরিক কষ্ট কিছু তেমন হয়নি। তবে নাগরিক জীবনের নিয়মভঙ্গ হলে একটু আধটু অসুবিধা এই যা। ভীমপেডী থেকে উঁচু পাহাড় পেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কুলেখানিতে এসে পৌছেছিলুম কিছু অসময়ে এবং অনাহারে।

আমাদের দলটি সেই আদি ও অকৃত্রিম। অর্থাৎ ভারতের সকল তীর্থপথেই সাধারণত যাদের দেখা যায়—সন্ন্যাসী, ভিখারী, আতুর, ছদ্মবেশী ভদ্রলোক, নীচজাতীয়া স্ত্রীলোক এবং বৃদ্ধ। ভালো ক'রে পরীক্ষা না করলে কে কোন প্রদেশের সহসা চিনবার জো নেই। আমরা দু'জন বাঙালী, কিন্তু তরকারীতে ফোড়নের মতো আমরা ওদের দলে মিশে গিয়েছিলুম। ওদের সঙ্গে পার্থক্য আমাদের কিছু ছিল না। আচার আচরণে, বেশভূষায়, শারীরিক মালিন্যে আর অপরিচ্ছন্নতায় আমরা কারো চেয়ে কম ছিলুম না। আভিজাত্য প্রকাশ পেলে হয় আমাদের ওপর ভিখারীর উৎপাত বাড়বে, নয়ত পোঁটলা-পুঁটলি চুরি হবার সম্ভাবনা। তীর্থযাত্রীদের লক্ষ্য যে কেবলমাত্র তীর্থ নয়, আমার এই সর্বভারতীয় অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য আরো দু'একজন আছে বৈ কি।

নদী যেমন গোড়ার দিকে শীর্ণ, ক্রমশঃ স্ফীত,—তেমনি কুলেখানি থেকে চেৎলাঙের পথে সহযাত্রীদের জনতা কিছু বেড়ে গেল। সকলেই পদব্রজে চলেছি। যান-বাহনের কোনো সুযোগ-সুবিধা নেই। রাজ-পরিবার অথবা মহারাজার দলের লোকদের কথা স্বতন্ত্র। তাদের অবশ্য বাহন আছে, তবে যান বলতে 'ঝাঁপান' আর কিছু নেই। আমরা অনুর্বর পার্বত্য উপত্যকার উপর দিয়ে চলেছি। গ্রামবসতির চিহ্ন কোথাও দেখছিনে। কোথায় গিয়ে অবশেষে পৌছব তাও কিন্তু জানা নেই। তবে শেষকালে রাজার রাজধানী—সে যত সামান্যই হোক, আশ্রয় একটা জুটে যাবেই, মনে এই ভরসা ছিল। যেন আশা আর দুরাশা নিয়ে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে চলেছি।

চেংলাঙ পৌছবার আগেই আমাদের দল বেশ ভারী হয়ে উঠেছে। এদের ধ্যে ব্যক্তি একটিও নেই, বরং সবাইকে জড়িয়ে একটা যাত্রীদল। স্ত্রীলোক, রুষ, খঞ্জ, কানা, রুগ্ন — অনেক রকম চোখে পড়ছে, কিন্তু সেই বিশেষত্ব-হীন নসাধারণের লক্ষ্য ছিল এক এবং হাঁটা-চলা-আহার-বিরাম সমস্তটাই বশিষ্ট্যবর্জিত। তাই সেখানে মানুষ চোখে পড়ে না, কেবল দেখি জনতা। ার জনতা যে পীড়াদায়ক, নিরর্থক, ক্লান্তিকর একথা তো ইতিমধ্যেই জেনেছি।

চেংলাঙে এসে পৌছে মহারাজার পাকা ধর্মশালা পাওয়া গেল। কিন্তু হু চেষ্টায়, বহু অধ্যবসায়েও আশ্রয় মিললো না। আমরা নিরুপায় হয়ে াগমতীর তীরে এসে দাঁড়ালুম। মাঘের শেষের পাহাড়ী শীত, পাশে খরস্রোতা ছাট নদীর তীব্র হাওয়া, অপরাহ্ণ সন্ধ্যার দিকে এগিয়ে চলেছে, পরিশ্রান্ত শরীর াশ্রয়ের জন্য লোলুপ, — এমনি অবস্থায় ঘুরতে ঘুরতে এক তাঁবু পাওয়া গেল। থমে বাতাস থেকে আত্মরক্ষা, তারপর ক্ষুধার খাদ্য সংগ্রহ — এই ছিল প্রধান ক্ষ্য। আমরা তাঁবুর ভিতরে ঢুকে আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে ভিতরের ওা ভিজা ঘাসের উপর ব'সে পড়লুম। ভিতরে দু'চার জন যাত্রী আগেভাগে সে চাটাইগুলো দখল ক'রে জন্তুর মতো প'ড়ে রয়েছে। আমরা ঝুলি নামিয়ে তাস বাঁচিয়ে একান্তে জায়গা নিলুম। শীতে পা দু'খানা কনকন করছে।

চাল-ডাল চারটি কি ভাবে ফুটিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করব ভাবছিলুম, এমন সময়ে বার একটা ছোটখাটো দল এসে আমাদের তাঁবু আক্রমণ করলো। ভিতরে নাভাব ছিল, সুতরাং অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে তাদের বিদায় দেবার চেষ্টা করলুম। র-পাঁচজন স্ত্রীপুরুষ অন্যত্র চ'লে গেল, কিন্তু দু'জন ওদের মধ্যে কিছুতেই আর তে চাইল না। সকাতর অনুনয়-বিনয় ক'রে তারা আমাদের পাশে এসে য়গা নিল। তাদের আর কোথাও ঠাঁই নেই।

আসন্ন সন্ধ্যায় শীতের কুয়াশার মধ্যে এতক্ষণ নিজেরাই হি হি ক'রে পছিলুম। নবাগত যাত্রীদের লক্ষ্যই করি নি। ওদের মধ্যে একজন লোক। মাথার দিকে যাতায়াতের পথের পাশে হাত দুই জায়গা কোনোমতে জের দখলের মধ্যে নিয়ে সে এবার কম্বলের মুড়ি খুলে ফেললো। স্ত্রীলোকটি দুস্থানী, পরনে কালাপাড় শাড়ী, গায়ে একটা তুলোর জামা, বয়স বোধ ত্রিশ-বত্রিশের মধ্যে। মিনিট পাঁচকে আগে যে রকম কাতর মিনতি নিয়ে সে আশ্রয় ভিক্ষা করেছিল, এখন গুছিয়ে বসবার পরে তার হাবভাবের উদ্ধত পরিবর্তন দেখা গেল। ওর চেহারার ভিতরের প্রচ্ছন্ন গর্ব এই বুর ভিতরকার তুহিন আবহাওয়াকে যেন উত্তপ্ত নিঃশ্বাসের দ্বারা ইতিমধ্যেই

আঘাত করতে আরম্ভ করেছে। মাঝখানে সে নিজের মাথার চুলের রাশি একবার এগিয়ে দিয়ে কাঠের চিরুণীতে আঁচড়ে নিল। বিপুল জনতার ঠেলাঠেলির মধ্যে পথে-পর্বতে এই দু'দিন যে মানব-পশুদলের ভিতর দিয়ে হাতড়ে-হাতড়ে এসেছি, এই স্ত্রীলোকটি তাদের থেকে সহসা স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব নিয়ে যেন উল্কার মতো ছিটকে এসে পড়লো।

আমরা তাকে আশ্রয় দিয়েছি সত্য, কিন্তু তার রাশভারী চেহারা আর পারিপাট্য দেখে এখন নিজেরাই যেন কুণ্ঠিত ও আড়ষ্ট হয়ে রইলুম। নিঃশব্দ অস্তিত্বের দ্বারা স্ত্রীলোকটি যেন এই তাঁবুর ভিতরকার জগতকে শাসন করতে লাগলো।

মাঝখানে একবার উঠে গিয়ে চাল ডাল সিদ্ধ করার বন্দোবস্ত ক'রে আবার এসে তাঁবুতে প্রবেশ করছি, এমন সময় এক বিশালকায় বৃদ্ধ সন্ন্যাসী এসে তাঁবুর দরজায় দাঁড়াতেই একটা কোলাহলের ঝড় উঠলো। স্ত্রীলোকটি তাকে লক্ষ্য করেই সহসা ঝন ঝন ক'রে চেঁচিয়ে উঠলো,—দেখো তো স্বামিজী, দেখো তো বাবু, বদ্‌মাস মহারাজটা আবার আসিয়াছে! হামার পিছু লিয়েছে।

হঠাৎ এমন একটা ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তাঁবুর ভিতরে আমরা সকলেই তার এই চীৎকারে হকচকিত হয়ে তাকালুম। সেই বিশালকায় গেরুয়াপরা মহারাজের কাছে আমরা বাঙ্গালী যেন ক্ষুদ্র মানবক! মহারাজের মাথার সুমুখের অংশটা টাকপড়া, পিছন দিকে পাকা চুলের দড়ি ঝুলছে। বললাম, কি, ব্যাপার কি?

স্ত্রীলোকটি বললে, কাল থেকে এই বদ্‌মাস বুড়া আমার সঙ্গে সঙ্গে চলছে। হামি যেখানেই যাই, এই মহারাজ যাচ্ছে সেখানে। হামার সঙ্গে হাসি, হামার হাতে হাত লাগাইছে। যাও যাও নিকালো। হামার কাছে ও হোবে না,—বুঝিয়েছো? যাও, ভাগো।

মহারাজের মুখে দেখলাম, কী প্রসন্ন ক্ষমাসুন্দর হাসি! বিশ্বের নারী জাতির প্রতি কী অপরিসীম স্নেহ!

মেয়েটি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসলো। কেবল তাই নয়, ক্ষুধার্ত মহারাজের একাগ্র দৃষ্টি থেকে নিজের দেহটিকে গোপন করার জন্য চাদরখানা তুলে নিয়ে আবার গায়ে জড়ালো।

অজগর সরীসৃপ যেমন একটু একটু ক'রে এগিয়ে আসে, তেমনি ক'রে মহারাজ দু'পা নিঃশব্দে অগ্রসর হয়ে এলো। তার অসহনীয় স্পর্ধায় মুখ তুলে তাকালুম! বললাম, তোমার কি মতলব, শুনি?

মহারাজ হাসিমুখে বললে, কুছ না।

জায়গা নেই, তবুও ভিতরে আসছ কেন?

আর এক পা এগিয়ে এসে মহারাজ এদিক ওদিক তাকিয়ে একটু জায়গা খুঁজতে লাগলো। কিন্তু ভিতরে ঠাসাঠাসি; গায়ের জোরে এইটুকু পরিসরের মধ্যে সসম্মানে স্থান পাওয়া অসম্ভব। তাছাড়া অনিচ্ছুক নারীর প্রতি লোকটার এই অধ্যবসায় আমাদের পুরুষের মনে এমন প্রতিরোধ স্পৃহা ও ঘৃণা জাগিয়ে তুলছে যে, আমরা ওকে জায়গা দিতে কিছুতেই রাজী নই। কিন্তু ওর চেহারাটা শঙ্কাজনক। মুখের পাকাদাড়ি আবক্ষলম্বিত, হাত দু'খানা বিশ্বামিত্র মুনির মতো লোমশ, দুইটা চোখ সুন্দরবনের শেষ বাঘের মতো কপিশবর্ণ,— আর সমস্ত জড়িয়ে চেহারা যেন দৈত্যদলের শেষ বংশধরের মতো বিরাট। ওকে বাধা দেবো কেমন করে, সেই কথাই ভাবছিলুম।

আমার সঙ্গী বললে, যাও চ'লে যাও, এখানে কিছুতেই আর জায়গা হবে না। বেশী কিছু করলে কিন্তু সেপাইকে ডেকে দেবো ব'লে দিচ্ছি।

বিদেশ বিভুঁই,—রাজার সিপাইসান্ত্রীর দল হয়ত কাছাকাছি আছে। কিন্তু জনতার কোলাহল পেরিয়ে, শীত বাঁচিয়ে, এই অন্ধকারে অপরিচিত জগতে এবং শ্রান্ত শরীরে কে গিয়ে সিপাইদের খুঁজে বা'র করবে সে হোলো প্রধান সমস্যা। এত তেজ কারো নেই, ক্ষুধার্ত যাত্রীদের পক্ষে এমন উদ্যমেরও অভাব,—স্বয়ং মহারাজও একথা জানে। সুতরাং আমাদের সম্মিলিত মৌখিক প্রতিবাদের নিষ্ফলতা যেমন আমরাও জানি, সেও তেমনি বোঝে।

আবার দু'পা এগিয়ে এলো। আমরা নিরুপায় রোষকষায়িত দৃষ্টিতে কেবল তার দিকে তাকালুম। সন্ন্যাসী শিব এই ভাবে পঞ্চশরের দিকে চেয়ে তাঁকে ভস্ম করেছিলেন, কিন্তু আমাদের চোখের তারায় সেই বিদ্যুতাগ্নির অভাব। সহসা মনে পড়লো আমাদেরই বা এত গরজ কেন? বাবার দর্শনে এতদূর পথে চলেছি অবশ্যই লৌকিক-সংস্কারমুক্ত হয়ে? একটি নারী তীর্থযাত্রীর সম্ভ্রম রক্ষার ভার স্বয়ং পশুপতিনাথই গ্রহণ করুন, আমরা পার্থিব মোহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে চলেছি। তাছাড়া স্ত্রীলোকটি স্বচ্ছন্দ স্বাধীন, তার চেহারায় আর চাল-চলনে নির্ভীক লঘুতা, আমাদের সঙ্গেও সে আসেনি, অতএব নিজেকে রক্ষা করার শক্তি তার অবশ্যই আছে। আমাদের চুপ ক'রে যাওয়া ছাড়া এস্থলে আর উপায় কি? তাঁবুতে সর্ব-সাধারণের অধিকার।

অবশেষে অধ্যবসায়ী মহারাজ জায়গা নিল আমাদের কাছাকাছি। কোনও

নিষেধ, কোনও বাধা, কোনও প্রতিবাদ তাঁকে নিরুৎসাহ করতে পারলো না। পথের কুকুরকে যেমন গভীর বিরক্তি আর অনিচ্ছার সঙ্গে শীতের রাত্রে লোকে আশ্রয় দেয়, স্ত্রীলোকটি সেইভাবে মহারাজকে একপাশে থাকতে দিল। মাঝখানে কেবল ব্যবধানের প্রাচীর তুলে দেওয়ার মতো ক'রে মেয়েটি তা'র পোঁটলা-পুঁটলি সাজিয়ে রাখলো এবং ঝঙ্কার দিয়ে বললে, খবরদার, আমার জিনিস চুরি ক'রো না, ডাকু কোথাকার।

মহারাজ ফুঁ ফুঁ ক'রে হাসতে লাগলো। স্ত্রীলোকটি ঘৃণাভরে তা'র দিকে একবার তাকিয়ে পিছন ফিরে পান সাজতে বসে গেল।

শীতের ঠাণ্ডায় বাইরে পাথরের উনুনে ভিজা কাঠ অতি কষ্টে জ্বালিয়ে আমরা ডাল-ভাত সিদ্ধ করলাম। কিছু আপত্তিজনক খাদ্য আমরা গোপনে সংগ্রহ করতে পেরেছিলুম, আধসিদ্ধ ডালভাতের সঙ্গে সেই আমিষ বস্তুটি সংযোগ ক'রে পরমানন্দে বাইরের অন্ধকারে বসেই আহার করলাম। আগামীকাল প্রভাতে চেৎলাঙ ছেড়ে যাবো। সিসাগড়ি পার হয়েছি, চন্দ্রাগড়ি পার হ'তে পারলেই কাটমাণ্ডুর সন্ধান পাবো,—এই ছিল আমাদের পথের নির্দেশ। হিসাব ক'রে দেখা গেল, আগামীকাল মধ্যাহ্নে অথবা অপরাহ্নের কাছাকাছি আমরা থানকোট হয়ে রাজধানীতে পৌঁছতে পারবো। বৃটিশ ভারতবর্ষ আমরা পেরিয়ে এসেছি, এখন আমরা আর এক 'হিজ ম্যাজেষ্টি'র রাজ্যে উপনীত।

প্রায় ঘণ্টা দুই আমরা বাইরে থেকে শীতে আড়ষ্ট হয়ে গেছি। কিন্তু উৎকৃষ্ট ও উত্তপ্ত ভোজনের ফলে প্রাণের মধ্যে অসীম পরিতৃপ্তি ছিল। দরকার হলে শারীরিক বল প্রয়োগের দ্বারা নারীর সম্ভ্রম রক্ষা করতে তখন আমাদের আর কুণ্ঠা ছিল না। গোপনে একটা গাছের ডালও ইতিমধ্যে সংগ্রহ করেছিলুম। শরীরে এবার শক্তিসঞ্চার হয়েছে। বাবা পশুপতিনাথ তাঁর কর্তব্য ভার আমাদের উপর ন্যস্ত করেছেন—এতে আর সংশয় নেই।

তাঁবুর ভিতরে আমরা ফিরে এলাম। কিন্তু সম্মুখে যে দৃশ্য দেখলাম, তা'তে আমরা স্তম্ভিত। স্ত্রীলোকটি তা'র এলাকার মধ্যে ব'সে একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে স্মিতমুখে পান চিবোচ্ছে, আর সেই প্রদীপের আলোর নীচে ঝুঁকে প'ড়ে স্বয়ং মহারাজ সুর ক'রে শাস্ত্রপাঠে নিরত। মাঝখানে পোঁটলা-পুঁটলির ব্যবধানটুকু অবশ্য তখনও ঠিক আছে, তবে দুই দিকে দুইজনের বিছানা পড়েছে পরম পারিপাট্য সহকারে। তাঁবুর ভিতরকার অন্যান্য যাত্রীরা পরম ভক্তিভরে করযোড়ে সমাসীন।

এমন স্বর্গীয় মহিমা দর্শন জীবনে কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? বাইরে আঁধিয়ারা রাত্রি, অজানা পার্বত্য তীর্থ পথ, তাঁবুর পারে খরস্রোতা বাগমতির ঝন্নো ঝন্নো শব্দ, মাঝে মাঝে শীতজর্জর অজানা বন্যজন্তুর আর্তকণ্ঠ; আর ভিতরে সংসার কোলাহলহীন এই সংস্কারমুক্ত আবহাওয়া এবং পৃথিবীর লোকযাত্রা থেকে নির্বাসিত আমরা কয়েকটি তীর্থযাত্রী ও স্বল্প আলোকিত তাঁবুর মধ্যে একটি যুবতী নারীর চারিদিকে কয়েকটি জীবন বৈরাগীর মধ্যে শাস্ত্রালোচনা,—এ সৌভাগ্য সামান্য নয়। আমরা ভিতরে গিয়ে পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে নিজের জায়গায় বসতেই স্ত্রীলোকটি হাত বাড়িয়ে পান দিতে চাইল এবং তারই দেখাদেখি মহারাজ তা'র তল্‌পি খুলে সহাস্য স্নেহভরে দুই খণ্ড হরিতকি ও মিছরির টুকরো আমাদের দেবার জন্য হাত বাড়ালো। অবনত মস্তকে আমরা উভয়ের দান গ্রহণ করলুম।

গাছের ডালটা ইতিমধ্যেই লজ্জায় আত্মগোপন করেছে। ওর আর প্রয়োজন নেই। ভাবলুম, দুটোই সত্য। শুনেছি এই রকম একাগ্র যাত্রাপথে রিপুর প্রকাশও যেমন উগ্র হয়ে ওঠে, ভক্তির অতিশয়তাও তেমনি গভীরে নামে। একই শক্তির দুই বিভিন্ন রূপ। মহারাজের স্তিমিত চোখে-মুখে একটি জ্যোতির্ময়তা লক্ষ্য করছি, আর মেয়েটির মুখে-চোখে ঘৃণার বদলে বন্ধুতা। এটি কেমন ক'রে সম্ভব, তীর্থযাত্রার জনতার অন্তর্নিহিত নিঃসঙ্গতায় না এলে বোঝা যাবে না। ওদের উভয়ের এই অন্তরঙ্গতা দেখে আমরা নিজেরাই কিছু কুণ্ঠাবোধ করলুম। এর আগে লোকটার লোলুপ অধ্যবসায়ই দেখেছি, কিন্তু সত্যই তো তা'র পাশবিকতার প্রকাশ এখনও প্রত্যক্ষ করিনি।

কি যেন একটা শাস্ত্রীয় আলাপে মেয়েটির ব্যক্তিগত আলাপে মেয়েটির ব্যক্তিগত আলোচনা উঠলো। শুনলাম তা'র বাড়ি গোরক্ষপুরের ওদিকে, জাতিতে সে কুর্মী, নাম বুঝি রামপিয়ারী। একসময়ে অকপটে সে জানালো, তা'র 'ছেলিয়া' হয় না ব'লে স্বামী তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। বলেছে, সে আবার 'বিয়া' করবে। সুতরাং রামপিয়ারী চলেছে বাবা পশুপতিনাথের স্বপ্নাদ্য কবচের আশায়। ছেলিয়া' না হ'লে সে তার স্বামীর পায়ের কাছে মাথা রেখে মৃত্যুবরণ করবে, এই হোলো পণ। তা'র সেই জীবনসর্বস্ব 'মরদ' নাকি দেবতুল্য। রামপিয়ারীর এই কাহিনী শুনে আমরা মুগ্ধ হ'য়ে গেলুম। আমাদের বিশ্বাস, সে তা'র এই তপস্যার পুরস্কার একদিন পাবেই পাবে।

শাস্ত্রালোচনা চললো দীর্ঘকাল। অন্যান্য যাত্রীরা ভক্তিতে গদগদ হয়ে একে

একে নিদ্রাভিভূত হোলো। আমরাও এক সময়ে বাবা পশুপতিনাথের শ্রীচরণে রামপিয়ারীকে সমর্পণ ক'রে কম্বল জড়িয়ে কুমড়ার মতো গড়িয়ে পড়লাম। মোমবাতিটি টিপটিপ ক'রে জলতেই লাগলো এবং বৃদ্ধ মহারাজ অক্লান্ত উদ্যমে সুন্দরী রামপিয়ারীর প্রাণে ভগবৎভাব সঞ্চার ক'রে চললো। বক্তা ও শ্রোতার এমন সংযোগ দুর্লভ বৈ কি।

পরিশ্রান্ত যাত্রীদের অনড় পাথুরে নিদ্রা তীর্থপথিকরা অবশ্যই উপলব্ধি করবে সুতরাং তার বর্ণনা অনাবশ্যক। কিন্তু সেই ঘুমও ভাঙাতে পারে, এমন গণ্ডগোল নিশ্চয়ই আছে।

রাত কত, ঠিক আন্দাজ করা শক্ত। হঠাৎ প্রবল গোলমালে, চেঁচামেচিতে এবং ঝটাপটিতে আমাদের সেই যোগনিদ্রা ভঙ্গ হোলো। ভুলে গিয়েছিলুম আমরা এক দুর্গম তীর্থযাত্রার পথিক, ভুলেছিলুম তুষার দেশের এক নদীর ধারের তাঁবুর মধ্যে আমরা শায়িত। সুতরাং ঠিক কোথায় আছি এবং কি ঘটলো—একথা সেই ঘন অন্ধকারে আন্দাজ করতে গিয়ে আমাদের কিছু সময় লাগলো। তারপর প্রথমেই মনে পড়লো, সেই গাছের ডালটার কথা। সেটা হাতড়ে-হাতড়ে খুঁজে পেলুম না। পরে জেনেছিলুম মহারাজ সন্দেহক্রমে সেটি হাতসাফাই করেছে।

যাই হোক, আমরা সাড়া দিয়ে ধড়মড় ক'রে উঠতেই রামপিয়ারী উচ্চকণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়ে বললে, হামার 'ধরম' আছে, জানিস রে বদমাস? তুমি সন্ন্যাসী হইয়ে 'অওরতের' ওপর জুলুম? চণ্ডাল কাঁহেকা! জানো না হামি সতী মেয়ে আছে?

আবার ঝটাপট শব্দ। বেশ বুঝা গেল, রামপিয়ারী মহারাজের মাথার টাকের ওপর বেশ কয়েক ঘা বসিয়ে দিয়েছে!

আমাদের উদ্দেশ করে স্ত্রীলোকটি পুনরায় বললে, দেখিয়ে তো স্বামীজী, হামিতো বলেছি ওকে কি, হামি সতী! হামি ওসব নেই! হামার মরদ আছে, ডেরা আছে, হামাকে সতী হয়ে ফিরে যেতে হোবে! তবু—তবু সড়কি-সড়কি হাত চালিয়েছে হামার গায়ে—ওই হারামী-বাচ্চা, ওই সন্ন্যাসী চণ্ডাল!

মহারাজ এই প্রেমের আঘাত নত মস্তকেই সহ্য করলো। তা'র চোখে-মুখে স্বর্গীয় মহিমা ছিল কিনা অন্ধকারে আমরা দেখতে পেলুম না। কিন্তু সে একেবারে নিস্তব্ধ ও নিশ্চল হয়ে ছিল।

ঝঙ্কার দিয়ে রামপিয়ারী বললে, আচ্ছা, হাত রাখলি হামার হাতে, চুপ ক'রে সহ্য করলম ; হামার মুখে হাত দিলি সহ্য করলম ; লেকিন তোহার হাত যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াবে, আর হামি সতী হইয়ে মানিয়ে লেবো ?— নিকালো হারামী, বুকের ছাতিতে মারবো লাথ, কুত্তেকো বাচ্চা !

বাইরে নিথর শনশনে রাত্রি। মারামারি ফৌজদারী করবার ক্ষমতা এই শীতের রাত্রে কা'রো নেই। রাজার সিপাই-পুলিশ এত রাত্রে নিশ্চিন্ত। গাছের ডালটা হারিয়ে আমরাও প্রায় নিরুপায়। তা' ছাড়া ওই বিরাটকায় দৈত্যকে মারধর করবো,—সেটাও তো বড় অসম্মানজনক !

কোথায় গেল সেই প্রথম রাত্রির ধর্মালোচনা, আর কোথায়ই বা সেই স্বর্গীয় মহিমা ! সমস্ত ব্যাপারটা যেমনই লজ্জাকর, তেমনি কদর্য। স্থির করলুম, কাল প্রভাতে এর প্রতিকার করা চাই। লোকজন ডেকে অন্তত এই সন্ন্যাসীর মুখোস খুলে দেওয়া দরকার।

প্রস্তাব করলুম রামপিয়ারী জায়গা বদল করুক। আমরা উঠে যাচ্ছি মহারাজের দিকে, আর রামপিয়ারী আসুক আমাদের এই জায়গায়। অন্তত বাকি দু'ঘণ্টা রাতটুকুর জন্যে এই ব্যবস্থাই করা যাক। মহারাজের নাগালের বাইরে সে থাকুক,—যদি কোনমতে তার সম্ভ্রম রক্ষা হয়।

কিন্তু সে গোরক্ষপুরের মেয়ে, বাঙ্গালী ললনা নয় ! প্রস্তাব শুনে রামপিয়ারী চোখ পাকিয়ে ভুরু বাঁকিয়ে বললে, কেনো যাবো স্বামীজী তুমাদের হোখানে ? এ জায়গা হামার। হামি থাকবো হেথানে জবরদস্তি ? সতী মেইয়া কি ভয় কোরে ডাকুকে ? যাবে না হামি।

কথাটা খুবই সত্য। সতী মেয়ে যমকেও ভয় করেনি, শাস্ত্রে আছে। সতীর শক্তি, সতীর বিক্রম ও মহিমা আমাদের মতো অকিঞ্চন ভুলে গিয়েছিল। বাস্তবিক রামপিয়ারীর কথায় ভারি লজ্জিত হলুম। বনের পশু, ডাকাত, মৃত্যু—সতীর ভয় কোথাও নেই। আর এ তো সামান্য একজন সন্ন্যাসী। আমরা আমাদের প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিশ্চিত মনে আবার শুয়ে পড়লুম।

ঝঙ্কার থামিয়ে রামপিয়ারী অপেক্ষাকৃত শান্ত কণ্ঠে সন্ন্যাসীকে এই ভাবে সুপরামর্শ দিতে লাগলো, খবরদার, অনিচ্ছুক স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তি প্রকাশ ক'রো না। আমি সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। স্বামী জীবিত থাকতে আমার পক্ষে সতীত্ব বিসর্জন দেওয়া অতীব কঠিন। আর তা ছাড়া দেখতে পাচ্ছ আমার চলন-ধরণ, আমি সেই জাতের মেয়ে নই। এই আমি আবার শুচ্ছি

এখানে, আশা করি তোমার মতন একজন বৃদ্ধ ধার্মিক ব্যক্তি আর আমাকে বিরক্ত করবে না। তোমার দুষ্টামির জন্য তোমাকে মেরেছি, সেজন্য আমি ভারি দুঃখিত।

মোমবাতির আলোটা সে আগেই জেলেছিল। এবার একটা পান খেয়ে এলোচুল গুছিয়ে আবার সে পরম নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে পড়লো। মহারাজের দৃষ্টি স্নেহমধুর, নিমীলিত, নির্বিকার, অথচ সচেষ্ট। এমন ভদ্র ব্যক্তি সহসা চোখে পড়ে না।

রামপিয়ারী এক সময় আবার আলোটা নিভিয়ে দিল।

*　　　*　　　*　　　*

ভোরের দিকেই আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। চেয়ে দেখলুম, তাঁবুর ভিতরকার প্রায় সব যাত্রীই বেরিয়ে চ'লে গেছে। রামপিয়ারী অথবা সেই লোমশ মহারাজের চিহ্নমাত্র নেই। তা'রা একত্র গেল, অথবা পৃথকভাবে—' এ আমাদের জানার উপায়ও ছিল না। উদ্বেগও ছিল না। কিন্তু তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আমরা বাঁচলুম।

এর পর চেৎলাঙ থেকে বেরিয়ে সকালের দিকে সেই পুরাতন পথ ধ'রে আমাদের যাত্রা স্বরু। পথ বহুদূর, মাঝখানে নদী পার হওয়া, তারপর উঁচু দেওয়ালের মতো পাহাড় পেরিয়ে চন্দ্রাগড়ি পর্বতের অরণ্য এবং সেই অরণ্যের ভিতর দিয়ে সরীসৃপের মতো আমাদের অক্লান্ত মন্থর রুদ্ধশ্বাস আরোহণ।

তারপর মধ্যাহ্নের দিকে পাহাড়ের অপর পারের দিকে উৎরাই,—সে-পথ পিচ্ছিল, অরণ্যবহুল, গভীর। নামতে নামতে বহুদূরে কাটমাণ্ডু শহর আবিষ্কার—স্বপ্নপুরীর মতো। দূরে হিমালয়ের দিগন্তব্যাপী তুষারশুভ্রতা—মধ্যস্থলে বিন্দুবৎ নেপালের রাজধানী।

থানকোটে নেমে এসে মোটর পাওয়া গেল। সেখান থেকে কাটমাণ্ডু, মাঝখানে বাগমতীর পুল। পথে ত্রিপুরেশ্বর মন্দির, শহরের সিভিল লাইনে ময়দান ও রাণীবাগ। জলের মধ্যস্থলে একটি মন্দির। শহরে এসে কোনপ্রকারে আশ্রয় লাভ ক'রে অতঃপর পরের দিন এখানে ওখানে ভ্রমণ আরম্ভ। পাটান, স্বয়ম্ভু, দত্তাত্রেয়, বিভিন্ন পার্বত্য গ্রাম। এর পর মহারাজার কীর্তিকলাপ, নগরের দৃশ্যাবলী দর্শন, ইতস্তত ভ্রমণ।

কাটমাণ্ডু থেকে প্রায় তিন মাইল পূর্বদিকে পশুপতিনাথ। সেখানে গুহ্যেশ্বরী পীঠস্থান, পাশে কৈলাস। শিব-চতুর্দশীর দিনে সেদিন সেখানে মেলা আর

মিছিল। ভাগ্যক্রমে সেদিন ধীরাজ অর্থাৎ রাজসম্রাটকে দর্শন করা গেল। তিনি রাজ্য ছেড়ে কোনদিন এক পাও বাইরে যান না। নেপালী শাস্ত্রের নিষেধ।

সপ্তাহখানেক অনেকেই কাটমাণ্ডুতে থাকে, আমরাও রয়ে গেলুম। আমাকে শয্যাগত অবস্থায় আসতে হয়েছিল। সে যাই হোক, বাহনের পিঠে চড়ে আবার থানকোট থেকে ভীমপেডী পর্যন্ত আসতে হোল। ফিরবার পথ একই। ভীমপেডী থেকে মোটরে আমলেকগঞ্জ এসে আবার ট্রেন। গাড়ি রক্সৌল অবধি যাবে।

এই কয়দিনে রোগে ও পরিশ্রমে আগেকার সব কথাই ভুলে গিয়েছি। রামপিয়ারীকেও মনে ছিল না। কিন্তু আমলেকগঞ্জ থেকে ছোট ট্রেনে উঠতেই রামপিয়ারীকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে সচকিত হলুম। জনতার মাঝখান দিয়ে দূর থেকে সে ছুটতে ছুটতে আসছে আশপাশে লোকের মনে বাসনার ঝড় তুলে। পরনে নীলাম্বরী, আঁটসাঁট দেহ, কপালে সিঁদুর, মুখে চটুল হাসি মাথা। সে ভীড় সরালো না, তাকে দেখে ভীড়ই স'রে দাঁড়ালো।

গাড়িতে উঠে এসে সে আমাদের দেখতে পেলো। হাসিমুখে বললে, স্বামীজী, ঠাকুর আমাকে 'দোয়য়া' করিয়েছেন।

বললাম, বেশ বেশ। এবার দেশে ফিরবে?

রামপিয়ারী গদগদ কণ্ঠে বললে, হাঁ। সতীর 'প্রাড়থানা, তিনি শুনিয়েছেন। ছেলিয়া হামার হোবে।

হবে বৈ কি, নিশ্চয় তোমার ছেলে হবে। বাবা পশুপতিনাথের দয়া।

এমন সময় আমাদের অসীম বিস্ময় উৎপাদন করে সেই মহারাজ গাড়িতে উঠে এলো। কাছে এসে তার সেই তল্পি খুলে সস্নেহে আমাদের হাতে দিল ঠাকুরের প্রসাদ। তারপর রামপিয়ারীর একখানা হাত ধরে তুলে অভিভাবকের হুকুমের মতো বললে, উধার চলো।

রামপিয়ারী অনুগত দাসীর মতো নিঃসঙ্কোচে উঠে দাঁড়ালো। হাসিমুখে বললে, দেখিয়েছেন স্বামীজী, মহারাজ হামাকে ছাড়েনি। সাতদিন হামার সঙ্গে থাকবে, আর মন্ত্র দেবে! হামি কি করবে!

দু'জনে গাড়ির অন্যপ্রান্তে একাকী গিয়ে বসলো। গাড়ি ছাড়তে আর বিলম্ব নেই। আমরা মনে মনে বাবা পশুপতিনাথের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করলুম, সতীর কামনা যেন পূর্ণ হয়!

বেলা এগারোটার মধ্যে স্টেশনে পৌঁছতে হবে, সুতরাং হাতে সময় ছিল কম। বাইরের দরজায় একখানা টাঙ্গা এসে দাঁড়িয়েছে। হাতঘড়ির দিকে একবার তাকিয়ে পা বাড়াবো এমন সময় ভিতর থেকে শিবরানী আবার আমাকে ডাকলেন।

পূজোর দালানের কাছাকাছি গিয়ে আমি দাঁড়ালুম। পরে একটু ইতস্তত: করে ডাকলুম, আর কিছু বলবেন, বড় মামীমা?

ঘাড় ফিরিয়ে শিবরানী বললেন, ঠিকানাটা ঠিক করে নিলি বাবা?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

শিবরানী তাঁর রুদ্রাক্ষের মালাটি সরিয়ে রাখলেন। পরে তাঁর গরদের আঁচলে একটু ঘোমটা টেনে বললেন, ঝুনুর সঙ্গে কবে নাগাদ তোর দেখা হবে. জীবেন?

আমি বললুম, এখন যাচ্ছি কলকাতায়, তারপর ধরুন সেখান থেকে দুচারদিনের মধ্যে যাবো মালদা, সেখান থেকে দিনাজপুর—

শিবরানী বললেন, তার সঙ্গে দেখা হবে তো বাবা? সে যে একগাঁ থেকে অন্য গাঁয়ে ঘুরে বেড়ায়। মেয়েছেলের এমন বুকের পাটা···ওর তো আর জুড়ি নেই!

আমি বললুম, যত দেরিই হোক, দিন পনেরোর মধ্যে তার সঙ্গে আমার দেখা ঠিকই হবে,—যেখানেই সে থাক্। আপনি কিছু ভাববেন না, বড় মামীমা।

গরদের আঁচলে শিবরানী চোখের জল মুছে বললেন, না, কিছু ভাববো না। ঝুনু তো আমার পেটে হয় নি জীবেন যে, তার জন্যে ভাববো। তাকে একদিন পথ থেকে কুড়িয়ে পেয়েছিলুম, ফুটফুটে মেয়ে দেখে মানুষ করেছিলুম,—এই পর্যন্ত।

বললুম, আপনি তাকে লেখাপড়া শেখালেন—এম-এ পাশ করালেন। অথচ সে তো অকৃতজ্ঞ নয়! আপনার চেয়ে বেশী ভক্তি সে আর কাউকে করে না, এ আমি জানি বড় মামীমা।

ঝুনুর সঙ্গে দেখা হলে বলিস, তার ওপর আমার কোনো নালিশ, কোনো দাবি, কোনো অভিমানও নেই। এই তো কাশী চলে এসেছি, আমার পাওনা আর কতটুকু বাবা? কলকাতার যা কিছু সবই তো ঝুনুর, সবই তো তার হুকুমে!—শিবরানীর গলাটা দেখতে দেখতে ভারী হয়ে উঠলো।

সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, আমি যেমন করেই হোক ঝুনুকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করবো, বড় মামীমা!

আসবে না জীবেন, সে আসবে না বাবা। সে মেয়ে ইস্পাতে গডা, পাথরের কুচি।—শিবরানী বললেন, অত বড় মেয়ে, আমি শুধু তার চলাফেরা নিয়ে একদিন দু'এক কথা বলেছিলুম, এর বেশী কিছু নয় বাবা। কিন্তু আমার ছেলেপুলে হয় নি বলেই ঝুনু আমাকে এতখানি ঘা দিতে পারলো! বলেছিলুম, দেশের কাজ নিয়ে তোর এত মাথা ব্যথা, ঘরকন্নায় এবার একটু মন দে? মেয়ে সেদিন থেকে ঘুরে দাঁড়ালো, মনে করলে আমার মতলব বুঝি ভালো নয়।

আমার আর দাঁড়াবার সময় ছিল না। ঝুনুর আলোচনা একবার উঠলে শেষ হবার সম্ভাবনা কম। সুতরাং এবার নিজেকে একটু নাড়া দিয়ে বললুম, এবার আমি যাই, বড় মামীমা।

আচ্ছা, এসো বাবা—শিবরানী বললেন, হ্যাঁ, আর একটা কথা। তোর মতিগতি এবার একটু ফিরেছে বলতে পারিস?

হাসিমুখে বললুম, কেন বলুন তো?

শিবরানী বললেন, ঝুনুর সঙ্গে তোর দেখাশুনো আজকের নয়। মেয়েটার মনের কথা আমাকে সত্যি করে বল্ তো জীবেন?

বললুম, কাল যে আপনার সঙ্গে ঘণ্টা তিনেক এই নিয়ে আলোচনা করলুম?

কিচ্ছু মনে নেই বাবা, কেবল এই মনে আছে, তোদের দুজনের মনের কথা একটুও বুঝতে পারি নি।

আমি খুব হেসে উঠলুম।

শিবরানী বললেন, যাবার আগে একটা কথা আমাকে ঠিক করে বলে যা তো বাবা?

কি বলুন?

ঝুনুকে তুই বিয়ে করবি তো?

আমি বললুম, আপত্তি করেছি কোনোদিন?

তবে এ বিয়ে হচ্ছে না কেন, জীবেন?

সে আপনার মেয়েই জানে।—এই কথা বলে আমি বিদায় নিলুম।

টাঙ্গা গাড়িখানা আমাকে স্টেশনের দিকে নিয়ে চলেছে, আমি ভাবছিলুম নিঃসন্তান বড় মামীমার কথা। আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের দূরত্ব কম নয়, পারিবারিক যোগও অতি সামান্য। অথচ তাঁর দেওয়া মাসোহারায় আমি যে একপ্রকার মানুষ হয়েছি, এ কথা নির্ভুলভাবে জানি। শিবরানীর স্বামী ছিলেন কলকাতার নামকরা উকিল,—মৃত্যুর পরে জানা গেল শিবরানীর নামে প্রচুর সম্পত্তি। কিন্তু সেই সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী এখন হবে ঝুনু, অন্য ব্যক্তি আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। কুড়ি বাইশ বছর আগে শিবরানী তাঁর এক প্রতিবেশীর কাছ থেকে ঝুনুকে উপহার পান। মেয়েটি ছিল পিতৃহীন,—এবং এই দু বছরের মেয়েটাকে শিবরানীর হাতে সঁপে দিয়ে ঝুনুর মাও একদিন মারা যায়। শিবরানী ঝুনুকে নিয়ে দক্ষিণ কলকাতার নতুন বাড়ীতে উঠে আসেন। আমার মামা ছিলেন ঝুনুর গৃহশিক্ষক, এবং শিবরানীর স্বামীর মুহুরি। সেই সময় থেকে আমার দুঃস্থ অবস্থা শিবরানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর অকৃপণ দান এবং স্নেহের ভিতর দিয়েই বুভুক্ষিত বাৎসল্য নিজের পথ খুঁজে পাচ্ছিল। তাঁর উদার নীতি এবং বিবেচনা কখনও জাতি ও শ্রেণীবিচার করে নি।

কলকাতায় ফিরে যদিও ঝুনুর একখানা চিঠি পেলুম, তবুও আমার থামবার উপায় ছিল না। ঝুনু লিখেছে, তুমি লাগামছেঁড়া জন্তুবিশেষের মতন এখানে ছুটে আসবার চেষ্টা করো না। এটা গ্রাম,—শহর নয়। এখানে অসুবিধা অনেক, তার চেয়ে বেশী হলো দুর্দশা। তা ছাড়া আমাদের দলের কার্যকলাপের ফলে বিপদের ইসারা দেখতে পাচ্ছি। অদূর ভবিষ্যতে আমরা সুস্থ ও নিরাপদ থাকতে পারবো কিনা সন্দেহ। তুমি এসো না, কেননা আমার পা কেটে রক্ত ঝরলে বরং সইবে, কিন্তু তোমার পায়ে কাঁটা ফুটলে আমার সইবে কেন! ভয় হচ্ছে, এ চিঠি পেয়ে তোমার পৌরুষ ক্ষিপ্ত হয়ে না ওঠে।—

চিঠিখানা ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিলুম। ঝুনুর দাম আমার জীবনে সব চেয়ে বড়; কিন্তু তার কথার দাম?—পাগলে কী না বলে!

হয়তো দু'একদিন অন্য কাজে দেরি হতে পারতো, কিন্তু ঝুনুর চিঠির মধ্যে তার বিপদের যে নিশ্চিত নিশানা দেখতে পেলুম, তাতে আর দেরি করা চলে না। সুতরাং আমাকে কিছু টাকাকড়ি নিয়ে সেইদিনই রওনা হতে হোলো। আমি বিকালের ট্রেণ ধরলুম।

এই নিয়ে ঝুনুর কতবার হলো? গুনে দেখলুম বার চারেক। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সে বাইরে থাকতে পারে না, কেননা তার তরুণ বয়সটা প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শিখার মতো দপদপ করে জলে। এবার সে জেলে যাবার আগে জ্বালিয়ে তুলতে চায়। ঝুনু বলে, এতদিন পরে সে সত্যিকার পথ খুঁজে পেয়েছে। আমি বলি, এতদিন পরে সে সত্যি সত্যি পথ ভুল করেছে! আমি নিজে কারাবরণ করেছি বার দুই। আমার লক্ষ্য ছিল, প্রতিবাদ জানিয়ে ব্যবস্থাটাকে উল্টে দেবার জন্য। কিন্তু ঝুনুর লক্ষ্য অন্য প্রকার। শাসননীতিকে সে চূর্ণ করতে চায় বিপ্লবের দ্বারা। ফলে আমি যখন চরকায় সুতো কাটতুম, সে তখন গোপনে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এখানে ওখানে আনাগোনা করতো। এখন দাঁড়িয়েছে এই, আমাদের দুজনের লক্ষ্য এক হলেও পথ ও পদ্ধতি আলাদা।

একদিন তাকে বললুম, ঝুনু, তোমাদের সন্ত্রাসবাদে কাজ হলো কই?

ঝুনু বললে, কাজ হতো, কিন্তু লেখাপড়া জানা মধ্যবিত্ত সমাজে ওটা আবদ্ধ রইলো ব'লেই ওটার ধার ক্ষয়ে গেল! সাহেবকে মারবার দিন গেছে, এখন সাহেবদের তাড়াবার দিন।

বললুম, কারা তাড়াবে? তোমরা?

না—ঝুনু বললে, যারা সকলের চেয়ে নীচে, সকলের চেয়ে পেছনে, তারাই একদিন ওদের ঝেঁটিয়ে তাড়াবে!

আমরা পারবো না কেন?

ঝুনু বললে, আমরা ক্ষমতা পাবার লোভে ওদের সঙ্গে এতকাল ঝগড়া করেছি, আর ওরা এতকাল ধরে আমাদের জেলে পাঠিয়ে এসেছে। কিন্তু নীচের থেকে যারা উঠে আসছে, তারা কে জান তো? তুমি আমি নয়, তারা চিরবঞ্চিতের দল, তারা অন্নবস্ত্রের সাংঘাতিক অভাবে জলে পুড়ে যাচ্ছে তারা এসে অগ্নিকাণ্ড বাধাবে, তাদের হাতেই ওদের মৃত্যু।

আমি বলেছিলুম, কিন্তু ওপর থেকে ব্যবস্থাটা সম্পূর্ণ বদলে দিতে পারলে দেশের সত্যিকার মঙ্গল হতো, ঝুনু!

ঝুনু হেসে বলেছিল, ব্যবস্থাকে বদলানো যায় না জীবেন, ওটাকে ভেঙ্গে দিতে হয়। মানুষ বার বার সর্বনাশ ক'রেই মঙ্গলের পথ খুঁজে পায়! তুমিই বলেছ অন্যায় ব্যবস্থা শেকড় নামিয়েছে অনেক নীচে, সেটাকে নীচের থেকে উপড়ে না ফেললে নতুন যুগের বনেদ বানাবে কেমন করে?

কিন্তু সেটা শান্তির পথ নয়!

শান্তি?—ঝুনু তীব্র হাসি হেসেছিল,—জোড়াতালি দিয়ে শান্তি? সবাই মিলে এতকাল ধরে আমরা রাষ্ট্রবিপ্লবের বারুদ জমিয়েছি,—সেই বারুদের স্তূপ এবার বিরাট হয়েছে। এবার তার অবশ্যম্ভাবী বিস্ফোরণের পালা,—এখন ভয় পেয়ে হাতজোড় করো কেন? বৈশ্বানরকে পূজো ক'রে এসেছ এতদিন, এবার আগুন দেখে ভয়ে পালাও কেন?

কিন্তু নিরীহরা মরবে! নির্দোষরা ধ্বংস হবে। এই কি তুমি চাও?—আমি ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললুম।

ঝুনু বললে, আমাকে কথার ফাঁদে ফেলো না জীবেন! সামনে চেয়ে দেখো যুগান্তের কাল। চেয়ে দেখো মহাকালের ভ্রূকুটি। যারা এগোবে না তারা মরবে, যারা পিছন থেকে বাধা দেবে, কিম্বা চল্‌তি অন্যায় ব্যবস্থা আঁকড়ে থাকবে তারাও মরবে, যারা নতুন সৃষ্টির কাজে হাত দেবে না,—তাদেরও নিশ্চিত মৃত্যু। নিরীহ, নির্দোষ! শান্তিপ্রিয় নাগরিক! তারা কে? তারা জন্মায়, তারা মরে। তারা হলো মৌশুমী কীটপতঙ্গ। তাদের কোনো দাম নেই।

তর্ক থামিয়ে আমি শুধু প্রশ্ন করেছিলুম, তোমাদের পরিণাম কি?

ঝুনু হাসিমুখে জবাব দিয়েছিল, প্রচণ্ড আঘাত দিয়ে ওদের গুঁড়ো ক'রে দেবো, এবং প্রবল আঘাত খেয়ে নিজেরা গুঁড়ো হয়ে যাবো। আমরা সন্ধান দিয়ে যেতে চাই ভবিষ্যতের, কিন্তু ভবিষ্যৎ আমাদের হাতে নেই। নতুন রাষ্ট্র তৈরির কাজে লেগে গেল তোমার আমার কঙ্কাল, সেই আমাদের লাভ।

এবার ঝুনুর সঙ্গে আমার দেখা হবে বেশ কিছুদিনের পর। আগ্রায় কিছুকাল প্রফেসারী করতে গিয়েছিলুম, মাত্র মাস কয়েকের জন্য, আশা করেছিলুম একদিন হয়তো ঝুনুকে আমার কাছে আনতে পারবো। কিন্তু মুস্কিল এই, আমার কল্পনার পথে ঝুনু হাঁটে না। তাকে দেওয়ালঘেরা ঘরের মধ্যে ধরে রাখা যায় না, সুশৃঙ্খল গৃহব্যবস্থার মধ্যে সে একেবারেই বেমানান। তার মত এবং পথ দুই ভিন্নপ্রকার

মাঝরাত্রে গাড়ি বদল করে আবার গুছিয়ে বসেছি। বাইরে তুহিন ঠাণ্ডা হিমেল কুয়াশার ভিতর দিয়ে দূরে দূরে এক আধটা আলো দেখতে পাচ্ছি। দেশ গাঁয়ে অশান্তির চেহারা প্রবল। এখানে ওখানে শাসন সুশৃঙ্খলার তোড় জোড় আলগা হয়ে এসেছে। যে-সমাজটা কিছু সম্পন্ন ও সঙ্গতিপূর্ণ,—সেটা

আত্মরক্ষায় ব্যস্ত; যে সমাজটা শ্রমজীবী, সেটা উদ্‌ভ্রান্ত এবং লক্ষ্যহারা। এর পরে যে সম্প্রদায়টা থাকে, সেটা নীতিভ্রষ্ট, তার বুদ্ধিহীন আদর্শবোধশক্তিহীন নৃশংস নীতি দেশে অরাজকতা এনেছে। ফলে লুটতরাজ, হানাহানি ও ডাকাতিতে দেশের একটা অংশ অভ্যস্ত। এই সব কারণেই আমি ঝুনুকে ফিরিয়ে আনতে চাই।

ব্যক্তিগত জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের চিন্তা আমরা অনেকটাই যেন ভুলে গেছি। পারিবারিক জীবনের একটি কোমল আবেশ, যাকে চল্‌তি ভাষায় বলে—সুখের মধুর সঙ্কেত,—সেটি আর মনে পড়ে না। বছর দেড়েক আগে বড় মামীমা আর ঝুনুকে নিয়ে কয়েকদিনের জন্য শিমূলতলায় গিয়েছিলুম। বেশ মনে পড়ে সেটা চাঁদের পক্ষ, শেষ বসন্তের কৃষ্ণচূড়ায় তখনও রক্তিম রং ধরে রয়েছে। বড় মামীমা মনে করেছিলেন, আমাদের বিয়েটা এইবারেই বুঝি পাকাপাকি হবে। আমি ভাবতুম, এইবার হয়তো একটা নির্দিষ্ট জীবনের চেহারা দেখতে পাবো। সকালের নরম রৌদ্রে আমরা পশ্চিমের পথ ধরে যেতুম অনেকদূর, এ-মাঠ থেকে ও-মাঠ, এক বাগান পেরিয়ে ভিন্ন বাগানে, দুজনের পরিহাস, কোলাহলে অনেক সময় নির্জন পথ হয়তো মুখরিত হতো। হয়তো গলে যেতুম আমি, নয়তো ঝরাফুলের মতন বসে পড়তো ঝুনু। সবটাই সত্য, পরিবেশটাও রোমাঞ্চকর,—কিন্তু ঘণ্টাতিনেক ঘোরাফেরা করেও আমরা আসল কথাটায় পৌঁছতে পারতুম না। সেটা চক্ষুলজ্জা নয়, তারুণ্যের স্বাভাবিক জড়তাও নয়,—আমরা ব্যক্তিগত আলোচনা করবার সময় পেতুম না। মাঠে মাঠে সকালের শিশির শুকিয়ে যেতো, হাঁটতে হাঁটতে শিশিরের সেই বিন্দুগুলি ঝুনুর কপালের চুলের ঝলকে ফুটে উঠতো,—আমি তার হাতে সংগ্রহ করে দিতুম মাঠের পথের নামহারা ফুলের গোছা। তারপর রোদ বাঁচিয়ে একসময় কোনো এক ফসল-কাটা মাঠের প্রান্তে কাঁকরপাথরের ওপরেই দুজনে বসে পড়তুম।

ঝুনু একদিন বললে, আরো কিছুদিন এখানে থাকলে মন্দ কি?

থেকে লাভ কি?—বললুম।

তুমি কি লাভের লোভে এসেছিলে?—ঝুনু ভ্রূকুঞ্চন করলো।

আগে বলো লাভ-শব্দটা ইংরেজি, না বাংলা?

ঝুনু খিলখিল করে হেসে উঠলো। শূন্য প্রান্তরের বায়ুতরঙ্গে তার হাসি ভেসে-ভেসে চলে গেল অনেকদূর,—আমি ততদূর পর্যন্ত হাসিমুখে চেয়ে রইলুম; অর্থাৎ কোনো কথা এগোতে পারলো না।

ঝুনু একসময়ে বললে, তোমার লোভ আছে নানারকমের, কি বলো ?

বললুম, যথা ?

ঝুনু বললে, যথা টাকাকড়ি, যশ, প্রতিষ্ঠা, সম্পত্তি !

বললুম, তুমিই বা যোগিনী ভৈরবী হতে চাও কেন ?

ঝুনু বললে, ঝগড়া কোরো না, মন দিয়ে শোনো। আমি কিছু জমাতে চাইনে, চাই খরচ করতে। মনে রেখো ফতুর হওয়া খুব সহজ নয়।

চোখ পাকিয়ে আমি বললুম, তুমি না অর্থনীতিশাস্ত্রে এম-এ পাস করেছ ? তবে এত বেহিসেবী কেন ?

হাসিমুখে ঝুনু বললে, যেটা প'ড়ে পাস করলুম, সেই অর্থনীতিশাস্ত্রটা আগাগোড়াই ভুল। পাস করাটা আমার লজ্জা।—আচ্ছা, একটা কথা, মায়ের মতলবটা কি বলো তো ?

বললুম, বড় মামীমার ?—জলের মতন পরিষ্কার।

ঝুনু বললে, তুমি তো জানো আমি জাতি গোত্রহীন।

তোমার জাতি আর গোত্র দুটোই আছে, এটা বোধ হয় তুমি জানোনা !

ঝুনু কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইলো। পরে বললে, তুমি তো লোভী মানুষ,—আচ্ছা মায়ের সম্পত্তিটা তুমি নেবে ?

উষ্ণকণ্ঠে আমি বললুম, তুমি কি বলতে চাও সম্পত্তিটা তোমার চালচিত্র, আর তুমি হ'লে প্রতিমা ? আমাকে নীচে নামাতে চাও কেন ?

ঝুনু বললে, আমাকে ভুল বুঝে রাগ ক'রো না। সম্পত্তির হাত থেকে আমি মুক্তি চাই, এই আমার উদ্দেশ্য।

এর পরে আমরা চুপ ক'রে গিয়েছিলুম। কোনো একটা সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছবার আগ্রহ আমাদের দুজনেরই ছিল কম।

শিমুলতলার মাঠে জ্যোৎস্নার মোহ জ'মে উঠতো। উঁচু নীচু আলভাঙা মাঠ, কোথাও কোথাও হাঙরমুখো গহ্বর,—সেখানে বাঁকা চাঁদের আভা মায়াজাল রচনা করতো। চলতে চলতে এক সময় আমরা দৃশ্যলোক থেকে লুপ্ত হয়ে যেতুম।

ঝুনু এক সময় বললে, দেখেছ, আমাদের গলার আওয়াজে যেন শিমুলতলার ঘুম ভেঙে যায় !

বললুম, চোরের মতন চুপি চুপি হাঁটতেই বা ভালো লাগে কতক্ষণ ?

হাসিমুখে ঝুনু বললে, পায়রার প্রলাপ কি তোমার ভালো লাগতো ?

একেবারে ভালো লাগতো না, একথা বলা কঠিন। মানুষের মন তো!

ঝুনু বললে, তুমি উচ্ছন্নে গেছ।

বললুম, তুমি এটাকে স্বাভাবিক ব'লে মানতে চাও না, এইটিই তোমার স্বভাবের বিকার। বুদ্ধি আর বিচারের পাথর চাপিয়ে নিজেকে তুমি পিষে মারছ, ঝুনু। আমার আর কিছু বলবার নেই।—এই ব'লে আমি কয়েক পা এগিয়ে চললুম।

শোনো, জীবেন—ব'লে ঝুনু এগিয়ে এলো। ঝরাপাতার উপর দিয়ে তার পায়ের শব্দে তার মনের উত্তেজনাটাই জানা গেল। কাছে এসে সে আমাম একখানা হাত ধরলো। বললে, কুড়ি বছরেরও বেশী আমরা রয়েছি কাছাকা'ছি, আমাদের বোঝাপড়াটাও অতদিনের। আজকাল তুমি অধীর হচ্ছ কেন?

তার মুখের দিকে তাকালুম। চাঁদের আলোয় যতটুকু দেখা যায় ততটুকুই দেখলুম তার বড় বড় কালো চোখের অন্তর-রহস্যে। তারপর বললুম, বিজ্ঞান পড়োনি? মনোবিজ্ঞান?

মুখ টিপে হেসে ঝুনু বললে, মনোবিজ্ঞানে কোথায় আছে যে, তোমার আমার বিয়ে রাতারাতি না হ'লে আর দিন চলছে না?

এবার আমিও বেপরোয়ার মতো হাসলুম, বললুম, তুমি লক্ষ্য করোনি, এক জায়গায় আছে—শ্রীমতী ঝুনু আর শ্রীমান জীবেন এরা দুজনে জরায় জরোজরো না হ'লে এদের বিয়ে হবে না!

আমরা হাসিমুখে বাড়ী এসে ঢুকলেই বড়মামীমা উৎসাহ বোধ করতেন। কিন্তু আমাদের পরবর্তী আচরণ লক্ষ্য ক'রে এক সময় তাঁর মুখ মলিন হয়ে আসতো।

সেবার মেদিনীপুর কেন্দ্র থেকে ঝুনুর নামে পর-পর কয়েকখানা চিঠি আসার ফলে আমাদের শিমুলতলার বাসা ভেঙ্গে গেল।

ভোরের দিকে ট্রেন থেকে নামলুম। এখান থেকে নৌকায় কয়েক মাইল গেলে পাবো গৌরীগঞ্জ, সেখান থেকে গরুর গাড়ী, অথবা পায়ে হাঁটা পথ। আমি জিওলগাছি যাবো শুনে অনেকে আমার মুখের দিকে তাকাতে লাগলো। এ অঞ্চলে নানা গ্রামে আন্দোলন চলছিল, জিওলগাছির দিকে সে আন্দোলনের চেহারাটা কিছু কর্কশ,—এটা আমি এখানে পৌঁছেই বুঝতে পারলুম। কেউ মনে করলো আমি ছদ্মবেশী পুলিশের লোক, কেউ ভাবলো কুলকুড়ির জমিদারের

প্রতিনিধি, কেউ বা ইতিমধ্যেই ধ'রে নিয়েছে আমি কোনো এক রাজনীতিক দলের পাণ্ডা।

আমার নৌকা চলেছে খালের ভিতর দিয়ে। দুই পারে স্পষ্টই দেখা যায়, এগ্রামে ওগ্রামে জনসাধারণের মধ্যে চাঞ্চল্য। পুলিশ সাহেব আর সেপাইদের নৌকা নাকি কাল সন্ধ্যায় গিয়েছে এই পথ দিয়ে। আমার প্রতি আশপাশের লোকের চাহনিটা যেন কিছু অশ্রদ্ধায় ভরা। আমার উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ ছিল, কেননা ঝুনুকে নিয়ে আমি ফিরবো স্থির করেছি, এবং এই পথ দিয়েই আমাদের ফিরতে হবে। বাঙ্গলায় আবার সেই ঐতিহাসিক অরাজকতা ফিরে এসেছে।

গৌরীগঞ্জে এসে নৌকা থেকে যখন নামলুম বেলা তখন দশটা। ঝুনুকে একটা বাহাদুরী দিতেই হবে যে, এই সব দুর্গম পথ পেরিয়ে সে এসেছে কাজ করতে। এটা নগরের রাজনীতি নয় যে, এখানে কাজের ভান করলে যশ পাওয়া যায়, অথবা দেশসেবার অছিলায় স্বার্থোদ্ধার কিছু ঘটে। এটা দুর্গম গ্রামের পথ। প্রাণের তাড়া আর আদর্শের বেগ না থাকলে এই খ্যাতিহীন স্বার্থহীন কাজে নামা যায় না। আমি জানতুম, বিপ্লববাদিনী ঝুনুর কল্পনায় কী সাংঘাতিক আদর্শের ওলোটপালট ঘটেছে,—যার জন্যে তাকে ঝাঁপ দিতে হয়েছে এই জনসমুদ্রে। মহাজনজীবনের ক্ষুধা তাকে কোথাও স্থির থাকতে দিল না।

গরুর গাড়ীতে যাওয়া যেত, কিন্তু শীতের হাওয়ায় পা ছড়িয়ে হাঁটতে আমার ভালোই লাগছিল। তাছাড়া জিওলগাছির কয়েকজন সঙ্গীও পথে জুটে গেল। সুতরাং আমি হেঁটেই চললুম। শোনা গেল মাত্র মাইল চারেকের পথ।

সকালের সূর্যের আলোয় দেখা যায় আকাশ নীল মখমলের মতো। উত্তর পথের আকাশ পেরিয়ে শাদা হাঁসের পাল চলেছে—এদিকে কোথায় যেন আছে গাজনতলার বিল্। উদার দিগন্তের নীচে রয়েছে পাকা ধানের মাঠ— শীতের মধুর বাতাস সোনার মতো ঝলক দিচ্ছে। আমরা কোনো এক গ্রামের বাঁশবাগান পেরিয়ে বট আর অশ্বত্থের ঝুরির তলা দিয়ে এগিয়ে চলছি। জিওলগাছি এখনও অনেক দূর।

মাঠ থেকে গরুর গাড়ী বোঝাই দিয়ে ধান আসছে গ্রামের দিকে। এক একখানা গাড়ী ঘিরে জনতার কেমন একটা অস্বাভাবিক কোলাহল। কেউ কেউ মাথায় ক'রে আনছে শস্যসম্ভার। একদল চলেছে খোন্তা, লাঠি আর

রামদা সঙ্গে নিয়ে। আমার জনৈক সঙ্গী ধীরে ধীরে বললে, আজ মাসখানেক ধ'রে এই ডাকাতি চলছে, বাবু।

ডাকাতি!—আমি চমকে উঠলুম।

হ্যাঁ বাবু, দিনে ডাকাতি! দারোগা পুলিশের এক্তিয়ারে নেই, হিঁদু মোচলমান সব এক হয়েছে! খুন খারাপি চলছে চারদিকে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে চলুন।—আমার সঙ্গী আমাকে সতর্ক ক'রে দিল।

গ্রাম ছেড়ে আবার মাঠের পথ ধরেছি। পশ্চিমের মাঠ ধ'রে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে একটা মস্ত জনতা। ওরা ভীল জাতির লোক। কৃষ্ণকায়, অর্ধনগ্ন, ক্ষুধাতুর। কারো হাতে বল্লম, কেউ নিয়েছে কুঠার, কারো বা হাতে তীর ধনুক। ওদের কোলাহলে মাঠের পথ মুখরিত। ওরা নাকি সশস্ত্র হয়ে ফসল কাটতে চলেছে। ওরা অরণ্যবাসী, চিরবিপ্লবী, সভ্যতার থেকে ওরা বিচ্যুত, ওদের জাতিধর্ম স্বীকৃত নয়, ওরা সমাজ বিতাড়িত আদিবাসীর দল। ওরা এগিয়ে এসেছে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করতে। যারা ছিল নীচে অবহেলিত, অপমানিত আর সর্বহারা, তারা অন্ধকার অরণ্যলোক থেকে আলোর রেখা দেখতে পেয়ে ছুটে আসছে। যুগ যুগান্তের সঞ্চিত ক্ষুধায় হিংস্র তারা। তারা আসছে মাঠে মাঠে পঙ্গপালের মতন।

মছিন্দরের বাঁধ পেরিয়ে গেলুম। কিছুদূর গিয়ে দেখা গেল কয়েকটা তাঁবু পড়েছে,—সেখানে লাঠিধারী পাহারা। ওপাশে কয়েকখানা ধান বোঝাইকরা গরুর গাড়ী। এদিকের গাছতলায় ব'সে কয়েকজন লোক কি যেন একটা হাঙ্গামার আলোচনা করছে। আমার ভদ্রপোষাক দেখে তারা গলা নামিয়ে কি যেন কানাকানি করলো। আমি কোনোদিকে না তাকিয়ে এগিয়ে চললুম।

ফসলের মাঠে কোথাও কোথাও জনতা ঘনীভূত হয়েছে। বহু লোক মাথায় শস্য নিয়ে চলেছে। সহসা দূরের থেকে আমার কানে এলো কোলাহল, সে যেন অনেক দূর সাগরতীরের নিশ্বাসের মতো। দেখতে পাওয়া গেল, প্রান্তরের প্রান্তপথে কিষাণের দল চলেছে এগিয়ে। চারিদিক থেকেই আমি যেন একটা অজানা বিপদের আভাস পাচ্ছিলুম। এক সময় থমকে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলুম, আমরা ঠিক যাচ্ছি তো? জিপলগাছি আর কতদূর হে?

সঙ্গীরা বললে, এই তো বাবু, আর আধ ক্রোশও নয়। ওই যে তালতলায় বাঁধ, ওটা পেরোলেই পাবেন।

অপরজন বললে, কিন্তু ওদিকে বড় গোলমাল,—ওটা হলো এক নম্বর তাঁবু!

বললুম, গোলমাল কিসের?

ফসল ভাগ নিয়ে ঝগড়া। আপনি আর এগোন কেন, বাবু?

হাসিমুখে আমি বললুম, সেখানে যে আমার লোক আছে ভাই!

একজন বললে, কিন্তু বাইরের লোক সেখানে কেউ নেই।

কোথায় গেল তারা?

খুন হয়েছে অনেকগুলো, সেই ভয়ে তারা পালিয়েছে। আর কেউ নেই।

তাকে আশ্বাস দিয়ে আমি বললুম, আমি যাদের কাছে যাচ্ছি, তারা পালাবার লোক নয়।

আমার সঙ্গীরা হঠাৎ থমকে আমার দিকে ভ্রূকুঞ্চন ক'রে তাকালো। মুখেচোখে তাদের বিতৃষ্ণা ফুটে উঠতে দেখলুম। একজন তাদের মধ্যে উষ্ণকণ্ঠে জানতে চাইলো, আমি তবে পুলিশের লোক কিনা।

আবার আমি হাসলুম। বললুম, পুলিশের লোক নই, আমি দেশের লোক।

কিন্তু ভদ্দল্লোক দেখলে ওরা যে তেড়ে আসে বাবু।

কেন?

ভদ্দল্লোকদের ওরা বিশ্বাস করে না। আপনি কি ইংরিজি জানো।

বললুম, একটু আধটু জানি বৈ কি।

একজন উদ্বিগ্ন হয়ে বললে, সাবধান, ওরা যেন সে খবর না পায়, বাবু। আপনি একটু সজাগ হয়ে থেকো।

বোধ হয় আমাদের আলোচনাটা আর কিছুদূর এগিয়ে যেতো, এমন সময় দূরের জনসমুদ্রে একটা ঝড় উঠলো। সেই কলকোলাহলের চেহারাটা কি প্রকার, একথাটা অনুধাবন করার আগেই সহসা আমাদের সভয় সচকিত কানে বন্দুকের দুমদাম আওয়াজ এসে বাজলো। আমরা জিওলগাছির দক্ষিণ বাঁকে এসে পড়েছি।

মানুষের চিৎকারের কি ভীড়, তার সঙ্গে লাঠালাঠির ঠোকাঠুকির শব্দ,—আর তাকেই মাঝে মাঝে বিদ্ধ করছে অশ্রান্ত গুলিছোঁড়ার আওয়াজ। সন্দেহ নেই, আমি পলকের জন্য উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছিলুম। কিন্তু ঝুনু কোথায়? জিওলগাছির কোথায় তাকে খুঁজে পাবো? এই হানাহানির মধ্যে তার খবর কি কেউ রেখেছে? আমি আমার পা দুখানাকে যেন চাবুক মেরে সামনের দিকে ছুটিয়ে দিলুম।

এক নম্বর তাঁবু পেরিয়ে সামনে পাওয়া গেল মস্ত মাঠ, তার কোল ঘেঁসে চ'লে গেছে একটা খাল! সেখানে পুলিশের গুলীতে ছত্রভঙ্গ হয়ে শত শত

লোক নানাদিকে ছুটোছুটি করছে। সেই বিশাল রণক্ষেত্রের মাঝখানে দেখা গেল একদল সশস্ত্র পুলিশ। সামনের ভীড় ঠেলে আমি সেই পুলিশের দিকে অগ্রসর হবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু সেই লুটতরাজকারী উন্মত্ত জনতার ভিতর দিয়ে কিছুদূর এগিয়ে যাবার পথে সহসা কোন্‌দিক থেকে যেন আমার মাথায় লাঠির আঘাত পড়লো।

সূর্যের আলোটা হঠাৎ মলিন হয়ে এলো। আমি সেইখানে ব'সে পড়লুম, এবং কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে মাঠের মাটির ঢেলার উপর শুয়ে পড়লুম। কয়েক পলকের ভিতরে দেখে নিলুম আমি একা নই, এই মাঠে অনেককেই শুতে হয়েছে।

ঘুম ভাঙ্গলো এক নম্বর তাঁবুর একটা অংশে। সেটা হাসপাতাল। আমি খড়ের বিছানার উপর উঠে বসলুম। আমার সামনে ব'সে রয়েছে ঝুনু। মনে প'ড়ে গেল আমি জিওলগাছিতে। ঝুনু আমার দিকে চেয়ে হাসলো। আমার হাসিও যোগ ক'রে দিলুম।

ঝুনুর হাতে রক্ত, কাঁধে রক্তের ধারা, কপালের চুল বেয়ে রক্তের ফোঁটা নেমে এসেছে। তাঁর মুখখানা রোদপোড়া, শরীর কাহিল, চোখের কোলে কালো আভা। তিনমাস পরে ঝুনুকে দেখলুম, কিন্তু ছেঁড়া ও ময়লা জামা কাপড়ে তাকে এই প্রথম দেখলুম। আমার আগেই সে এসেছে তাঁবুতে। অস্ত্রোপচার ক'রে তার শরীর থেকে তিনটি গুলী বা'র করা হয়েছে।

তোমার মাথায় পড়েছে কিষাণের লাঠি, আমার গায়ে লেগেছে পুলিশের গুলী—ঝুনু আবার হাসলো।

কী ক্লান্ত আমরা, অথচ এই আমাদের সংগ্রাম মাত্র আরম্ভ। শত শত বছরের মারখাওয়া ওরা,—কল্প কল্পান্তের নরকঙ্কালের ধূলোয় উর্বর এই মাটি, যুগ যুগান্তের ক্ষুধাতুরাদের গর্ভে ক্ষুধিতের জন্ম হয়ে চলেছে এই মাটির উপর দিয়ে, উপবাসীর চোখের জলে ফসলের প্রাণ সরস হয়ে এসেছে চিরদিন। ওরা বীজ বুনেছে জন্মজন্মান্তর, মার খেয়েছে বংশপরম্পরায়, ওদের শোণিতবিন্দুর সেচনে সভ্যতার জয়তোরণ উঠছে দাঁড়িয়ে—

আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

যখন ঘুম ভাঙ্গলো, আসন্ন গোধূলির সোনার আলো এসে পড়েছে তাঁবুর ভিতরে। সেই আলো এসে ছুঁয়েছে ঝুনুর রক্তমাখা জামা কাপড়ে। ঝুনু স'রে এসেছে আমার কাছাকাছি। শুয়ে রয়েছে আমার পাশাপাশি। সে

কথা বলছে না, আর আমি কথা বলতে পারছি না। আমি একপ্রকার তন্দ্রার আবেশে আচ্ছন্ন।

অনেকক্ষণ পরে মৃদু জড়িত স্বর শোনা গেল তাঁবুর মধ্যে। সেই কণ্ঠস্বর ঝুনুর, কিংবা এই নূতন খড়ের কাঁচা গন্ধের তলা দিয়ে মাটির গভীর নীচের থেকে সেই স্বর ধ্বনিত হচ্ছে, বুঝতে পারা যায় না।

ওরা এতকাল দিয়ে এসেছে, এবার ওদের নেবার পালা। ওরা যে বহুকালের উপবাসী, তাই ওরা বেশীর ভাগটা চায়। ওরা চষেছে, ওরা বুনেছে, ওরা না খেয়ে মরেছে লোকপরম্পরায়। আরো কান পেতে থাকো। মাটির উপরতলাকার আপাতস্নিগ্ধতা দেখে বিভ্রান্ত হয়ো না, গভীর নীচে নামো, সেখানে গলিত অগ্নির সর্বনাশা প্রবাহ। নীচের দিকে অশান্তি যখন দেখা দেয়, তখন একপথ দিয়ে উঠে আসে আগ্নেয়গিরির লাভাপ্রবাহ—সব ছারখার করে। অন্তপথে আসে ভূমিকম্প, সভ্যতার বিরাট কীর্তির অবসান ঘটায়।

আতঙ্কে আমার শরীর যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো। এবার আমি উঠে বসলুম সজাগ হয়ে। আমার মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। চেয়ে দেখি ঝুনু এবার উঠে বসেছে। বললুম, তুমি কিছু বলছিলে?

না।

ঝুনু বললে, তুমি ফিরে যাও।

তোমাকে এখানে রেখে?

ঝুনু কম্পিত কণ্ঠে জবাব দিল, আমার কাজ এখনো শেষ হয়নি।

বললুম, আমারও কাজ আরম্ভ, ঝুনু!

ঝুনু কেঁপে উঠলো, তুমি এখানে থাকতে চাও?

তোমার বাকি কাজটুকু সেরে তোমাকে নিয়ে যাবো।

ঝুনু চুপ ক'রে রইলো কিছুক্ষণ। পরে বললে, এ যুদ্ধের শেষ নেই, জীবেন। চারিদিক থেকে হিংস্র শক্তি ঘিরেছে অভিমন্যুকে।

বললুম, অভিমন্যুটি কে?

শান্তকণ্ঠে ঝুনু বললে, ভালোবাসা। সকলের সমান ভাগ আর সমান অধিকার - এই কথাটার জন্ম হয়েছে ভালোবাসার থেকে ঈর্ষার থেকে নয়। এই প্রেম জীবন-দেবতার, একে বাঁচাতেই হবে পশুশক্তির কবল থেকে। ভালোবাসা মার খেয়ে এসেছে চিরদিন।

বললুম, পশুশক্তির সংহার হবে কোন্ পথে?

ঝুনু বললে, দেশজোড়া বিপ্লব। আর কোনো পথ নেই।

হঠাৎ বললুম, তুমি কাঁদছ কেন, ঝুনু? কী চাও?

ঝুনু সাড়া দিল না।

আমি তার অশ্রুর রহস্যলোকে যাবার চেষ্টা করছিলুম, এমন সময় দু'জন পুলিশ অফিসার তাঁবুতে এসে ঢুকলো। একজন বললে, আপনাদের দুজনকেই থানায় যেতে হবে।

মুখ ফিরিয়ে বললুম, কেন?

আপনাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে!

টেলিগ্রামটি এসেছিল অবশ্যই কোনও জরুরী খবর নিয়ে। কিন্তু অন্দর-মহলের আচরণ দেখলে একটু যেন আশ্চর্যই হতে হয়।

ডাকপিওন দাঁড়িয়েই রইল কতক্ষণ। বার দুই টেলিগ্রামের কথা বলা সত্ত্বেও কোনোদিক থেকে সাড়াশব্দ পাওয়া যায়নি। বেলা দুপুর গড়িয়ে গিয়েছে।

ভিতরে বাসন মাজতে বসেছিল বুড়ি ঝি, সে একবার মুখ বাড়িয়ে দেখে আবার গিয়ে কাজে বসল। বুড়ো রাঁধুনী বামুন খেতে বসেছিল, সে ভ্রূক্ষেপও করল না। পুরনো চাকর হরিপদ সেই যে বাড়ির ভিতর খবর দিতে গিয়েছে, এখনও বেরোয়নি। আশ্চর্য, জরুরী টেলিগ্রাম 'বলি করতেও দশ মিনিট লাগে।

অনেকটা সময় গেল বৈকি। তারপর একসময় ধীরে সুস্থে বড়পিসিমা ভিতর থেকে বেরিয়ে বাইরে এগিয়ে এলেন। তাঁর চলনে না আছে চাঞ্চল্য, মুখেচোখে না আছে বিন্দুমাত্র উদ্বেগ। এ-টেলিগ্রাম কে পাঠালো, কোথা থেকে আসছে এবং তাতে কী লেখা আছে, এ যেন সমস্তই তাঁর জানা।

ডাকপিওনও জানত এই বৃদ্ধা মহিলা সই করতে জানেন না। সুতরাং খামটি বৃদ্ধার হাতে দিয়ে যথারীতি এই কথাটি সে জানিয়ে গেল, ওটা সে নিজেই ঠিক করে নেবে।

খামখানা হাতে নিয়ে বড়পিসিমা কী যেন ভেবে একবার থমকে দাঁড়ালেন। ভ্রূকুঞ্চন নেই, চোখের অভিব্যক্তিও একপ্রকার দুর্বোধ্য এবং তাঁর শান্ত মুখের অন্তরালে কোথায় যেন একটি অতল গাম্ভীর্য এ টেলিগ্রাম পাওয়া সত্ত্বেও স্থির হয়ে রইল।

আশেপাশে এমন কোনও কৌতূহল নেই যে, দুর্ভাবনার কারণ ঘটবে। সুতরাং হরিপদ যখন তাঁর পথ ছেড়ে সিঁড়ির ধারে স'রে দাঁড়াল, বড়পিসিমা পাশ কাটিয়ে ধীর পদসঞ্চারে উপরে উঠে গেলেন।

এ-বাড়িতে হরিপদ সেই তরুণ বয়সে চাকরি নিয়েছিল, এখন তারও চুল সব সাদা হয়ে গিয়েছে।

পুরনো কালের চকমিলান মস্ত বড় বাড়ি। দোতলায় মার্বেল পাথর বসান

দরদালান পেরিয়ে যাবার সময় বড়পিসিমা আঁচলের চাবি দিয়ে কোণের ঘরের দরজাটি খুললেন এবং কয়েক পা এগিয়ে একটি সুন্দর কাচের টেবিলের চিঠির কেসে খামসুদ্ধ টেলিগ্রামটি গুঁজে রাখলেন। কেউ সেখানে তখন উপস্থিত থাকলে গুণে দেখতে পারত, এই নিয়ে মোট সাত-আটখানা টেলিগ্রাম ঠিক এই জায়গাটিতে ওই ভাবেই জ'মে উঠেছে। টেলিগ্রাম এখন কথায় কথায়।

বড়পিসিমা শান্ত মুখে আবার বেরিয়ে এসে ঘরে তালা বন্ধ করে নিজের মহলের দিকে গেলেন। কিন্তু অতবড় একখানা বাড়ির অন্তঃপুরে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবার আগে তিনি বিশেষ একটি ঘরের দরজার কাছে একবারটি দাঁড়িয়ে ভিতরের দিকে তাকালেন। সেখানে মেহগিনি পালঙ্কের উপরে সটান চিত হয়ে শুয়ে রয়েছেন অসুস্থ নীলাম্বরবাবু। তিনি জেগে রয়েছেন কিনা বলা কঠিন। কিন্তু স্থির হয়ে রয়েছেন। চোখ তুটি ঢাকা, বোধ করি চোখেরই কিছু অসুখ। বড়-পিসিমার সম্ভবত কিছু একটা সন্দেহই হয়ে থাকবে। তিনি ভিতরে গিয়ে খাটের পাশে একবারটি দাঁড়ালেন। তাঁর আন্দাজটি মিথ্যে নয়। নীলাম্বর বেহুঁশ হয়েই রয়েছেন, তাঁর জ্ঞান নেই! বড়পিসিমা পুনরায় স্থির হয়ে অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর মুখ ফিরিয়ে যখন চ'লে যাবার উপক্রম করছিলেন, সেই সময় একটি সাদা পোশাক-পরা নার্স এসে ঘরে ঢুকল।

বড়পিসিমা এবার মেয়েটির দিকে চেয়ে ঈষৎ স্মিতমুখে ঘাড় নেড়ে মুখ বুজেই বেরিয়ে গেলেন। তাঁর সেই নীরবতার মধ্যে প্রশ্ন এবং উত্তর এ-তুটো সমান-ভাবেই যেন মিলেছিল। কিন্তু সমগ্র ব্যাপারটি থেকে একটি কথাই যেন প্রকাশ পাচ্ছে, যা কিছু দৃশ্যমান সমস্তটাই নিত্যনৈমিত্তিক, যেন অনেকটা নিয়মবাঁধা। এ-বাড়িতে মানুষের সাড়াশব্দ যে কম, এটি সেই নিয়মেরই অঙ্গীভূত। বাইরে মস্ত কলকাতা শহরের আধুনিক জন-কোলাহল এই পল্লীর দূর প্রান্ত অবধি হয়ত এসে পৌছেচে, কিন্তু এতদূর পর্যন্ত আজও আসেনি। সেই কারণে এ-বাড়ির অন্তঃপুরটি যেন আজও এক টুকরো প্রাচীন কাল এবং বৈচিত্র্য আজও কোথাও চোখে পড়ছে না। দক্ষিণের ছোট ছাদের আশেপাশে যে কাঠের কোটরগুলির মধ্যে একদল পায়রা বাসা বেধে রয়েছে, তারাও অনেক কালের,—জন্মমৃত্যুর ধারার ভিতর দিয়ে তাদেরও সরায়নি কেউ। মাঝে মাঝে তাদের কণ্ঠের একটা ক্লান্ত রব শুধু এই মস্ত বাড়িখানাকে প্রাণের সাড়ায় একটু চেতিয়ে তোলে মাত্র। নচেৎ দিবারাত্র যেন একটা নিঃশব্দ কৌতূহল এই বিরাট পুরীর উপর তার মস্ত ছায়াটা ফেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বিকালের দিকে এক-একটি ঘরে তালা খুলে মুখ বুজে হরিপদ যখন

ঝাড়ামোছায় কাজে ব্যস্ত, সেই সময় অন্য একটি ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে একটি সুশ্রী তরুণ যুবক বললে, 'আমাকে বলনি কেন বুড়োদা, আজ আবার টেলিগ্রাম এসেছে ?

হরিপদ মুখ ফিরিয়ে বললে, ও আবার বলব কী ! হপ্তা-হপ্তাই তো আসে। তুমি তখন কলেজে ছিলে।

টেলিগ্রামখানা হাতে নিয়ে ছোকরা ছুটল ভিতর-মহলে। পূবদিকের বারান্দা পেরিয়ে সোৎসাহে একখানা ঘরে ঢুকে চাপা উত্তেজনায় সে চেঁচিয়ে উঠল, বড়পিসিমা, খবর শুনেছ তো ?

সেলাইটি সরিয়ে চশমা সমেত মুখখানা তুলে বৃদ্ধা প্রশ্ন করলেন, 'সুশান্ত, কখন এলি কলেজ থেকে ? কিসের খবর ?

হাসিমুখে অধীর ঔৎসুক্য চেপে রেখে রুদ্ধশ্বাসে সুশান্ত বললে, বাঃ, এই তো আজকের টেলিগ্রাম। দাদা আসছে !

এবার যেন ঈষৎ সচেতন হয়ে উঠলেন বড়পিসিমা। এ-টেলিগ্রামে যে নতুনত্ব ছিল, সেটি তিনি আগে বোঝেননি। এবার যেন তাঁর অটল গম্ভীর মুখের চেহারায় কিছু রক্তের সজীবতা দেখা দিল। শুধু বললেন, আসছে ? কবে ?

তোমার এক কথা! কবে কী বলছ ? এক্ষুনি— হাসিখুশি মুখে সুশান্ত বললে, দু ঘণ্টার মধ্যে। আমাকে স্টেশনে যেতে বলেছে। গাড়ি নিয়ে আমি চললুম।

পুনরায় ছুটে চলে যাবার আগে সুশান্ত আরেকবার থমকে দাঁড়াল। বললে, আচ্ছা বড়পিসিমা, দাদা বিলেত গিয়েছিল প্রায় আড়াই বছর হতে চলল। এখন কত বদলে গেছে। আমাকে যদি চিনতে না পারে ?

চিনবে বৈকি বাবা, বড়পিসিমা বললেন, হয়ত আগে যাদের চিনতে পারেনি তাদেরও চিনবে।

কথাটার একটা নিহিতার্থ হয়ত ছিল, ক্ষণকালের জন্য সুশান্ত একবার পিসিমার দিকে তাকাল, তারপর বললে, আমি যাই বড়পিসিমা—

সুশান্ত দ্রুতপদে দরদালান পেরিয়ে চ'লে গেল। ওদিকের ঘর থেকে বৃদ্ধ নীলাম্বরের নার্স মেয়েটি কেবল একবারটি নিজের মুখ বাড়িয়ে সংবাদটি জেনে নিল।

ট্রেন এসে যখন হাওড়া স্টেশনে দাঁড়াল, সুশান্ত তখন দুজন বন্ধু সঙ্গে নিয়ে অধীর উৎসাহে দাঁড়িয়ে। একালে দ্রুতগতির যুগে আড়াই বছর সময়টা

নেহাত কম নয়। চেনা মানুষও অচেনা হয়ে যায় অল্প সময়কালে, এমন উদাহরণও মেলে। নানা উৎকণ্ঠা নিয়ে সুশান্ত এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল।

হাসিমুখে নামলেন প্রফেসর প্রশান্ত রায়। রং হয়েছে ভয়ানক ফর্সা এবং চোখে চশমা উঠেছে। সুশান্ত কয়েক পা গিয়ে যেতেই তিনি সোজা ছোট ভাইটিকে পরম সমাদরে বুকের মধ্যে একেবারে জাপটে ধরলেন। দুজনের মধ্যে বার তের বছর বয়সের তফাৎ। অন্য ছেলে দুটি একে একে এগিয়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিল। প্রশান্ত তাদেরকেও সস্নেহে আদর করলেন।

ভুরু কুঁচকে হাসিমুখে প্রশান্ত বললেন, তুই যে অবাক করলি রে, সুশান্ত। চেহারা চালচলন সবই বদলে গেছে তোর! দাড়ি কামাচ্ছিস কবে থেকে?

মস্ত হাসির ফোয়ারা ছুটল বন্ধুমহলে। সুশান্ত বললে, দাদা, আমরা জানতুম তুমি ফিরবে জুলাইতে, হঠাৎ মার্চে ফিরে এলে যে?

বন্ধুরা জিনিসপত্র নামাতে ব্যস্ত ছিল। প্রশান্ত বললেন, বাঃ, তোদের জন্যেই তো ফিরতে হলো। খোঁজখবর তেমন বিশেষ পাচ্ছিনে, চিঠিপত্রেরও গোলমাল —ডিগ্রিটা হাতে ক'রে আর আনা হলো না। নিউইয়র্কে যাবার কথা উঠেছিল, কিন্তু আমিই গা করলাম না। কেমন যেন আর ভাল লাগছিল না রে।

মালপত্র এমন কিছু সঙ্গে আসেনি। ছোটখাট জিনিসপত্র সমেত সেগুলি গুছিয়ে নিয়ে ছাত্র দুটি যখন ওদের সঙ্গে এগিয়ে চলল, তখন এক ফাঁকে প্রশান্ত ঈষৎ কৌতূহলী প্রশ্ন করলেন, বাড়ির গাড়ি এনেছিস, না ট্যাক্সি?

সুশান্ত বললে, না না, তোমার গাড়িই এনেছি। ফুলসিং বাইরে অপেক্ষা করছে।

প্রশ্ন সেটা নয়, আরেকটা। প্রশান্ত বললেন, আমি ভেবেছিলুম তোর বৌদি আসবেন তোর সঙ্গে। তোরা আজকাল খুব ব্যস্তবাগীশ লোক হয়েছিস নাকি?

না, কই — সুশান্ত একটু বিমনাভাবে জবাব দিল।

বাইরে আসতেই ফুলসিং হাসিমুখে করজোড়ে নমস্কার জানাল। তার পিঠে হাত রেখে প্রশান্ত কুশলপ্রশ্নাদি করলেন। ওদের সঙ্গে ছাত্রদুটিও গাড়িতে উঠে এল। প্রশান্ত গুছিয়ে ব'সে বাড়ির খবর নিতে গিয়ে শুনলেন, মেজকাকা অতিশয় পীড়িত।

ওঃ সেই জন্যেই—প্রশান্ত ঈষৎ সহজ হয়ে বললেন, ফুলসিং, একটু তাড়াতাড়ি যেও।

মিনিট কুড়ির মধ্যেই ভবানীপুরের মস্ত বাগানবাড়ির ভিতরে গাড়ি এসে

দাঁড়াল। হরিপদর সঙ্গে এসে দাঁড়াল বুড়ী ঝি আর ঠাকুর। কিন্তু হৈচৈ সীমাবদ্ধ রইল ওইটুকুর মধ্যেই। মা মারা গিয়েছেন বছর দেড়েক আগে হঠাৎ হৃদরোগে। বাবা অনেক কাল আগেই গিয়েছেন। বিয়ে হয়ে চ'লে গিয়েছে দুই বোন। সুতরাং অভ্যর্থনা জানাবার লোক এখন কম। প্রশান্ত ওরই মধ্যে ওদের সঙ্গে অল্পসল্প আলাপ ক'রে সোজা ভিতরে গেলেন এবং প্রথমেই যাঁর মুখোমুখি হলেন, তিনি বড়পিসিমা।

হেঁট হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে প্রশান্ত বললেন, আমাকে একটু তাড়াতাড়িই চ'লে আসতে হলো বড়পিসিমা—

বড়পিসিমার গাম্ভীর্য কাটল না, উদ্দীপনার লক্ষণ দেখা গেল না, শুধু শান্ত-কণ্ঠে জবাব দিলেন, আরেকটু তাড়াতাড়ি এলেই ভাল করতে!

আড়াই বছর পরে এ-ধরনের অভ্যর্থনা ঠিক মানানসই নয়। প্রশান্তর সচেতন মন উৎসুক হয়ে কিছু একটা কৌতূহল নিয়ে ঘুরছিল আশেপাশে। কিন্তু বড়পিসিমা কী বলতে চাইলেন ঠিক বুঝতে না পেরে প্রশান্ত বললেন, আচ্ছা, আগে দেখে আসি মেজকাকাকে।

দ্রুতপদে দরদালান পেরিয়ে প্রশান্ত এলেন নীলাম্বরের ঘরে। ভিতরে আলো জ্বলেছে এরই মধ্যে। সামনেই নার্সকে দেখে তিনি একটু থতিয়ে গেলেন। মহিলাটি নিজেই উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানিয়ে বললেন, আমি ওঁকে দেখাশোনা করি। প্রায় সারাদিনই থাকি।

কাছে এসে কিছু বোঝা গেল না। নীলাম্বরের দুই চোখ বাঁধা। চোখে অস্ত্রোপচার হয়েছে বটে, কিন্তু ধরেছে অন্য রোগ। ডাক্তার নাকি একপ্রকার জবাব দিয়ে গিয়েছে জানা গেল। নার্স বললেন, বেহুঁশ হয়ে রয়েছেন আজ সতের দিন হলো। জ্ঞান ফিরছে না।

পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন বড়পিসিমা। এবার ধীরে ধীরে বললেন, সময়-কালে নীলাম্বর সংসার করলে আমি ছুটি পেতুম।

প্রশান্ত একবার ফিরে তাকালেন। ঘড়ির টিকটিক শব্দটা শোনা যাচ্ছিল বাইরের দরদালান থেকে। আজ এতদিন পরে বাড়িতে এসে প্রথম দাঁড়িয়ে সমস্ত ব্যাপারটা অনুধাবন ক'রে নিতে অনেকটা সময় লাগছে বৈকি। একটু ধীর কণ্ঠে প্রশান্ত বললেন, ডাক্তার কি আসবেন এর মধ্যে?

জবাব দিলেন নার্স। পরিচ্ছন্ন মুখখানা রোগীর দিক থেকে ফিরিয়ে মহিলা বললেন, অবস্থা একই রকম রয়েছে, সেজন্য ডাক্তার বোধহয় আজ আর আসবেন না।

প্রশান্ত ঘর থেকে বেরিয়ে চ'লে গেলেন।

পরিপাটি পরিচ্ছন্ন তাঁর নিজের ঘর। আড়াই বছর পরেও সে-ঘরে ঢুকে অপরিচিত কিংবা নতুন মনে হচ্ছে না। প্রায় আধ ঘণ্টা হলো বৈকি, কিন্তু কারও পায়ের শব্দ শোনা গেল না। ঘরের ছবিগুলো ঝলমল করছে। ধবধবে বিছানাটি ঠিক যেমন থাকা উচিৎ। টেবিলটি সযত্নে গোছানো। একটু আগে কেউ একজন একটি ধূপ জালিয়ে গিয়েছে। ধোওয়া একখানি ধুতি এইমাত্র বের ক'রে আলনায় টাঙানো। নীলাভ আলোটি জ্বালা বাথরুমে। মুখ ফিরিয়ে প্রশান্ত দরজার দিকে একবার তাকালেন। সন্দেহ নেই, পাশেই রয়েছে—যার থাকবার কথা। দীর্ঘকালের ব্যবধানে চক্ষুলজ্জা এসে একটু বাধ দেয় বৈকি। আর তা ছাড়া বিয়ের ছ' মাস পরেই তো প্রশান্তকে হঠাৎ চ'লে যেতে হয়েছিল। সোশ্যাল সায়ান্সে ভালরকমের একটা ডিগ্রি না পেলে তাঁর চলবেই বা কেমন ক'রে। তাঁর অধ্যাপনার জীবনে ওটা কাজে লাগা চাই বৈকি।

উঠে দাঁড়িয়ে একটু গলার আওয়াজ ক'রে হাসিমুখে তার বলতে ইচ্ছে হলো, সামনে এসে দাঁড়াও, লজ্জা কিসের? পিসিমা কাছাকাছি নেই, দেওর রয়েছে বাইরের ঘরে, আর কেন লুকিয়ে?

কিন্তু এতক্ষণকার আচরণে এবার একটু যেন অবাক হতে হয়। কাপড়-চোপড় বদলে প্রশান্ত একবার বাইরে এলেন। সমস্ত দরদালানটা শূন্য, সমস্ত বাড়িটা শূন্য। আগ্রহ এবং সমাদরের স্পর্শ কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না, কেউ যেন তাঁর জন্য বিন্দুমাত্রও অপেক্ষা ক'রে ছিল না। নিজের বাড়িতে তিনি এসে ঢুকলেন যেন অবাঞ্ছিত অতিথি। সবিস্ময়ে প্রশান্ত একবার চারিদিকে তাকালেন।

একখানা ট্রে-র উপর বসিয়ে বুড়ো হরিপদ এবার এক পেয়ালা চা নিয়ে এল। প্রশান্তর জন্মের আগে থেকে লোকটা এ-বাড়িতে কাজ করছে, সুতরাং এমন কোনও প্রশ্ন তাকে করা চলবে না যেটা চটুল শোনায়। চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রেখে হরিপদ বললে, খাবার তৈরী হচ্ছে, এখুনি আনব।

নতুন খবর-টবর কিছু আছে বুড়োদা?

কই না। হরিপদ আস্তে আস্তে চ'লে গেল।

চায়ে একবার চুমুক দিয়ে প্রশান্ত টেবিলের কাছে এসে দাঁড়ালেন। তাঁরই পাঠানো খান আষ্টেক টেলিগ্রাম পর পর তারিখে সাজানো। তাঁর নিজের চিঠিও কয়েকখানা গোছানো রয়েছে—বিলেত থেকে লেখা। টানাটা খুললেন প্রশান্ত। ভিতরে কতকগুলো এলোমেলো কাগজ, এবং তাদের দু-একখানায় স্ত্রীর হাতের

লেখা অসমাপ্ত চিঠি। হাসি এল তাঁর মুখে। মেয়েছেলে এম-এ পাস করলে কী হবে, স্বাভাবিক কুণ্ঠা এখনও কাটেনি! স্বামীকে লিখতে গিয়ে ওরই মধ্যে আড়ষ্টতা। ভাষাটা পছন্দ হয়নি বার বার তাই বাতিল করতে হয়েছে। কাগজপত্রের মধ্যে বন্ধু অতুলচন্দ্রের একখানা পোস্টকার্ড: করকমলেষু, গত কিছু দিন থেকে আপনার খবর নিতে পারিনি, সেজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। প্রশান্তর চিঠি পেলুম, এ-বছরে সে ফিরবে মনে হচ্ছে না। আপনার চিঠি পেয়ে সুখী হলুম। আশা করি এতদিনে কতকটা সুস্থ হয়েছেন। ইতি—

সাত আট মাস আগের পুরনো তারিখের কার্ড। কিন্তু তাঁর স্ত্রী লাবণ্য কোনোদিন অসুস্থ হয়েছিল, একথা তাঁকে একটি বারও জানানো হয়নি। স্ত্রী অসুস্থ হলে স্বামীকে জানানো হবে না, বিচিত্র বটে। লাবণ্যর ছেলেমানুষি আজও কাটল না।

হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালেন প্রশান্ত। এখনও ঘরে ঢুকল না লাবণ্য, সকলের আগে যার ছুটে আসবার কথা। এ-আচরণ একটু অসঙ্গত বৈকি। মিথ্যে নয়, এক বছরের নাম ক'রে তিনি বাইরে গিয়েছিলেন, কিন্তু হয়ে গিয়েছে আড়াই বছর। তাই ব'লে চিঠিপত্র বন্ধ করল লাবণ্য আজ তিন মাস। কই, গেল বছরের মতো এ-বছর লাবণ্য মাথার দিব্যি দিয়ে লেখেনি তো যে তোমার ওই সোশ্যাল সায়ান্সের ডিগ্রির দাম মেয়েমানুষের জীবনে সামান্যই! লিখেছে শুধু এটা ওটা, আজে-বাজে সিনেমার ছবির গল্প,—কিন্তু একথা লেখেনি, তুমি পত্র-পাঠমাত্র চ'লে এসো।

বাইরে এসে দাঁড়ালেন প্রশান্ত। বড়-পিসিমা দ্বিতীয়বার আর খোঁজ নিতে এলেন না। কেন জানি তাঁর গাম্ভীর্য যেন একটু নতুন ক'রে দেখা গেল এতদিন পরে। কিন্তু তিনি বোধহয় ভাবছেন, লাবণ্য আছে কাছাকাছি সে-ই যা হয় দেখাশোনা করছে এতক্ষণ! এবার যেন একটু খটকা লাগছিল।

নিজের মনের হিসাব নিয়ে প্রশান্ত যখন চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে, সেই সময় হরিপদ খাবারের ট্রে নিয়ে উঠে এল। তিনি একবার মুখ ফিরিয়ে তার দিকে তাকিয়ে বললেন, ও কী করলে? আমার যে এখনও স্নান হয়নি। আমি নিজেই খাবার চেয়ে নেব।

কলের পুতুলের মতো হরিপদ যেমন এসেছিল, ঠিক তেমনি আবার ফিরে চলল। হাসিমুখে প্রশান্ত ডাকলেন, অত রাগ করলে কেন বুড়োদা, মাইনে পাওনা বুঝি?

পাই—হরিপদ শান্ত মুখে আবার নেমে গেল।

প্রশান্ত যেন মূঢ়ের মতো চুপ ক'রে রইলেন।

লাবণ্য এল না, সুতরাং এতক্ষণ পরে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল যে, এ-বাড়িতে সে উপস্থিত নেই। স্নানাদি সেরে এসে প্রশান্ত প্রস্তুত হয়ে খেতে বসলেন। আহারে রুচি ছিল কম এবং তার কারণও ছিল। বছর খানেক আগে লাবণ্যর এক চিঠিতে একটি ছত্রে ঈষৎ একটু আভাস ছিল এই, বড়-পিসিমার সঙ্গে লাবণ্যর কোথায় যেন একটু বিরোধ ঘটছে। কিন্তু সেই বিরোধের বিস্তারিত বিবরণ কিছু দেওয়া ছিল না। অত্যন্ত বেদনার কথা—সম্ভবত সেই মতদ্বৈধতা মনোমালিন্যে পরিণত হয়েছে। তবু প্রশ্নটা যাই হোক, মীমাংসা একটু বিচিত্র বৈকি। এত বড় বাড়িতে লাবণ্যর জায়গা হয়নি এবং তাকেই বাড়ি ছেড়ে চ'লে যেতে হয়েছে, এটি অত্যন্ত বিস্ময়ের কথা।

জলযোগ সেরে উঠে দাঁড়াতেই বাইরে পায়ের শব্দ শোনা গেল। সুশান্ত হাসিমুখে ঘরে এসে দাঁড়াল। বললে, দাদা, বাইরের ঘরে বন্ধুরা এসেছেন, তুমি একটু চলো।

কেন রে?

বাঃ, এতদিন পরে তুমি এলে, ওরা তোমার কাছে গল্প শুনতে চায়!

প্রশান্ত সহাস্যে বললেন, বিলেতের সব গল্পই তো পুরনো!

তা কেমন ক'রে হবে? সুশান্ত অনুযোগ জানাল, তোমার চোখ নতুন, তাই গল্পও নতুন। আসছ তো?

চল যাচ্ছি—আচ্ছা শোন, সুশান্ত?

সুশান্ত থমকে দাঁড়াল। প্রশান্ত বললেন, তোর বৌদি বাড়িতে নেই কেন রে?

সন্ধ্যার আবছায়ায় সুশান্তর মুখের চেহারাটা সহসা স্পষ্ট দেখা গেল না। সে কেবল বললে, ছিলেন তো, এখন নেই।

জবাবটা অদ্ভুত বটে। হঠাৎ প্রশান্ত কী যেন ভেবে চুপ ক'রে গেলেন। লাবণ্য গিয়েছে তার বাবার ওখানে টালিগঞ্জে, সেটি স্পষ্ট। অতএব তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন, পিসিমার সঙ্গে কী নিয়ে তোর বৌদির তর্ক বেধেছিল, বলতে পারিস?

তর্ক? সুশান্ত বলল, কই, আমি তো কিছু জানিনে?

মানে, কথা কাটাকাটি হয়েছিল কী নিয়ে তাই জিজ্ঞেস করছি।

কথা কাটাকাটি পিসিমার সঙ্গে? না তো!

ও—প্রশান্ত বললেন, আচ্ছা চল, আমি আসছি।

সুশান্ত সোৎসাহে নীচে নেমে গেল। ঘরের ভিতরে এসে প্রশান্ত কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন, টেবিলের উপর এটা ওটা নাড়াচাড়া করলেন। কিছু যেন একটা সঠিকভাবে তিনি বুঝবার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু নানান সামগ্রীর নানা প্রকার ওলট-পালটের ভিতর দিয়েও তাঁর প্রশ্নটার মীমাংসা হলো না।

এক সময়ে জামাটা চড়িয়ে তিনি নীচে নেমে গেলেন। তাঁর মুখের উপরে যে ছায়াটা পড়েছে সেটা উত্তেজনার। সেটা চাপা বটে, কিন্তু প্রবল। উগ্র নয়, কিন্তু কঠিন।

বাইরের ঘরে বসে ছিল প্রশান্তর একজন সহপাঠী, এবং দুজন তাঁরই সতীর্থ অধ্যাপক। নরেনবাবুই তাঁদের মধ্যে আগে হৈ-হৈ ক'রে উঠলেন, তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন মণিমোহনবাবু। বাস্তবিক, অনেক কাল পরে দেখা বৈকি। না, প্রশান্ত সাহেব হয়নি। বরং একটু বেশীরকম বাঙালী হয়েই ফিরেছে। সিগারেট ছেড়েছে। বাঙলার সঙ্গে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ ইংরেজী মিলিয়ে কথা বলছে না। কথায় কথায় সাহেব বন্ধুর উল্লেখ করছে না।

ওরা সবাই প্রশান্তকে দেখে ভারী খুশী হলো।

মণিবাবু বললেন, কেমন সব দেখে এলে হালচাল, দু-এক কথা বলো ভাই, একটু শুনি।

খুব হাসাহাসি চলল। প্রশান্ত বললেন, বেশ তো, এক সময়ে ব'সে ব'সে সব গল্প বলব, অনেক রকমের কথা আছে। কিন্তু আজ নয়, আরেক দিন। কিছু মনে করো না, আমাকে এখুনি বেরোতে হচ্ছে বিশেষ কাজে। শুধু একটি কথা ব'লে যাই, কী দেখে এলুম, সে-কথা এখন থাক, কিন্তু যা বুঝে এলুম তার ধাক্কা থেকে আমাদেরও রেহাই নেই।

কী রকম? কেন বলো তো?

প্রশান্ত বোধ করি তাঁর পূর্বের উত্তেজনাবশতই বললেন, ঘর আমাদের ভেঙে যাবে, পারিবারিক জীবন চূর্ণবিচূর্ণ হবে। যা দেখে এসেছ এতকাল, তার কিছু থাকবে না, যা জানার অভ্যাস নিয়ে আছ, তা মিথ্যে হয়ে যাবে।

হাসি-পরিহাস যেন হঠাৎ থেমে গেল। প্রশান্ত একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, খ্রীষ্টান বিলেত আর ইউরোপ আজ সংশয়ে আচ্ছন্ন।

কিসের সংশয়?

ঈশ্বর-সংশয়। গির্জায় রস নেই, পারিবারিক জীবনে বাঁধন নেই, স্বামীস্ত্রীর সম্পর্কে বাধ্যবাধকতা পাওয়া যাচ্ছে না, সন্তান-সন্ততির জন্য নৈতিক দায়িত্ব বাপ-মা আর নিতে চাইছে না। বাইরের দিকে দেখে এসো, প্রকাণ্ড সম্পদ

মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, কিন্তু সৃষ্টি ছারখার হচ্ছে ভিতরে ভিতরে। এই সর্বনাশের মধ্যে নতুন সৃষ্টির বনেদ কোথায় উঠছে কেউ জানে না, কিন্তু এই সাংঘাতিক ধাক্কায় আমাদেরও এবার রেহাই নেই। এই ভাঙনে আমাদেরও কিছু থাকবে না—আচ্ছা ভাই, আজ আমাকে একটু ছুটি দাও তোমরা।

ফুলসিং গাড়ি নিয়ে বাইরে প্রস্তুত হয়ে ছিল। প্রশান্ত বেরিয়ে এসে সটান গাড়িতে গিয়ে উঠলেন। বন্ধুরা পিছন দিকে স্তব্ধ হয়ে রইল।

উত্তেজনাটা কমেনি, কিন্তু প্রশান্ত বরাবরই সংযতবাক। ছাত্ররা তাঁকে পছন্দ করে বোধ করি বাকস্বল্পতা এবং মিষ্ট ব্যবহারের জন্য। গাড়ি ছাড়বার পর তিনি আপাত শান্ত কণ্ঠে বললেন, টালিগঞ্জের ও-বাড়িতে নিয়ে চলো, ফুলসিং।

মনে তাঁর নানা প্রশ্ন ছিল এবং কৌতূহল ছিল আরও বেশী। টেলিগ্রাম ওভাবে সাজানো থাকে কেন, টানার ভিতরকার কাগজপত্র কেন অমন এলো-মেলো, পিসিমার ওই অবিচল গাম্ভীর্য এবং অমনভাবে নিস্পৃহ উদাসীন থাকা, তার সঙ্গে হরিপদর এবম্বিধ আচরণ—সমস্তটার পিছনে কেমন যেন দুর্বোধ্য রহস্য থেকে যাচ্ছে। ছেলেমানুষ সুশান্তকে যেটুকু জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে, তার বেশী আর তাকে নাড়াচাড়া করা চলবে না। কিন্তু আড়াই বছর পরে লাবণ্যর সঙ্গে এবার যখন দেখা হবে, তখন প্রথম সম্ভাষণটা কী দাঁড়াবে—ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। পিত্রালয়ে সে গিয়েছে, কিন্তু তিন মাসের মধ্যে না দিয়েছে টেলিগ্রামের জবাব, না লিখেছে বিস্তারিত পত্র। একবারও বলেনি যে, সে শশুরবাড়িতে নেই এবং ঠিকানা বদলেছে। একটিবারও এই কথা লেখেনি যে, যে-বাড়িতে তার নৈতিক এবং ন্যায়শাস্ত্রসম্মত অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকার কথা, সেখানে তার ঠাঁই হয়নি।

প্রশান্তর মনে উত্তেজনা আরও ছিল এই কারণে যে, সে এখনি—লাবণ্য যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন,—তাকে নিয়ে ভবানীপুরের বাড়িতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবে, স্বামীর অনুপস্থিতিতে স্ত্রীর জায়গা হবে না স্বামীর নিজের বাড়িতে, এত বড় অসামাজিক ঘটনা সবাই মিলে কেমন ক'রে বরদাস্ত ক'রে নিয়েছে?

গাড়ি এসে দাঁড়াল টালিগঞ্জের বাড়ির সামনে। নেমে এলেন প্রশান্ত। ভিতরে ঢুকে প্রথমেই ডান দিকে পড়ে বাইরের ঘর। সেখানে ছোট শ্যালক শ্রীমান অজিত টেবল-ল্যাম্পটি জেলে একমনে একটি বই পড়ছিল। এবার সে এম-এ দেবে। প্রশান্তকে দেখামাত্রই সে সোৎসাহে ব'লে উঠল, একটুও চমকাইনি, একটু আগেই সুশান্ত ফোন ক'রে খবর দিয়েছে। বলতে বলতে হাসিমুখে সে উঠে এসে প্রশান্তর পায়ের ধূলো নিল। সহাস্যে দুই হাতে তাকে

টেনে নিয়ে প্রশান্ত বললেন, তোমার জন্যে কী কী এনেছি দেখলে চমকে উঠবে!

দেখতে দেখতেই ভিতরে সাড়া প'ড়ে গেল। ফ্রকপরা ছোট্ট শ্যালিকাটি দৌড়ে এল এবং সেই গতিতেই প্রশান্ত তাকে একেবারে কোলে তুলে নিলেন। পরে বললেন, তোমার বোনেরা কেমন মন্তর জানে দেখছ তো? অসময়ে আমাকে ফিরিয়ে আনল।

অজিত বললে, দেখছি তাই। আপনার তো ফিরবার কথা ছিল জুলাই মাসে!

দাঁড়াও, সব খবর একে একে নেব। প্রশান্ত এতক্ষণ পরে এবার সহজ ও স্বাভাবিক হলেন। বললেন, তোমাদের বাড়িটাকে শূন্য মনে হচ্ছে। মিনুর বিয়ে হয়ে গেছে, এখন আর আমাকে খাতির করবে কে বলো?

অজিত হাসিমুখে বললে, কেন, এই আপনার ছোট শ্যালী?

ছোট মেয়েটিকে জড়িয়ে ধ'রে প্রশান্ত বললেন, উঁহু, না, তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি ক'মে গেছে অজিত। এম-এ পড়লে মাথা গুলিয়ে যায়। আরে, ফ্রকপরা শ্যালীতে রং থাকলেও রস কম। কী বলো, চিনু?

চিনু সোৎসাহে প্রশান্তর গলা জড়িয়ে বললে, আজ কিন্তু আপনাকে থাকতে হবে এখানে।

এর পরে শ্বশুরবাড়ির অভ্যর্থনা কী প্রকার হওয়া উচিৎ, সে-বর্ণনা বাহুল্য। ঘণ্টা দুই ধ'রে শাশুড়ী শ্বশুর শ্যালক শ্যালিকা ইত্যাদি অন্যান্য কুটুম্বাদির আসরে ব'সে প্রশান্তকে অনর্গল আত্মকাহিনী এবং বিদেশের গল্প করে যেতে হলো! কিন্তু সমস্তটার আড়ালে উদ্‌গ্রীব চক্ষু যাকে সন্ধান ক'রে ফিরছে, তার দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। দেখতে দেখতে এক সময়ে প্রশান্তর ধৈর্যচ্যুতি ঘ'টে গেল। আহারাদি সেরে কোন এক ফাঁকে তাকে বলতে হলো, এবার আমাকে যেতে হবে। বাড়িতে মেজকাকার অবস্থা ভাল নয়, ডাক্তার একরকম জবাবই দিয়ে গেছে। এবার আমি উঠব।

শাশুড়ী এর মধ্যে কখন যেন উঠে কোথায় সরে গিয়েছেন। শ্বশুর মহাশয় গল্পগুজব সেরে নিজের ঘরে গিয়ে কী যেন লেখাপড়ার কাজে বসেছেন। এবার ছোট শ্যালীকে নানাভাবে সমাদর জানিয়ে তার বাঁধন কাটাতে হলো। প্রশান্ত আবার আসবে বৈকি, হ্যাঁ, যখন তখন আসবে। অতঃপর এক সময় বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসবার পথে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করলেন, কী হে অজিত, তোমার ছোড়দি কোথা? দেখছিনে যে?

ছোড়দি! দাঁড়ান, মাকে ডেকে দিই। অজিত ছুটে ভিতরে যাচ্ছিল, কিন্তু আনা-গোনার পথের পাশেই মা দাঁড়িয়ে ছিলেন, এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলছিলেন!

অসীম কৌতূহল নিয়ে প্রশান্ত দু পা এগিয়ে গেলেন। সোজা সামনে দাঁড়িয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, ব্যাপার কী বলুন তো?

শাশুড়ী জবাব দিলেন না, কিন্তু আঁচলে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। প্রশান্তর পায়ের তলাকার ভূমি কেঁপে উঠছিল। তিনি বিমূঢ় এবং হতবাক। আর কিছু বলবার নেই, কিছু জানবারও নেই। লাবণ্য মারা গিয়েছে।

শাশুড়ী একসময়ে মেঝের উপরেই ব'সে পড়লেন এবং অজিত ও চিনু তার আগেই সেখান থেকে স'রে গিয়েছিল। স্তব্ধ হ'য়ে প্রশান্ত সেইখানে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর এক সময়ে স্খলিত পায়ে বাইরে এসে সোজা গিয়ে গাড়িতে উঠলেন।

কী প্রকার অসুখ হয়েছিল, উপযুক্ত চিকিৎসার ত্রুটি ছিল কি না, মৃত্যুর তারিখটা ঠিক কবে এবং অন্তিমকালে কী প্রকার অবস্থা ঘটেছিল, এসব প্রশ্ন এখন অবান্তর। সর্বাপেক্ষা প্রধান কথা এই, লাবণ্যর মৃত্যু ঘটেছে।

গাড়ির মধ্যে অন্ধকারে ব'সে চোখে জল আসছে না কেন, সেটি প্রশান্ত বিশ্লেষণ করছিলেন। ছয় মাস মাত্র বিবাহের পর আড়াই বছরের জন্য যে-ব্যক্তি বিদেশ চ'লে যায়, তার চোখে স্ত্রীর মৃত্যুতে তাড়াতাড়ি জল আসে কি না, এটি ভেবে দেখা দরকার। বন্ধু হিসাবে বন্ধুকে জানা যায় অল্পকালের মধ্যে, স্ত্রী হিসাবে জানতে গেলে আরেকটু সময় লাগে। ওই ছয় মাসের মধ্যে অধ্যাপনার কাজে, পরীক্ষাদির তদ্বিরে এবং বিদেশযাত্রার হুজুগে তাঁর অন্যমনস্ক মন বন্ধুকে আবিষ্কার করেছিল বটে, কিন্তু স্ত্রীকে সন্ধান করবার সময় পায়নি। আজকের সংবাদটিতে ভয়ানক একটা আঘাত রয়েছে বটে, কিন্তু নিবিড় বেদনায় শোকার্ত চক্ষু অশ্রুসজল হ'য়ে উঠতে চাইছে না।

ফুলসিং, না না ওদিকে নয়—সোজা চলো ধর্মতলার দিকে।

ফুলসিং গাড়িখানাকে ঘুরিয়ে উত্তরদিকে চলল। হঠাৎ প্রশান্তর খেয়াল হ'ল, শাশুড়ীর চোখের জলের মধ্যে মৃত্যুসংবাদটি নির্ভুল ছিল কী? বড়পিসিমার গাম্ভীর্যে, সুশান্তর জবাবে, হরিপদর মৌনতায়, চিনু আর অজিতের সমাদরে, শ্বশুর মহাশয়ের শান্ত ঔদাস্যে—মৃত্যুর সঙ্কেতটা কি সঠিক ছিল?

প্রশান্ত ছুটছেন কোথায়? কেন ছুটছেন? কার কাছে? কেউ তো তাঁর জন্য কোথাও অপেক্ষা ক'রে নেই?

রাস্তার পাশে একবার গাড়ি রাখ তো ফুলসিং? প্রশান্ত সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়লেন।

ততক্ষণে চৌরঙ্গী এসে পড়েছিল। ময়দানের দিকে বেঁকে এক জায়গায় এসে ফুলসিং গাড়ি রাখল। প্রশান্ত বললেন, তুমি নেমে যাও, পাঁচ মিনিট পরে এসো।

ফুলসিং নেমে চ'লে গেল কিয়দ্দূর এবং এদিক ওদিক ঘুরে সে যখন ফিরে এল, দেখল, প্রশান্ত ঠিক একইভাবে গাড়ির ভিতরে অন্ধকারে ব'সে রয়েছেন। ফুলসিং গাড়িতে এসে উঠতেই তিনি বললেন, অতুলবাবুর বাড়িতে চলো।

ধর্মতলায় কি যাব না?

না—অতুলবাবুর ওখানে।

চৌরঙ্গী থেকেই পূর্বদিকের পথে গাড়ি ঘুরে চলল। বেশী দূর নয়। দেখতে দেখতেই একটি ফটকের ভিতরে এসে গাড়ি ঢুকল। রাত সাড়ে ন'টা বাজে। মোটরের হর্ন শুনে একটি যুবতী মেয়ে দ্রুত বেরিয়ে এল। প্রশান্ত হাসিমুখে গলা বাড়িয়ে বললেন, এই যে মঞ্জু, কেমন আছ তোমরা?

আপনি কবে ফিরলেন, প্রশান্তদা?

আজই ফিরেছি বিকেলে। অতুল আছে নাকি?

মঞ্জু বললে, আপনি বোধ হয় খবর পাননি, আজ কুড়ি দিন হ'ল দাদা গিয়েছেন মাদ্রাজে নতুন চাকরি নিয়ে। বৌদিও সঙ্গে গেছেন।

প্রশান্ত বললেন, আচ্ছা, নতুন খবর বটে! চাকরি নিলে শেষ পর্যন্ত তাহ'লে? বেশ মোটা মাইনে মনে হচ্ছে।

হাসিমুখে মঞ্জু বললে, লাবণ্য কই? গাড়িতে দেখছিনে তো?—নামুন গাড়ি থেকে?

না ভাই—প্রশান্ত বললেন, আরেকদিন আসব। তাছাড়া রাতও হ'য়ে গেছে, ফিরতে হবে এক্ষুনি। আচ্ছা, আসি।

মঞ্জু নমস্কার জানাল। ফুলসিং গাড়ি ঘুরিয়ে আবার বেরিয়ে এল। কিন্তু আন্দাজ একশ গজ পর্যন্ত গিয়ে প্রশান্ত হঠাৎ বললেন, আরে, আরে ফুলসিং, দাঁড়াও একটু—একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। দাঁড়াও—

গাড়ি থামিয়ে প্রশান্ত নেমে পড়লেন। পুনরায় বললেন, থাক এটুকু আমি হেঁটেই যাচ্ছি। শোনো, গাড়ি নিয়ে তুমি বাড়ি চ'লে যাও। এখানে আমার দেরি হবে।

আচ্ছা, হুজুর—ফুলসিং আবার গাড়ি ছেড়ে দিল, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না

গাড়িখানা চোখের সম্পূর্ণ আড়ালে চলে গেল, প্রশান্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

অতঃপর তিনি অন্য পথে ঘুরলেন। সে-পথ মঞ্জুদের বাড়ি দিকে নয়। একা হাঁটলে নিজের সঙ্গে কথা চলে। হাঁটতে হাঁটতে চললেন তিনি। পথের এক একটা আলো গুণে গুণে তিনি হাঁটছিলেন। পাঁচটা আলো পেরোবার পর তিনি বাঁদিকে ফিরলেন। সে-পথেও তিনি গেলেন অনেক দূর। কেন যাচ্ছেন সেটি অর্থহীন। মাত্র তিন রাত্রি আগে বিলেতের মাটিতে দাঁড়িয়ে তার মনে হয়েছিল, জীবনটা একদিক থেকে মস্ত সম্পদে পরিপূর্ণ। আজ কিন্তু সবটা মিলিয়ে বড় নতুন লাগছে। তীব্রভাবে নতুন, অস্বাভাবিক রকমের বিস্ময়কর।

হঠাৎ অদূরে একটা কোলাহল শোনা গেল। কালো রংয়ের একখানা মোটর ছুটে যাচ্ছিল অতি দ্রুত, বোধ হয় কেউ চাপা পড়ল। হৈ-হৈ রব উঠল এখানে ওখানে। গাড়িখানা থামল না, অন্ধকার পথ পেয়ে পালিয়ে গেল পূর্ণ গতিতে। না, কিছু হয়নি, লোকটা মরেনি। অন্য দুটি লোক ধ'রে ফুটপাতে নিয়ে গেল। যাক্, সামান্য আঘাত পেয়েছে একখানা হাতে। প্রশান্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁর অধ্যাপক-মন বোধ হয় এই কথাটা জানল, দুর্বিপাক জীবনেরই একটা স্বাভাবিক অঙ্গ, ওটাও স্বীকার্য। মৃত্যুও জীবনেরই সঙ্গে অচ্ছেদ্য, ওটা একই সঙ্গে মানিয়ে না নিলে চলবে না।

সামনে দিয়ে একখানা ট্যাক্সি পেরিয়ে যাচ্ছে দেখে তিনি থামালেন। অপরিসীম ক্লান্তি নিয়ে এবার তিনি বাড়ির পথ ধরলেন। বাড়ি এখান থেকে মাত্র মিনিট কয়েকের পথ। দেখতে দেখতে গাড়ি এসে পৌঁছে গেল।

ফটকের বাইরে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে নিঃশব্দে তিনি নামলেন। অর্থহীনভাবে তাঁর মনে হচ্ছে তিনি যেন অপরাধী। তাঁরই সর্বাঙ্গ যেন ক্লেদক্লিন্ন, যেন তিনি নিজেরই হাতে বিকাল, সন্ধ্যা ও রাত্রি ধ'রে নিজের গায়ে কাদা মেখেছেন। অন্ধকার বাগানটুকু তিনি পেরোচ্ছিলেন পা টিপে টিপে, পাছে শব্দ হয়। গাছের ছায়ারা তাঁকে লক্ষ্য করছে, ধিক্কার দিচ্ছে কেউ যেন নিঃশব্দে অন্ধকারের ভিতর থেকে। বাড়ি নয়, বিষাক্ত পিশাচপুরীর মধ্যে এসে প্রশান্ত ঢুকলেন।

বাইরের ঘরে সুশান্ত তখনও ব'সে একখানা খবরের কাগজ ওলটাচ্ছিল। দাদাকে দেখে হাসিমুখে সে বললে, সবাই জেনেছে তুমি ফিরে এসেছ। এই ছাখো দাদা, আজকের কাগজে তোমার ছবি, আর একটা রাইট-আপ বেরিয়েছে। সকালের দিকে আমি লক্ষ্য করিনি······মেজকাকার বাড়াবাড়ি অসুখ কিনা—

ছোট ভাইয়ের মাথায় আর পিঠে হাত বুলিয়ে প্রশান্ত ঠিক যেন কেঁদে উঠলেন, এত রাত হয়েছে···এখনও ঘুম পায়নি তোর?

অসীম করুণায় তাঁর কণ্ঠ যেন কম্পমান। সুশান্ত বললে, ওপরে যেতুম, কিন্তু তোমারই জন্যে বসেছিলুম। কে যেন একজন টেলিফোন করছিলেন তোমাকে,—আমার যেন মনে হ'ল অতুলদার বোন মঞ্জুদি!

একখানা চেয়ারে ব'সে প্রশান্ত একটু উদাসীন কণ্ঠে বললেন, কিছু বললে?

না, আমায় কিছু বলেনি। নামও বললে না। শুধু একটা টেলিফোন নম্বর লিখে নিতে বললে। এই যে টুকে রেখেছি। তুমি এসেই ফোন করবে, এই অনুরোধ। সুশান্ত কাগজের টুকরোটি দাদার হাতে দিল, তারপর বললে, আচ্ছা দাদা, তুমি বসো, আমি ওপরে যাচ্ছি।

চুপ ক'রে ব'সে রইলেন প্রশান্ত। চোখ দুটো ছিল তাঁর সামনের দেওয়ালের দিকে, সেখানে যেন একটা অসীম কালের নৈরাশ্য আঁকা। সেইদিকে তাকিয়ে বোধ করি তাঁর অনেকক্ষণ কেটে যেত, কিন্তু একসময় এসে ঢুকল হরিপদ। পিছন থেকে অতি মৃদু কণ্ঠে বৃদ্ধ প্রশ্ন করল, খাবার দিতে বলব, বড়দা?

মুখ ফিরিয়ে তাকালেন প্রশান্ত। চিনতে পারলেন না তিনি এই হরিপদকে —যে ব্যক্তি তাঁর চিরকালের চেনা। এও যেন অনন্ত রহস্যে ঢাকা। শুধু স্বল্পকথায় জবাব দিলেন, আজ খাব না।

হরিপদ নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

কাগজের টুকরোটা এতক্ষণ আঙুলের মধ্যে নুড়ি পাকিয়ে প্রশান্ত দুই আঙুলে রগড়াচ্ছিলেন। হঠাৎ সচেতন হ'য়ে তিনি সেটি ধীরে ধীরে খুললেন এবং নম্বরটি দেখে টেলিফোন করলেন। ওদিক থেকে তখনই কোনো এক মহিলার কণ্ঠের সাড়া এল, আপনি কে কথা বলছেন?

প্রশান্ত রায়।

ও দেখুন, আমাকে আপনি চিনবেন না। আজ খবর পাওয়া গেল, আপনি বিলেত থেকে ফিরেছেন। আমি আপনার স্ত্রী লাবণ্য রায়ের এখান থেকেই বলছি। তিনি আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।

কোথায়? প্রশান্ত যেন আর্তনাদ ক'রে উঠলেন।

ঠিকানাটা লিখে নিন, আমি বলে যাচ্ছি।

বলুন।

অতি পরিষ্কার কণ্ঠে মহিলা যে-ঠিকানাটি ব'লে দিলেন, তারই কাছাকাছি প্রশান্ত আজ গিয়ে পড়েছিলেন। এবার শুধু জড়িত রুদ্ধস্বরে বললেন, আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।

টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে ক্ষণকালের জন্য প্রশান্ত একবার স্থির হ'য়ে দাঁড়ালেন।

তারপর হঠাৎ একটা ঝাঁকুনি দিয়ে ঘর ছেড়ে সোজা বেরিয়ে পড়লেন। ফুলসিংয়ের গাড়ির জন্য অপেক্ষা করবার সময় তাঁর ছিল না। অন্ধকারেই তিনি একপ্রকার দৌড় দিলেন ফটক পেরিয়ে, এবং বড় রাস্তায় এসে প্রথম যে ট্যাক্সি পেলেন তাইতেই উঠে পড়লেন।

মিনিট পনেরোর উৎকণ্ঠা। খুঁজে খুঁজে একটি বাড়ির সামনে এসে প্রশান্ত গাড়ি থেকে নেমে ভাড়া চুকিয়ে দিলেন। গাড়ি চ'লে গেল। পথের উপরেই প্রায় দরজা এবং ভিতরে ঢুকলেই বাঁ-হাতি সিঁড়ি ঘুরে উপর দিকে উঠে গিয়েছে। প্রশান্ত সোজা তিনতলায় গিয়ে উঠলেন যেমন নির্দেশ ছিল। কলিং বেল টিপতে না টিপতেই দরজা খুলে গেল এবং ফ্ল্যাটের ভিতর থেকে একটি মহিলা সামনে এগিয়ে এলেন। হাসিমুখে প্রশ্ন করলেন, আপনি কি মিস্টার প্রশান্ত রায়?

আজ্ঞে হ্যাঁ—

ভারী আনন্দের কথা। আসুন, ভেতরে, এই যে এই ঘরে এসে বসুন।

কোথায় যেন কী একটা কটু ঔষধের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছিল। মহিলার নির্দেশমতো একটি ঘরে এসে প্রশান্ত বসলেন। পুনরায় হাসিমুখে মহিলা বললেন, আপনার সঙ্গে একটু গল্প করব মনে করেছিলুম, তা আর হ'ল না। আমাকে ডিউটিতে যেতে হচ্ছে। লাবণ্য রইল। কাল সকাল ন'টার পর আবার আমি আসব। নমস্কার—

মহিলাটি বেরিয়ে সোজা সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন।

সবুজ আলোটা ঘরের মধ্যে জ্বলছে অনেকটা মায়াপুরীর মতো। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সব কিন্তু যেন হরিৎ রহস্যের ছায়া। মিনিট পাঁচসাত পরে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সামান্য ঘোমটা মাথায় টেনে যে-মেয়েটি ধীরে ধীরে এসে ঘরে ঢুকল সে অস্পষ্ট নয়,—চেনা-অচেনায় মিলিয়ে তারই নাম লাবণ্য। প্রশান্ত উঠতে যাচ্ছিলেন কিন্তু পারলেন না। লাবণ্য মৃদুগতিতে এসে মেঝের উপরে ব'সে হেঁট হ'য়ে প্রণাম করল, কিন্তু পায়ে হাত দিল না। বিলাতযাত্রার দিন একদা সে পায়ে হাত বুলিয়েই প্রণাম করেছিল।

অনেকক্ষণ পরে প্রশান্ত প্রশ্ন করলেন, ও মেয়েটি কে?

লাবণ্য যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল, অথবা তলিয়ে গিয়েছিল কোনও অতলস্পর্শ জলধির মধ্যে। এবার আস্তে আস্তে উঠে এল। বললে, বন্ধু।

একসঙ্গে পড়তে বুঝি?

একটি শব্দ উচ্চারণ করতে গিয়ে লাবণ্য অনেকটা সময় নিল। বললে, হুঁ।

প্রশান্ত কিছুক্ষণ চুপ ক'রে গেলেন। পরে বললেন, তোমার শরীর কি অসুস্থ ?

না।

উভয়ে আবার নিস্তব্ধ দীর্ঘকাল। উভয়ের মাঝখানে বিরাট কোনো প্রাচীর, অথবা বিস্তীর্ণ কোনো একটা ব্যবধান,—ঠিক বুঝতে পারা যায় না। কিন্তু সেটি দুরতিক্রম্য। এক সময় প্রশান্ত আবার প্রশ্ন করলেন, তোমার বুঝি ঘুম পেয়েছে খুব, লাবণ্য ?

মৃদু জড়িত কণ্ঠে লাবণ্য জবাব দিল, ঘুমের ওষুধ খেয়েছি।

তুমি কাঁদছ কেন ? আজ কি কাঁদবার কথা ছিল ? একটু হেঁট হ'য়ে প্রশান্ত তার কাঁধের উপর একটি হাত রাখলেন।

হঠাৎ কাঠ হ'য়ে গেল লাবণ্য। তারপর ধীরে ধীরে একখানা হাত বাড়িয়ে প্রশান্তর হাতখানা সরিয়ে দিল। একটু বিস্ময়াহত হলেন প্রশান্ত। পরে তিনি গলা পরিষ্কার ক'রে বললেন, লাবণ্য, খুব অস্পষ্ট এখন আর মনে হচ্ছে না। কিন্তু তোমার চোখের জলে অনেক কালের পুরনো ধারণা একটু যদি ফিকে হয়, মন্দ কি ? যাও, ঘুমিয়ে পড়গে, ঘুম তোমার দরকার। আমি এঘরে রইলুম আজকের মতন।

আরেকবার আনম্র প্রণাম জানিয়ে তন্দ্রাহতা লাবণ্য ধীরে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পরদিন অত বেলায় প্রশান্তর ঘুম ভাঙলেও ওঘরে লাবণ্য তখনও জাগেনি। বেলা ন'টার পর যথারীতি সেই মহিলাটি এসে ঘরে ঢুকে লাবণ্যর ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা পেলেন, কিন্তু সেই ঘুম কেউ কোনোদিন ভাঙাতে পারে নি।

প্রশান্ত পিছনেই এসে দাঁড়িয়েছিলেন। এবার একটি শিশি তুলে দেখিয়ে বললেন, এই ট্যাবলেটগুলো একই সঙ্গে পর পর খেয়েছেন, বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে। হ্যাঁ, মুখের রং ফিকে সবুজই হ'য়ে যায়—আপনি আর মিথ্যে চেষ্টা করবেন না।

মহিলাটি অশ্রুসজল চক্ষে চেয়ে বললেন, মেয়ে মানুষের জীবনে য়্যাকসিডেণ্ট কি হতে নেই ? মরবে তাই ব'লে ?

প্রশান্ত শান্ত হাসি হাসলেন। বললেন, য়্যাকসিডেণ্ট হয় বৈকি। কিন্তু অনেকে আঘাতের চেয়ে আতঙ্কে মরে!

কানের দুল দুটো দুলে ওঠে কথা বলতে গিয়ে; অর্ধসমাপ্ত আবদার রসগদ্গদ ভঙ্গীতে মুখের মধ্যেই মিলিয়ে যায়।

লীলা প্রথমে স্বামীর গলাটা জড়িয়ে ধরলে—আদরিনীরা যেমন পুরুষের স্নেহপ্রবণতার সুযোগে গ্রীবা দুলিয়ে অভিমান জানায়।

বললে, বেশ করেছি, খুব করেছি—

প্রণয়-প্রশ্রয়িনীদের অস্ত্র কণ্ঠে আর চোখের কোণে। তার রসঢালা অধরের দিকে চেয়ে হরিচরণ বললে, গয়না বাঁধা দিয়ে সিনেমা দেখা? কি সর্বনাশ।

আবার দেখবো, ফের দেখবো।—এই ব'লে সভয়ে লীলা স্বামীর গলা ছেড়ে উঠে গেল এবং পিছন দিক থেকে তার পিঠের উপরে মুখ লুকিয়ে বললে, একি আমার দোষ? নিয়ে যাওয়া কেন? কেন তুমি বাড়ি থাকো না?

হরিচরণ বললে, আচ্ছা বেশ, রোজ যেয়ো।

তার গলার আওয়াজটাই যথেষ্ট। পলকের মধ্যেই লীলার উত্তেজনা ক'মে আসে। সে ঘুরে এসে স্বামীর হাত দু'খানা টেনে নিয়ে নিজের গলায় জড়ায়। বলে,—তুমি বলোনি কেন যে, গয়না বাঁধা দিয়ে সিনেমায় যাওয়া অন্যায়।

এবং তারপরে, বলা বাহুল্য, স্বামীস্ত্রীর বিবাদ ওইখানেই মিটমাট হয়ে যায়। মিটমাট না ক'রেই বা উপায় কি। আজ তিন বছর হ'ল তাদের বিয়ে হয়েছে। লীলার বয়স পনেরো থেকে আঠারোয় এসে দাঁড়ালো, কিন্তু জ্ঞানমার্গে তার উন্নতি সুদূরপরাহত। সে ভালো ক'রে কাপড় পরতে শেখেনি, সাজতে জানে না, না জানে স্বামীর সুখদুঃখের সঙ্গী হ'তে। তার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ।

বাড়িতে স্ত্রীর কাছে মোতায়েন থাকা হরিচরণের পক্ষে সম্ভব নয়। তার অনেক কাজ! যন্ত্রপাতির কাজ কারবারে তার খাটুনি আজকাল অনেক বেড়ে গেছে। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা—তার কাজের কামাই নেই, অবকাশ বড় কম।

সে বললে, আজ আমি কোথায় কোথায় গিয়েছি, কি কি করেছি শুনবে?

না আমি শুনবো না, কিছুতেই শুনবো না—এই ব'লে লীলা রাগ ক'রে

বিছানায় গিয়ে উঠলো। স্বামী যাতে আর কিছুতেই তার মুখ দেখতে না পায় এজন্যে মুখের উপর মুড়ি দিয়ে সে শক্ত হ'য়ে শুয়ে রইল। আর একটুও বাক্যালাপ সে করবে না।

হরিচরণের রাগ হয় না। রাগ করবার যোগ্য স্ত্রী তার নয়। এই অর্বাচীন নির্বোধ মেয়েটিকে সে দীর্ঘ তিনবছর চালিয়ে নিয়ে এলো। তার স্নেহের প্রশ্রয়ের মধ্যে ওর কত চপলতা, কত কী অবাধ্যতা, তার সীমা নেই। স্ত্রীর দিকে মুখ ফিরিয়ে সে একটু হাসলো, আর কিছু বললে না।

আলোটার কাছে গিয়ে হরিচরণ তার জামার পকেট থেকে এক তাড়া কাগজপত্র বার করলে। আজ তার জমাখরচের হিসেব অনেক বেশি। এক টন সুরকির দাম ছ'টাকা সাড়ে পনেরো আনা। তিনশো একান্ন মণ সুরকির দাম আজ রাত্রে তাকে ক'ষে বার করতেই হবে। কাল সকালে মুখার্জি কোম্পানীতে জয়েন্টের টাকা হিসেব ক'রে জমা দেওয়া চাই। ওদিকে সেই জয়রামপুর ফার্ম থেকে ড্রাফ্‌টসম্যান্‌ সেই জল পাম্প্‌ করার যন্ত্রটার ড্রইং পাঠিয়েছে, সেটা নিয়ে কাল বাজারে ঘোরা চাই,—বাস্তবিক, তার একটুও নিশ্বাস নেবার সময় নেই।

একবার মুখ ফিরিয়ে সে ডাকলে, লীলা? শুনছ?

লীলা সাড়া দিল না।

হরিচরণ মিনতি ক'রে বললে, দীনু মিস্ত্রির কাগজগুলো সেই যে রাখতে দিয়েছিলুম তোমার কাছে—লক্ষ্মীটি, দাওনা, তার হিসেবটা আজ চুকিয়ে ফেলতেই হবে। ভারি তাগাদা দিচ্ছে। ও লীলা।

লীলা সাড়া দিল না, অতএব নিরুপায় হ'য়ে হরিচরণকে তিনশো একান্ন মণ সুরকির মরুভূমিতে হাতড়ে চলতে হ'ল।

নিচে থেকে পিসিমা এক সময়ে খাবার জন্য ডাক দিলেন। ঠাকুর খাবার বেড়ে দিয়েছে। হরিচরণ কাগজ পত্র ছড়িয়ে রেখে উঠে নিচে চ'লে যায়। হিসেবগুলো তার মাথার ভিতর ঘুরপাক খেতে থাকে।

আহারাদি সেরে উপরে উঠে এসে সে দেখলে, লীলা অগাধ নিদ্রায় অভিভূত। স্বামীর পক্ষে প্রশ্ন করা উচিত স্ত্রীর আহার হয়েছে কিনা। হরিচরণের সে কর্তব্য মনেই এলো না। রাত অনেক হয়েছে বৈ কি, বারোটা বাজে, চোখে তার ঘুমের আবেশ জড়িয়ে এসেছে। এখন আবার হিসাবপত্র নিয়ে বসলে বাকি রাতটুকু পুইয়ে যাবে। কাল সকালে উঠেই তার নতুন বাড়ির কাজের তদারকে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। খাটুনি অনেক। কিন্তু চোখের পাতায় ঘুম নেমেছে ঘন হ'য়ে।

দরজাটা বন্ধ ক'রে আলোটা নিবিয়ে হরিচরণ বিছানায় এসে উঠল। লীলা ঘুমিয়েছে অনেকখানি জায়গা জুড়ে, তারই একান্তে অল্প একটুখানি জায়গা নিয়ে সেই নরম আর মধুর বিছানায় হরিচরণ কুণ্ঠিতভাবে শুয়ে পড়ে।

লীলা? ওগো—

লীলার সাড়া নেই। পরিশ্রম একটু হয়েছে বৈ কি। সিনেমায় যাওয়া আসা, সংসারের কাজে সারাদিন ছুটোছুটি,—স্ত্রীকে সে আর ডাকলে না। জানলার বাইরে অন্ধ শ্রাবণের বর্ষণ মুখরতা অনেকক্ষণ থেকেই চলছে, পথের কোন্ প্রান্ত থেকে একটুখানি জলে-ভেজা পাণ্ডুর আলো এসে পড়েছে খাটের বাজুর উপর। শ্রাবণের একটা তৃষ্ণার্ত আত্মা বাইরে যেন বায়ুর বেগে নিশ্বাস ফেলে চলেছে। হরিচরণ স্থির হ'য়ে শুয়ে রইল। কিন্তু আলো জ্বালা থাকলে দেখা যেতো তার পাশে যে মেয়েটি আপাদমস্তক আবৃত ক'রে নিঃশব্দে প'ড়ে রয়েছে তার আল্‌তা-পরা পা দু'খানি একটি অপরটির গা ঘষছে—ঋতু সমাগমে হরিণ যেমন হরিণীর গাত্র লেহন করে। কাছে টেনে নেবার প্রতীক্ষায় নারী জেগে ছিল।

দেখতে পাচ্ছ এখান থেকে? ওই যে আমাদের নতুন বাড়ী। চিড়িতনের ফোকর—মিঠে গোলাপী রং মানিয়েছে দেওয়ালে,—ও কি, কি ভাবছো?—উৎসুক হ'য়ে স্ত্রীর দিকে মুখ ফেরালে।

চলন্ত মোটরে ব'সে বাইরের দিকে চেয়ে লীলা বললে, কিচ্ছু না।

হরিচরণ চোখের তারায় উল্লাসের ঝঙ্কার তুলে বললে, এমন প্ল্যানের বাড়ি কলকাতায় একটিও নেই, রবি ঠাকুরের শ্যামলীকেও হার মানায়! জানলা দেখবে কচি কলাপাতা রং, ইট, চূণ, সুরকির একটা অদ্ভুত স্বপ্ন, বর্ণ পরিচয়ের অক্ষরগুলো একত্র ক'রে যেন একটা গীতিকবিতা।

আঃ—লীলা চোখ রাঙিয়ে উঠলো।—এক কথা একশো বার। যাবো না আমি তোমার সঙ্গে।

হরিচরণ যেন ফুৎকারে নিভে গেল। মুখ ফিরিয়ে দেখলে তাদের ট্যাক্সি নতুন বাড়ির ধারে এসে থেমেছে।

দু'জনে নামতেই লোকজন ঘিরে এসে দাঁড়ালো। কেউ দালাল, কেউ মিস্ত্রী, কেউ সিমেণ্টওয়ালা। হরিচরণ বললে, বাড়ি ত প্রায় শেষ, আনলুম আমার স্ত্রীকে দেখাতে—বুঝলেন না, মেয়েদের চোখই আলাদা। পুরুষ মানুষ আর বাড়িতে থাকে কতটুকু, বাড়িত মেয়েদেরই জন্যে। কাল আবার পিসিমাকে

এনে দেখাবো। এসো, এই দিক দিয়ে—ইস্, আরে, এ কি করেছেন সরকার মশাই, দালানের খিলেন খুলিয়েছেন? জ'মে গেছে বুঝি? কাল রাতে যে বিষ্টি, ঘুমের ঘোরে ভাবলুম বুঝি চূণের ঘরে জল ঢুকছে!

মেঘের মতো মুখ ক'রে লীলা প্রায় সমস্ত বাড়িটায় ঘুরে ঘুরে স্বামীর সঙ্গে দেখতে লাগলো। বাঁশ, কাঠ, চূণ, সুরকি, ইটের কুচি, দড়ি, করোগেটের টুকরো—চারিদিক একাকার। রং আর ছুতোরের কাজ চলেছে। নতুন কাঁচা রঙের গন্ধে ঘরগুলো ভরো ভরো। খুশিতে হরিচরণের মুখখানা আরক্ত আভায় অলঙ্কৃত। এখানে একটা নতুন জীবনের পত্তন হবে। এখানকার কুমারী মৃত্তিকায় পছন্দসই ফুলের বীজ বপন করা হবে। আগামী বসন্তে পুষ্প বীথিকা। হরিচরণের হৃদ্‌পিণ্ডটা রক্তের তরঙ্গে নাচতে লাগলো।

এদিকে এসো লীলা, এ বারান্দায় দাঁড়ালে সমস্ত শহর,—দূ—রে চেয়ে দেখো মনুমেণ্টের চূড়ো—সে ব'লে চললো, দাক্ষিণ দিকে নতুন আকাশের টুকরো। বাথরুম দেখবে এসো।

লীলা তার পিছনে পিছনে চললো মুখে রাশি পরিমাণ বিরক্তি নিয়ে।

ওহে মিস্ত্রী, ইটালিয়ান্ টাইল্‌স্ আসেনি বুঝি? বাথ্ টাব্‌টা কাঁচের হবে মনে আছে ত? এইখানে ধারাযন্ত্র দেবো। অদ্ভুত গন্ধ ঘরটায়—না? এইটে সাবান তেল রাখার কুলুঙ্গী। জানালার ফ্রেমে হবে রঙীন কাঁচ, প্রায় কাঁচের ঘর। বাথরুমে গান গাইতে বেশ লাগে, জলের শব্দে মিলে যায়।—হরিচরণ বললে, পছন্দ হয়েছে ত? হবেই জানা কথা।

লীলা বললে, ফিরে চলো এবার।

সে কি, আরো কত যে দেখবার আছে। দাঁড়াও, অনেক কাজ,—ওরা সবাই অপেক্ষা করছে; হিসেবটা সেরে নিই—ওহে সরকার মশাই—

না, ফিরে চলো, আর আমি একটুও থাকবো না—লীলার ঝোঁকটা বেড়েই চললো, একটুও ভালো লাগছে না, এক্ষুনি চলো।

বিস্মিত হ'য়ে হরিচরণ বললে, কী বলছ তুমি?

থাকতে আমি পাচ্ছিনে! লীলা চেঁচিয়ে উঠলো—থাকো তুমি, আমি চ'লে যাই।

একা যাবে কোথায় ট্যাক্‌সিতে? ছি, কী হ'লে তুমি?—হরিচরণ তার হাত চেপে ধরলো। লীলা মুখ তুলতেই দেখা গেল বড় বড় জলের ফোঁটা তার দুই চোখে ভ'রে উঠেছে।

নূতন সিঁড়ির ধারে সরকার মশায়ের পায়ের শব্দ হতেই হরিচরণ স্ত্রীর হাত

ছেড়ে দিলে। বললে, সরকার মশাই, আসছি আমি এখুনি এঁকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে—শরীর ত এঁর ভালো নয়। এসো।

স্বামীর পিছনে পিছনে নেমে এসে লীলা গাড়িতে উঠলো। হরিচরণকে আবার এখুনি ফিরে আসতে হবে। জলের পাইপ কোথা দিয়ে আসবে দেখা দরকার। পাঁচিল মাপের কাজে তাকে না হলেই চলবে না। বাড়ির নর্দমাগুলোর পথ সে এসে বুজিয়ে দেবে। সে না থাকলে সিমেণ্টের হিসেব হবে না; ছুতোররা কাজে ফাঁকি দিচ্ছে—সে এসে কাজের হিসেব নেবে। চলন্ত মোটরে স্থির হয়ে ব'সে হরিচরণ কাজের কথাই ভাবতে লাগলো।

লীলা একটু কাছে স'রে এলো। তার হাতের উপর হেলান দিয়ে মুখ তুলে বললে, আর তোমাকে আমি এখানে আসতে দেবো না।

মুখ ফিরিয়ে হরিচরণ বললে, কোথায়? নতুন বাড়িতে!

হ্যাঁ। তুমি আসতে পাবে না।—এই ব'লে লীলা তার উৎসুক চিক্কন অধর তুলে ধরলে।

আমি না এলে কাজকর্ম দেখবে কে?—হরিচরণ বললে, সিঁড়ির রেলিংগুলো তোমার কেমন লাগলো? বেশ নতুন ধরনের হয়েছে, নয়? জানো ছ'টাকা তেরো আনা ক'রে ওদের হন্দর। আজকাল ভারি আক্রা।

ব্যর্থ মুখ লীলা ফিরিয়ে নিলে। মোটর প্রায় বাড়ির কাছাকাছি এসে গেছে। সোজা হ'য়ে ব'সে সে বললে, আজ তবে আমাকে নিয়ে চলো সেখানে?

কোথায়?

সেই যে খড়দার গঙ্গার ধারে বেড়াতে নিয়ে যাবে বলেছিলে?

বারে, বেশ মেয়ে ত' তুমি?—হরিচরণ বললে, এটি বুঝি বেড়ানো হ'ল না? তুমিও বেড়ালে, আমারও কাজ হ'ল—এই ত' বেশ।

মুখখানা অন্ধকার ক'রে লীলা চুপ ক'রে রইলো।

সেদিন ফিরে এসে সমস্ত দিন হরিচরণ তার নিত্যকর্মের জটিল জালের মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে রইলো। তার সমস্ত চিন্তা আর কল্পনার ধারা তার এই নতুন সৃষ্টির সঙ্গমে এসে মিলেছে। আর কোনদিকে তার মনের গতি ঘুরিয়ে দেবার অবসর নেই, এ যেন একটা ভয়ানক নেশা।

বাড়ি ফিরতে তার একটু বেশি রাত্রি হ'ল বৈ কি, এত দেরি তার সহসা হয় না। স্নান ক'রে কাপড় চোপড় ছেড়ে সে এসে খেতে বসলো। পিসিমা খাবার রেখে বসেছিলেন। আশেপাশে লীলাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না—

সকালের সেই অজস্র অভিমান সে বোধ করি ভুলতে পারেনি। কিন্তু অভিমান ভাঙ্গাবার সময় হরিচরণের নয়। সে মুখ বুজে খেতে লাগলো।

পিসিমা রুষ্ট মুখে হরিচরণকে বাতাস করতে করতে এক সময় বললেন, এত অবাধ্য হ'লে ত' সংসার চলে না, হরিচরণ।

কি হ'ল, পিসিমা?

বৌমার কথা বলছি। সারাদিন খেটেখুটে তুই বাড়ি এলি, আর সে নিজের মতে চ'লে গেল।

কোথায় সে?

সে বাড়িতে নেই বাছা।

সে বাড়িতে নেই! মানে?—হরিচরণ মুখ তুললে।

পিসিমা বললেন, সেই যে তুই রেখে গেলি, তার ঘণ্টাখানেক পরেই সে একলা চ'লে গেল, খেলে না, নাইলে না। জিজ্ঞেস করলুম, বৌমা, কোথায় যাচ্ছো গো। ব'লে গেল, দিদির বাড়ি। জানিনে বাছা এখনকার মেয়েদের কাণ্ড।

আহারাদি ক'রে হরিচরণ উপরে উঠে এলো। ঘরের মধ্যে একরাশ জামা কাপড় ছড়ানো। বোঝা গেল, সবচেয়ে যে শাড়ি আর জামা তার পছন্দ সেইগুলি প'রে সে গেছে। অন্যান্য জামা, কাপড়, আণ্ডারওয়্যার, ব্লাউজ— সমস্তগুলি ঘরময় বিক্ষিপ্ত, ধূলিধূসরিত। সমস্ত ঘরটা সুগন্ধী দ্রব্য আর পাউ-ডারের স্তিমিত গন্ধে ভরো ভরো। হরিচরণ সারাদিনের পরিশ্রমের পরেও সেগুলি একে একে পাট ক'রে সুবিন্যস্ত অবস্থায় আলমারির মধ্যে সাজিয়ে রাখলো। তার ভয়ানক রাগ হ'ল, কারণ এগুলি প্রয়োজন মতো খুঁজে না পেলে সেই অবুঝ আর অনভিজ্ঞ মেয়েটি তার জীবন অতিষ্ঠ ক'রে তুলবে।

কিন্তু রাত্রি দশটা বাজে। স্বামীকে ছেড়ে কোথাও থাকবার মেয়ে সে নয়। সিনেমায় আজ সে যায়নি। হরিচরণের বলিষ্ঠ হাতখানার উপর মাথা রেখে না শুলে সেই মেয়ের ঘুম হয় না। দিদির বাড়ি সে কিছুতেই থাকবে না, কারণ দিদির সঙ্গে তার এক তিল বনিবনা নেই। তবে রাত্রে সে কোথায় গেল?

অথচ আজ সময় নষ্ট করলে হরিচরণের চলবে না। সে গিয়ে বসলো টেবিলের ধারে, প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের মধ্যে সে একাগ্র মনে সাঁতরে চললো। আজ তার হিসাবের সমস্ত কাজগুলো শেষ করা চাই; এবং এইভাবে রাত প্রায় দেড়টা পর্যন্ত সমস্ত পারিপার্শ্বিক বিস্মৃত হ'য়ে সে হিসাবপত্রের অথৈ নদী সাঁতরে কূলে এসে উঠলো—তখন তার দুই চক্ষু নিদ্রার রসে টলটল করছে। একবার

সে অনুপস্থিত লীলার প্রতি তার অসীম বিরক্তি প্রকাশ করবার চেষ্টা করলে কিন্তু পারলে না, টলতে টলতে বিছানায় উঠে দু'মিনিটের মধ্যে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হ'ল।

অত রাত্রি জাগার পর সকালবেলা ঘুম ভাঙতে হরিচরণের একটু দেরি হ'ল অবশ্য। আড়ামোড়া খেয়ে একটু আলস্যি ভাঙবার চেষ্টা করতেই সহসা সে চমকে উঠলো। চোখ খুলে দেখলে লীলা তার পাশে অকাতরে ঘুমিয়ে রয়েছে। তার সেই ঘুমের মধ্যে, তার চোখ, মুখে ভ্রূরেখায় অনুষ্ঠ অসম্বৃত দেহবিস্তারে কোথাও এতটুকু সঙ্কোচ অথবা উদ্বেগ নেই। রাত্রে কখন সে ফিরে এসেছে হরিচরণ কিছুই জানে না। রুক্ষ চুলের রাশির অন্ধকারে চাঁদপানা মুখে তার সোহাগভরা নিদ্রা — নিদ্রায় আলুথালু।

কিন্তু নিদ্রিতা নারীর রূপমাধুরী নিঃশব্দে পান করার আগ্রহ হরিচরণের ছিল না। সে কঠিন কণ্ঠে বললে, পোড়ারমুখি, কাল সারাদিন কোথায় ছিলে শুনি ?

লীলা জেগে উঠলো। রাত্রি জাগরণে রাঙা দুই হরিণীনয়ন। কিন্তু সে পলকের জন্য। তারপরই সে অতিশয় বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে আবার দিব্যি ঘুমোতে লাগলো।

হরিচরণ বললে, অমনি ক'রে চটকাচ্ছো, ভালো কাপড় জামাগুলো নষ্ট হ'য়ে গেল যে ?

কিন্তু স্ত্রীর সাড়া পাওয়া গেল না। এর পরে হরিচরণ রাগ করবে কার উপর ? অগত্যা বিছানা থেকে নেমে সে বাইরে গিয়ে ডাক দিলে, ঠাকুর চা দিয়ে যাও।

ঠাকুর চা আনবার আগে সে ঘরে এসে একবার স্ত্রীর সর্বাঙ্গে গায়ের কাপড় টেনে টেনে ঢাকা দিলে। বললে, এমন বেপরোয়া ঘুম কোথায় শিখলে শুনি ? নাও, ওঠো, ঠাকুর চা আনছে।

ক্লান্ত দেহে লীলা এবার উঠে বসলো। হরিচরণ প্রশ্ন করলে, কাল কোথায় ছিলে ? রাত্রে ফিরলে কখন ?

সাড়ে তিনটের সময়। — লীলা বললে।

হরিচরণ বললে, একা ?

— না, জামাইবাবুর ছোট ভাই ছিল সঙ্গে।

— কোথায় যাওয়া হয়েছিল ?

আঃ — লীলা বিরক্ত হ'য়ে বললে, বলছি যে ডায়মণ্ডহারবার গিয়েছিলুম বেড়াতে !

— কই, একবারো বলোনি।

— আচ্ছা বলিনি, হ'ল ?

হরিচরণ বললে, সেখানে গিয়ে কি করলে ?

সেখানে ? — লীলা এবার ফিক ক'রে হেসে ফেললে, দোলনা আছে, তাইতে দুলছিলুম দুজনে। জানো জামাইবাবুর ছোট ভায়ের গায়ে কী জোর। উঃ আমাকে যা দোলা দিতে লাগলো। আমিও খুব ক'রে তার দোলনা ঠেলছিলুম।

আর কে গিয়েছিল তোমাদের সঙ্গে ? — হরিচরণ প্রশ্ন করলে। কিন্তু উত্তর দেবার আগে ঠাকুর দু'পেয়ালা চা এনে হাজির করলে।

মুখ ধুয়ে এসে লীলা গুছিয়ে বসলো। চায়ের পেয়ালা হাতের কাছে টেনে নিয়ে দীর্ঘ একটা ভূমিকা ক'রে তার গতদিনের ভ্রমণকাহিনী আনুপূর্বিক আরম্ভ করলে। তার দিদির দেবর কেমন ভালো ছেলে, কেমন তার সুন্দর চেহারা, কতখানি গায়ে জোর, — এই দিয়ে তার কাহিনী শুরু। তারা দু'জনে সারাদিন মোটর চ'ড়ে বেড়িয়েছে, আউটরাম ঘাটের হোটেলে চা খেয়েছে, খিদিরপুরে ডক দেখেছে, তারপর গেছে ডায়মণ্ডহারবার। সেখানে চড়িভাতি ক'রে আহার সাঙ্গ করতেই প্রায় রাত বারোটা হ'য়ে গেল। জামাইবাবুর ছোট ভায়ের মতন এমন মধুর স্বভাবের যুবক সে আর দেখেনি।

তারপর ? - হরিচরণ প্রশ্ন করলে।

— তারপর আমাকে নীরেন এসে বাড়ির দরজা পর্যন্ত পৌছে দিয়ে গেল !

— বিদায় সম্ভাষণটা কেমন হ'ল ?

ক্ষণেকের জন্য লীলা স্বামীর মুখের দিকে তাকালো। তারপর উঠে গিয়ে তার পিঠের উপর মুখখানা ঘ'ষে বললে, তুমি বুঝি রাগ করলে ? রাগ করবে জানলে আমি —

— নীরেন কী বললে শুনি ?

— বলব না আমি, যাও।

— শিগগির বলো বলছি ? হরিচরণ ধমক দিলে কৃত্রিম কণ্ঠে।

স্বামীর মুখের উপর হাতখানা বুলিয়ে লীলা বললে, আমাকে দেখতে খুব ভালো, তাই বললে। ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, আমার একটা কথা রাখবে বলো ?

— কি কথা ?

— আগে বলো রাখবে কি না ?

হরিচরণ বললে, রাখবার মতন যদি হয়—

খুব রাখবার মতন।—লীলা আদর-জড়িত কণ্ঠে বললে, কিছু টাকা আমাকে দাও।

—টাকা? কেন বলো ত'?

—নীরেনকে আমি দেবো। তার কিছু হাতখরচ নেই, তা জানো?

হরিচরণ স্তব্ধ বিস্ময়ে চুপ ক'রে রইলো। লীলা পুনরায় বললে, কাল আবার নীরেন আসবে,—আমরা কিন্তু কাল আর্ট একজিবিশন্ দেখতে যাবো, তা ব'লে রাখছি। বেশি না, দশ টাকা দিয়ো লক্ষীটি,—কেমন?

নিচে থেকে কে যেন বাইরের লোক হরিচরণকে ডাক দিলে। সে ওঠবার চেষ্টা করতেই লীলা তাকে জড়িয়ে ধ'রে বললে, কিছুতেই শুনবো না আমি। বলো দেবে?

রাগ ক'রে হরিচরণ বললে, আমি টাকা দেবো আর সেই টাকা নিয়ে তুমি—

—আমি যে কথা দিয়েছি নীরেনকে।

—পরপুরুষের সঙ্গে তুমি বেড়িয়ে বেড়াতে চাও?

সরল সহজ দৃষ্টিতে লীলা স্বামীর দিকে তাকালো। অবাক হ'য়ে বললে, পর কেন হবে? সে ত' জামাইবাবুর ভাই?

নিচে থেকে আবার ডাক এলো। ব্যস্ত হয়ে হরিচরণ বললে, আচ্ছা, আজ ত' আর নয়। সাবধান, কাগজপত্র ছড়ানো রইলো, যেন হাত দিয়ো না। আসছি আমি;—এই ব'লে সে জামাটা গায়ে দিয়ে নিচে নেমে গেল। গেল বটে কিন্তু সে-বেলায় হরিচরণ আর ফিরে এলো না। ইটওয়ালার পাল্লায় প'ড়ে সারাটা দিন মিস্ত্রি-মজুরদের আন্দোলনে সে আত্মবিস্মৃত হ'য়ে রইলো। স্ত্রীর কথা সে ভুলেই গেল।

রাগে দুঃখে অভিমানে লীলা সমস্ত দিন বিষধর সর্পিনীর মতো এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলো, তারপর এক সময় নিরুপায় হয়ে সে ঘরে ঢুকে খিল বন্ধ ক'রে দিলে। পিসিমা এসে ডাকাডাকি করলেন কিন্তু সে কিছুতেই সাড়া দিল না। বন্ধ ঘরের মধ্যে নিঃসাড় হ'য়ে প'ড়ে রইল।

হরিচরণ যখন ফিরলো তখন সন্ধ্যা সাতটা। পিসিমা তীব্রকণ্ঠে সমস্ত ঘটনা তার কাছে বিবৃত করলেন। অনেকদিন পরে আজ সহসা হরিচরণের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটলো। রাগে অন্ধ হ'য়ে সে উপরে উঠে এসে দরজায় ধাক্কা দিয়ে বললে, খোলো শিগ্‌গির দরজা।

স্বামীর গলার আওয়াজ পেয়ে তখনই লীলা দরজা খুলে দিলে। হরিচর
ভিতরে ঢুকে সুইচ টিপে আলো জাললো, তারপর বললে, কেন তোমার এই
স্বেচ্ছাচার দিন দিন ?

হাসিমুখে লীলা বললে, কেমন জব্দ ?

তোমার এই হিষ্টিরিয়ার ভূত আমি ছাড়াতে জানি, তা জানো ?—বল
বলতেই হরিচরণের দৃষ্টি পড়লো ঘরের এক কোণে। সচকিত হয়ে সে বলে
ঘরের মধ্যে অত কাগজের ছাই কেন ?

লীলা রাগ ক'রে বললে, তোমার সব কাগজপত্র আমি পুড়িয়ে ফেলেছি।

অ্যাঁ ?—এই ব'লে হরিচরণ সেই ছাইগুলোর উপরে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে বললে
সর্বনাশি, বাড়ির সব কাগজপত্র আর হিসেবের যা কিছু এর মধ্যে,—কী করলে
তুমি ?—হতাশ হ'য়ে ব'সে প'ড়ে সে স্তব্ধ হ'য়ে রইলো।

লীলা তার কাছে স'রে এলো। তারপর স্বামীর গায়ের উপর গা ঘেঁ
দাঁড়িয়ে সহজ স্বরে বললে, বেশ করেছি। কেন তখন এই আসছি ব'লে চ'লে
গেলে ? কেন এলে না সারাদিন ? খুব করেছি, বেশ করেছি—এই ব'লে সে
হরিচরণের জামাটা খুলে দিতে লাগলে নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে।

অপূরণীয় ক্ষতিতে সর্বস্বান্ত হরিচরণ সহসা স্বভাব বিরুদ্ধ উত্তেজনায় এক সম
স্ত্রীকে আক্রমণ করলে। তার চুলের মুঠি ধ'রে পাকিয়ে রোষ-কষায়িত চক্ষে
রুদ্ধ কঠিন স্বরে বললে, হতভাগি, কেন এই সর্বনাশ করলি ?

কিন্তু লীলা আধুনিক মেয়ে নয়। শান্তভাবে সে তার দুই নিটোল নগ্নবা
ছড়িয়ে স্বামীকে ঘিরে ধরলো। তারপর একটি অতি উচ্চমার্গের দার্শনিক
বক্তৃতা ফেঁদে বললে, আমাকে ছেড়ে তুমি অন্য দিকে মন দাও কেন ? কে
তোমার চোখ থাকে বাইরে দিকে ? কেন তোমার ঝোঁক ইটপাটকেলে
ওপর ?

দাঁত দিয়ে দাঁত চেপে হরিচরণ বললে, তবে কী চাস তুই ?

অশ্রু টলোটলো চক্ষে লীলা হাসলো ; তারপর জোর ক'রে স্বামীর কণ্ঠল
হয়ে সিঁদুর-মাখানো মাথা বুকের কাছে ঘ'ষে গলার কাছটা লালাসিক্ত ক'
দিয়ে রসগদগদ কণ্ঠে বললে, আমি চাই তোমাকে।

———